

স্বাধীনতার সশস্ত্র প্রস্তুতি

আগরতলা মামলার অপ্রকাশিত জবানবন্দি

(পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ)

মুহাম্মদ শামসুল হক





বলাকা
ISBN- 984-70070-0060-9

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে প্রকাশিত এ বইটি প্রামাণ্য দলিল। এতে গ্রন্থিত হয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ মামলায় অভিযুক্তসহ সংশ্লিষ্ট অনেকের অপ্রকাশিত জবানবন্দি। ফলে উঠে এসেছে অজানা-অমীমাংসিত অনেক অধ্যায়। তাই বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের গবেষক ও সাংবাদিক মুহাম্মদ শামসুল হক অনেক পরিশ্রম করে ব্যক্তিক-সামষ্টিকভাবে সংগ্রহে রাখার মতো এ বইটি উপহার দিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বড় মাইলফলক। পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল–শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ও ভারতের সহযোগিতায় সশস্ত্র বাহিনীর কিছু লোকসহ অন্য আসামিরা সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাই তাঁদের রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেপ্তার ও বিচারের সম্মুখীন করা হয়েছে। অপরদিকে, বাংলার ব্যাপক জনগণ বিশ্বাস করেন যে–পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসিতে ঝোলানোর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ওই মামলা দায়ের করে। এ মামলাকে ঘিরে ঊনসত্তরে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। গণঅভ্যুত্থান হয়। সরকার মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সব আসামিকে মুক্তি দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় এলো একাত্তর। মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশ।

এ মামলার বিষয়-আশয় প্রায় চার যুগ ধরে জনমনে অমীমাংসিত থেকে গেছে। অভিযুক্তরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সশস্ত্র প্রস্তুতি বা বিপ্লবের পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করলেও আসলে কি তা মিথ্যে ছিল?

এ বইতে বর্তমানে জীবিত ১২ আসামি, অন্য কয়েকজন আসামির আত্মীয়-স্বজন ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত কিন্তু আসামি হননি এমন সব লোকের সাক্ষাৎকারে উঠে আসা অজানা সব তথ্য বিশ্লেষণ করে লেখক সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। তিনি সফলও হয়েছেন।

প্রচ্ছদ। আল রাহমান



মুহাম্মদ শামসুল হক নিবেদিত প্রাণ-পরিশ্রমী-সৃজনশীল মানুষ। প্রায় ৩৫ বছর ধরে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে লেখালেখি এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণামূলক প্রকাশনার জন্য সুধী মহলে প্রশংসিত হয়েছেন।

১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ অক্টোবর চট্টগ্রামের পটিয়ায় তাঁর জন্ম। বাবা মৌলভি নুরুল হক ও মা নূর খাতুন।

৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর এক ভাই আমিনুল হক শহীদ হন। ৭৭ খ্রিষ্টাব্দে অধুনালুপ্ত দৈনিক জমানার হাত ধরে সাংবাদিকতার শুরু। এর পর দৈনিক স্বাধীনতা, নয়াবাংলা, আল আমিন ও সাপ্তাহিক চট্টলার সিঁড়ি বেয়ে জাতীয় দৈনিক প্রথম আলোর জন্মলগ্ন থেকে এর সঙ্গে যুক্ত হন। বর্তমানেও ওই পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক। তিনি একজন দক্ষ সংগঠকও। কুসুম কলি আসর, শাপলা কুঁড়ির আসর, মালঞ্চ সাহিত্যগোষ্ঠী, পটিয়া খেলাঘর আসর ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ মহকুমা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন।

চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের দুইবার সহসভাপতি এবং বর্তমানে চট্টগ্রাম সাংবাদিক কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির সহসভাপতি। আগামী দিনেও সৃজনশীল বই পাঠককে উপহার দেওয়ার প্রত্যাশা রাখেন তিনি।

লেখকের আলোকচিত্র ▮ নাসির আলী মামুন

স্বাধীনতার সশস্ত্র প্রস্তুতি

আগরতলা মামলার অপ্রকাশিত জবানবন্দি

(পরিমার্জিত ও বর্ধিত সংস্করণ)

মুহাম্মদ শামসুল হক

বলাকা

এই গ্রন্থে যা আছে

এই গ্রন্থে আছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তৎকালীন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সবার মাঝে ক্ষোভ-হতাশার চিত্র, ষাটের দশক থেকে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার পটভূমি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও বিপ্লবী সংগঠনে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপট। আছে এই বিপ্লবী তৎপরতায় তৎকালীন বঙ্গশার্দুল শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা, সিএসপি অফিসারদের যোগসূত্র, গোপন বৈঠকের স্থান, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কলা-কৌশল, সাংগঠনিক তৎপরতা, গোপনীয়তার কারণ, ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ও মামলা উদ্ভবের প্রেক্ষাপট।

এ ছাড়াও আছে কথিত আসামিদের গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের কাহিনী, করাচি ও ঢাকা সেনানিবাসে মুজিব হত্যার চেষ্টা, শেখ মুজিবকে নিয়ে জেলখানার টুকিটাকি স্মৃতি মামলা শেষে রাজনৈতিক আন্দোলনের নতুন ধারা এবং স্বীকৃতি না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষোভ ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধানী তথ্য।

লেখকের অন্যগ্রন্থ

স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু : প্রামাণ্য দলিল (আগামী প্রকাশনী '৯৬-৯৭)
স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি এবং বেতার ঘোষণার ইতিবৃত্ত (শৈলী প্রকাশন '৯৯-২০০০)
চোখে দেখা '৭১ (১ম পর্ব) (নেহলিন প্রকাশন ২০০৫)
খ্যাতিমানদের নানা রঙের দিনগুলি (বাতিঘর-প্রথম প্রকাশ-মার্চ ২০১১)
(প্রথম সংস্করণ-ডিসেম্বর ২০১১)

উৎসর্গ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ
বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য
নিবেদিতপ্রাণ সবাইকে

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০০৯, প্রথম সংস্করণ: একুশের বইমেলা ২০১২, সত্ত্ব : নিলুফার বেগম ও নেহলিন হক, প্রচ্ছদ : আল রাহমান, বর্ণবিন্যাস : শহীদুল ইসলাম, মো. আনোয়ার হোসেন ও সরোজ বড়ুয়া, প্রকাশক : বলাকা, ৪০ মোমিন রোড, কদমমোবারক মার্কেট, চট্টগ্রাম। ফোন : ০১৭১৩-১০৭২৩৭, ২৮৫৫৩৮৫, ০১৮১ ৯৩৩৯৫৪২, ০১১৯ ৫০৫০৩৬৮। ঢাকা অফিস : স্যুট - ৮, বেজমেন্ট, কনকর্ড ইমপোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, ২৫৩/২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫। ফোন ০১৫৫৮৫৭২২৬৫, মূল্য ৩০০ টাকা।

ঢাকায় পরিবেশক : সংবেদ, ৮৫/১, ফকিরের পুল, ঢাকা-১০০০, ফোন: ০১৮১৯ ৪৪১৮৮৮

Shadinoter Soshastra Prostuti Agurtola Mamlar Oprokashita Jobanbondi by Md. Shamsul Huque, First Edition February 2009, 2nd Edition February 2012, Published by Balaka, 40 Momin Road, Chittagong, Bangladesh. Phone: 01713107237, 01819339542, 01195050368. Distributor, Dhaka Sangbed, 85/1, Fakirarpul, Dhaka-1000. Phone 01819441888
e-mail: balakaprokashan@yahoo.com. Price 300 $ 6, ISBN- 984-70070-0060-9

ভূমিকা

বাংলাদেশের ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্প দিনের মধ্যেই বাঙালিদের স্বপ্নভঙ্গ হতে শুরু করে। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময় অনেকেই স্বাধীনতার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। বেসামরিক পর্যায়ে অপূর্ব সংসদ এবং স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের কথা আমরা জানতে পারি। পরে জানা গেল প্রায় একই সময়েই সামরিক বাহিনীতেও স্বাধীনতার লক্ষে কাজ হয়েছিল। নেভির অফিসার কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের কথা আমরা জানতে পারি পরিকল্পনাকারী নেতা হিসেবে। তাঁদের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যোগাযোগ ঘটেছিল, তাঁর সমর্থনও পাওয়া গিয়েছিল। এমনকি জানা যাচ্ছে তিনি অন্তত একবার আগরতলায়ও গিয়েছিলেন।

'৬৬ সনে যখন ছয় দফার আন্দোলনে পাকিস্তানের আইয়ুবশাহী টালমাটাল তখন শেখ মুজিব ও তাঁর সঙ্গী আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেপ্তার ও তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা চলতে থাকে। কিন্তু তাতে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দমানো যায়নি। এরই এক পর্যায়ে পাক সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে এবং এর সাথে জড়িত হিসেবে অনেক বাঙালি সামরিক ব্যক্তিসহ বেশ কিছু বেসামরিক ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করে। শুরু হয় ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ইতিপূর্বে বন্দী ততদিনে বাঙালির জাতীয় নায়ক হয়ে ওঠা শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করা হয়। জনপ্রিয় নেতাকে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় জড়ানোতে জনগণের মনে হয়েছে এটি পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে মামলা নয় বরং দেশপ্রেমিক বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাক সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক মামলা। ফলে এ মামলা চলমান আন্দোলনে ঘৃতাহুতির কাজ করেছে। জাগ্রত জনতা বিচার সভাকেই উড়িয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু এবং সব অভিযুক্তদের মুক্ত করে নিয়ে আসে। তার পরপরই পতন ঘটে আইয়ুব খানের। স্বাধীনতা সত্যিই সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

ইতিহাসের এ অধ্যায়টি নানা জায়গায় লিখিত হয়েছে, কিন্তু অভিযুক্ত, অংশগ্রহণকারী বা খুব কাছে থেকে যাঁরা ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁদের জবানিতে সেসব কথা শোনার সুযোগ হয়নি মানুষের। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্বের অনেক অজানা তথ্য এ বই থেকে জানা যাবে যা ঐতিহাসিকদেরও কাজে লাগবে।

মুহাম্মদ শামসুল হক সাংবাদিকতার পাশাপাশি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের যেসব গুরুত্বপূর্ণ পর্ব নিয়ে জটিল গ্রন্থি তৈরি হয়েছে তা মোচনের চেষ্টা করে আসছেন। ইতিপূর্বে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নিয়ে তাঁর অনুসন্ধানী গ্রন্থটি সচেতন পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবারের বইটি আরও বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর মনোযোগ পাবে বলে আমার বিশ্বাস। স্বাধীনতা ও দেশের অতীত নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে এ বইটি আদৃত হলে বিশেষভাবে খুশি হব। সহকর্মী শামসুল হকের নিষ্ঠাপূর্ণ গবেষণা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের আরও সব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের গ্রন্থিমোচন করে চলবে এবং ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে এরকম বই আরও পাওয়ার আশা রাখি। এভাবে ইতিহাসের গ্রন্থিমোচনে ভূমিকা রেখে তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ থাকবেন।

আবুল মোমেন
চট্টগ্রাম

প্রাক্‌কথন

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ পরিক্রমায় একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তৎকালীন 'পূর্ব পাকিস্তান' প্রদেশকে পাকিস্তান থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন তথা স্বাধীন করার গোপন ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তৎকালীন সাহসী ও জনপ্রিয় নেতা এবং দক্ষ সংগঠক শেখ মুজিবুর রহমানসহ বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ওই দেশদ্রোহী মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ওই মামলাকে সাধারণভাবে মিথ্যা এবং শেখ মুজিবসহ অন্যদের ফাঁসিতে ঝোলানোর মাধ্যমে বাঙালির ছয় দফাভিত্তিক জাতীয় আন্দোলন দমানোর জন্য আইউব খানের সাজানো চক্রান্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু মামলাটি কি আদৌ মিথ্যা ছিল? ষড়যন্ত্রে জড়িত বলে অভিযুক্ত ও ঘটনা সম্পর্কে সাদামাটাভাবে জানেন এমন অনেকেই বলছেন মামলাটিকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা হিসেবে প্রচারণা চালানোর বিষয়টি মিথ্যা হলেও বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র প্রস্তুতি যে চলছিল সেটা শতভাগ সত্য। আর এই প্রস্তুতির সব পরিকল্পনা হয়েছিল অখণ্ড পাকিস্তানের করাচি ও পূর্ব বাংলার ঢাকা-চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় বসে। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকেই এ নিয়ে প্রথমে ব্যক্তি পর্যায়ে আলোচনা, ষাটের দশকের শুরু থেকে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া এবং ৬৬-৬৭ সালের দিকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়েই সংশ্লিষ্টরা অগ্রসর হচ্ছিলেন। এ প্রক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধুসহ অভিযুক্ত, রাজসাক্ষী ও বৈরী সাক্ষী ছাড়াও আরো অনেকে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন যার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সাধারণ মানুষ এমনকি অনেক নবীন প্রবীণ রাজনীতিকের কাছেও এখনো অজানা। মামলায় সরকার পক্ষের দেওয়া অভিযোগপত্র এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে 'ষড়যন্ত্র একটা কিছু হয়েছিল' কারো কারো এমন ধারণা কিংবা কেউ কেউ ওসব 'আইউব খানের চক্রান্ত' বলে মন্তব্য করলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সরাসরি ও নিবিড়ভাবে বসে প্রকৃত তথ্য জেনে জনগণকে জানানোর কোনো উদ্যোগ স্বাধীনতার তিন যুগ পরও নেওয়া হয়নি। বেসরকারি উদ্যোগে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাতে আদালতে দেওয়া অভিযোগপত্র, জবানবন্দি ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে প্রচুর তথ্য সন্নিবেশ করা হলেও অভিযুক্ত বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট, বিস্তারিত এবং স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য বা তথ্য উঠে আসেনি। কর্নেল (অব.) শওকত আলী ও কমান্ডার আবদুর রউফের লেখা দুটি গ্রন্থেও মূলত ঘটনার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ততা ও পর্যবেক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এরকম একটি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যতটুকু সম্ভব সময় থাকতে সর্বস্তরের ইতিহাস সচেতন পাঠকদের সামনে তুলে ধরার তাগিদ থেকে এই গ্রন্থ রচনায় আমি উদ্যোগী হয়েছি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইতিমধ্যে অভিযুক্তদের দুই তৃতীয়াংশ মারা গেছেন। একজন (মাহফুজুল বারী, তাঁর সাক্ষাৎকার নতুন সংস্করণে যুক্ত করা হয়েছে) কানাডা রয়েছেন। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত ১২জন অভিযুক্ত, দুজন বৈরী সাক্ষী ও একজন রাজসাক্ষীর সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছি। নিয়েছি এমন কয়েকজনের জবানবন্দি যাঁরা গোপন বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণের অভাবে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার বা অভিযুক্ত করা হয়নি। এমন একজনেরও সাক্ষাৎ পেয়েছি যিনি অভিযুক্ত না হয়েও ১৪ মাস জেল ও নির্যাতন ভোগ করেছেন। একজন আফগান বংশোদ্ভূত অধ্যাপক পাওয়া গেছে যিনি দাবি করেছেন বঙ্গবন্ধু আগরতলা মামলায় জেলে থাকতে তিনি বঙ্গবন্ধু ও বেগম মুজিবের মাঝে চিঠি চালাচালি করতেন। এ ছাড়া কয়েকজন অভিযুক্তের স্ত্রী সন্তানদের কাছ থেকে জেনেছি তাঁদের স্বামী বা বাবার মুখ থেকে শোনা বিবরণ। এসব সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে এমন সব তথ্য যাতে কৌতূহলী এবং ইতিহাস নিয়ে আগ্রহী পাঠকদের অনেক অজানা প্রশ্নের জবাব মিলবে।

তবে গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ এমন দাবি আমি করবো না। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত অথচ কোনো কারণে অভিযুক্ত

হননি এমন কেউ কেউ দেশের বিভিন্ন স্থানে থাকতে পারেন যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেলে হয়তো আরও নতুন কিছু পাওয়া যেতে পারে। ষাটের দশকের গোপন বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের পাশাপাশি 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' বা 'স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস' এর মাধ্যমে তৎকালীন ছাত্রনেতাদের নিয়েও গোপন একটা তৎপরতা চলছিল। প্রাসঙ্গিক বলে মনে হওয়ায় ওই তৎপরতায় প্রথম দিক থেকে যুক্ত তিনজনের মধ্যে দুজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। আরো যাঁরা নানাভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁদের বক্তব্য নিতে পারলে গ্রন্থটি আরো সমৃদ্ধ হতো। এক্ষেত্রে পেশাগত জীবনের সীমাবদ্ধতার কারণে নিজের দীনতার কথা অকপটে স্বীকার করছি। ভবিষ্যতে এ অপূর্ণতা ঘোচানোর চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এ ব্যাপারে যে কারো সুপরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

গ্রন্থটি রচনার ব্যাপারে শুরু থেকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন শ্রদ্ধেয় কবি-সাংবাদিক, কলামিস্ট আবুল মোমেন। ভূমিকাটিও লিখে দিয়ে তিনি আমাকে কৃতার্থ করেছেন। আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত পরিষদের পক্ষে ফ্লাইট সার্জেন্ট (অব.) আবদুল জলিল অভিযুক্ত ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের ঠিকানাসহ প্রাথমিক তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশে নানাভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়েছেন সাংসদ এম এ লতিফ, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু সুফিয়ান, কবি ও গল্পকার বিশ্বজিৎ চৌধুরী, সাংবাদিক রফিকুল বাহার, শিক্ষানুরাগী মির্জা এ সাঈদ, হিপস মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, বলাকা প্রকাশনের এম জামাল উদ্দিন এবং আমার প্রিয়তমা স্ত্রী নিলুফার হক।

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটি ইতিমধ্যে বিক্রি শেষ হয়ে গেছে। ইতিহাসের লুপ্তপ্রায় এমন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টিকে তুলে এনে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কেউ সাক্ষাতে কেউ ফোনে আমাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, এশিয়াটিক সোসাইটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, আবদুল গাফফার চৌধুরী, মোনায়েম সরকার, ড. শামসুজ্জামান খান, ড. আ আ স ম আরেফীন সিদ্দিকী, ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ড. মুনতাসীর মামুন, আবেদ খান, রশিদ হায়দার, সেলিনা হোসেন, ড. মোহাম্মদ হান্নান, ড. দেলওয়ার হোসেন প্রমুখ। অনেকে এটি পুনর্মুদ্রনের আহ্বান জানিয়েছেন।

তাঁদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন পেয়ে মূলত দ্বিতীয় প্রকাশ তথা প্রথম সংস্করণ বের করতে উদ্বুদ্ধ হই। এই সংস্করণে, সূচিপত্র বিন্যাস, আগরতলা মামলার ২০ নং আসামি মাহফুজুল বারীর সাক্ষাৎকার, কয়েকজন বন্দির ওপর নির্যাতনের বিবরণ, বঙ্গবন্ধুর ভারত গমনের ব্যাপারে ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্য মন্ত্রীর চিঠি অভিযুক্তদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধকালে ষড়যন্ত্র এবং স্বীকৃতি না পাওয়ায় তাঁদের মনের ক্ষোভের কারণগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া, ভুল বানান, শব্দ ও বাক্য বিন্যাস পরিবর্তন আনা হয়েছে। আশা করি নতুন সংস্করণটি সবার কাছে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।

সবশেষে নতুন সংস্করণটি প্র্রকাশে যাঁদের সহযোগিতার কথা স্বীকার করতে হয়, তাঁরা হলেন-আমার বন্ধু দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক এম জামাল উদ্দিন, উপ-সচিব শংকর রঞ্জন সাহা, সৈয়দা সরওয়ার জাহান, এনজিও ব্যুরোর কর্মকর্তা এ কে এম মোয়াজ্জেম, টি.কে গ্রুপের পরিচালক (উৎপাদন ও কারিগরি বিভাগ) মো. খোরশেদুল আলম, আগরতলা মামলার আসামি মাহফুজুল বারী, সাংবাদিক রাশেদ রউফ ও হিপস মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট। তাঁদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মুহাম্মদ শামসুল হক

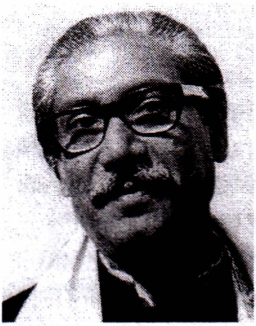
সূচিপত্র

পরিশিষ্ট



জানুয়ারি ১৯৬৯, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কারাগার থেকে ট্রাইব্যুনালে নিয়ে যাওয়ার পথে বঙ্গবন্ধু ও অন্যরা

ষাটের দশকের বিপ্লবী অধ্যায় ও শেখ মুজিব



জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান, সরকার এবং নিজস্ব ভূমিতে সার্বভৌম অস্তিত্বের অধিকার নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। আইনের চোখে রাষ্ট্র একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্থায়ী সংস্থা। রাষ্ট্রের ভেতর সরকার, প্রশাসনসহ নানা সম্প্রদায়, সমাজ-সংগঠন, আইন, রীতিসহ অনেকগুলো সাংগঠনিক অস্তিত্ব থাকে। এসব কিছু এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত সরকারও প্রয়োজন বিবেচনায় পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে রাষ্ট্র একটি স্থায়ী ধারণা, সার্বভৌমত্বের প্রতীক ও প্রতিজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র ছাড়া স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণও আত্মতৃপ্তি নিয়ে থাকতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের ওপর অন্যের দখল বা রাষ্ট্রের কোনো একটি জনগোষ্ঠী চাইলেই রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত করতে পারে না। কেউ তা চাইলেও এ ব্যাপারে সহজে মেলে না আন্তর্জাতিক তথা বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি বা সমর্থন।

রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় ও অঞ্চল নির্বিশেষে সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, সর্বক্ষেত্রে সমান মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং জনগণের নিরাপত্তা ও জীবনমান উন্নয়নে সুষম পদক্ষেপ গ্রহণ করা। রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত সরকার রাষ্ট্রের সব অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবেন এটাই প্রত্যাশিত ও স্বীকৃত নিয়ম। পৃথিবীতে সৌদি আরব, কুয়েত, বাহরাইন আফগানিস্তানের মতো এক জাতি ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র যেমন আছে, তেমনি ভারত, আমেরিকা, রাশিয়ার মতো বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রও আছে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে আইনের চোখে যাই থাকুক না কেন, কোনো রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত সরকার বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের জাতীয়তাবাদী চেতনা, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, জীবনমান উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় কতটুকু ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তার ওপর।

রাষ্ট্র তার জনগোষ্ঠীর সব সম্প্রদায় এবং অঙ্গ কিংবা জাতিসমূহের প্রতি ন্যায়ভিত্তিক সমান

আচরণ, সমান উন্নয়ন ও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলে জনমনে ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম নেয়। এই ক্ষোভ ও হতাশা থেকে এক পর্যায়ে মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। আর রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরা এই প্রতিবাদের কারণ নির্ণয় ও সমাধানে ব্যর্থ হলে মানুষ তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার পরিবর্তনের নিয়মতান্ত্রিক নানা আন্দোলনে নামে। কিন্তু সরকারের নির্যাতন, অত্যাচার, দমননীতির ফলে প্রতিবাদ বা সরকার পরিবর্তনের সুযোগ না থাকলে নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। সরকারের আচরণে বিশেষ করে জাতি ও সম্প্রদায়গত বৈষম্যের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠলে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে এর সমাধান দুঃসাধ্য হয়ে উঠলে সংশ্লিষ্ট জাতি তথা জনগোষ্ঠী অনিয়মতান্ত্রিক পথে সরকার পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়। আর এ পথে একবার অগ্রসর হলে শেষ সমাধান হয় পৃথক রাষ্ট্র তথা স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে।

যদিও প্রতিষ্ঠিত কোনো ভূখণ্ডের অধিবাসীদের স্বাধীনতা ঘোষণা বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আন্তর্জাতিক আইন সমর্থন করে না, তবুও শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষার জয় হয়। তার প্রমাণ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের কাছ থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডে একটি রাষ্ট্রের ভেতর বসবাসরত জনগোষ্ঠী নানা দ্বন্দ্ব সংঘাতের এক পর্যায়ে এসে যদি দেখে যে, পরস্পর একই রাষ্ট্রের কাঠামোর ভেতর বেশিদিন টিকে থাকা আর সম্ভব নয়। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে পৃথক স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র গঠনের উদাহরণও বিরল নয়। যেমন ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্তির জন্য বহু বছর ধরে নানা আন্দোলনের এক পর্যায়ে আলোচনার ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে ১৯৪৭ সালে। ৮০-৯০ এর দশকে পরাক্রমশালী সোভিয়েত রাশিয়া থেকে সমঝোতার ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, লাটভিয়াসহ সাতটি সোভিয়েত অঙ্গরাজ্য।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাজারো বৈপরীত্য সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী স্বাধীনতার মন্ত্রে উদীপ্ত জনগোষ্ঠীর অধিকারকে নানা কলা কৌশলে অস্বীকার করতে চায়। অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে অস্ত্রের মাধ্যমে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে একই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে, একই কাতারে সামিল হয়ে, বিনা প্রশ্নে, নিঃস্বার্থভাবে জানমাল সমর্পণ করার প্রস্তুতি নিতে হয়। আর এরকম প্রস্তুতির জন্য জনগণকে মানসিক ও সাংগঠনিকভাবে উপযুক্ত করতে প্রয়োজন কৌশলী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যোগ্য নেতার। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রক্রিয়া যেমন দীর্ঘ, যুদ্ধের ফলাফলও তেমন অনিশ্চিত। উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে। আরব ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনি জাতি জননন্দিত নেতা ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে প্রায় তিন যুগের বেশি সময় ধরে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাবার পরও পূর্ণ স্বাধীনতা পায়নি।

বাংলাদেশের জনগণ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের সেই সুকঠিন

কাজটি সম্পন্ন করেছে অসামান্য ত্যাগ তিতীক্ষা ও সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে। আর এ লড়াইয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে এক কাতারে সামিল করে এগিয়ে নেওয়ার দুঃসাধ্য কঠিন কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শেখ মুজিব প্রসঙ্গটি নানা কারণে অনন্য ও ব্যতিক্রম। ধর্মীয় জাতিসত্ত্বাবিশিষ্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের আওতায় শাসিত হবার প্রাথমিক অবস্থা থেকে বাঙালি জাতির অনেকেই তাঁদের অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আঁচ করতে পেরেছিলেন। যতই দিন যায় ততই তাঁদের উপলব্ধি তীব্র হতে থাকে। রাজনীতিক, ছাত্রসমাজ, সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে শ্রেণী-পেশার লোকজনের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধতে থাকে। এই আকাঙ্ক্ষাকে নিজের আকাঙ্ক্ষা ও চেতনার সাথে মিশিয়ে এমনভাবে স্বাধীনতার সোপান তৈরি করেন শেখ মুজিব, যা সমসাময়িক অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ নেতার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। এ কারণেই বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রাম ও শেখ মুজিব প্রসঙ্গটি একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ও সশস্ত্র উভয় প্রক্রিয়ায়ই এগিয়েছে। চূড়ান্ত মুক্তি এসেছে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে। স্বাধীনতার প্রয়োজনের কথা অনেকেই আকারে ইঙ্গিতে বিভিন্ন সময় বলেছেন। কিন্তু এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে শেখ মুজিব যেভাবে জেল জুলুম সহ্য করে এক একটি বাধা ধাপে ধাপে অতিক্রম করে এগিয়ে গেছেন তা আর কারও সাহসে কুলোয়নি। সে রকম দূরদর্শিতাও আর কারও মধ্যে দেখা যায়নি।

পূর্ব বাংলায় ব্রিটিশ আমলে মাস্টারদা সূর্যসেন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুসহ অনেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা করলেও অসময়োচিত, অপরিকল্পিত ও সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করতে না পারায় ওইসব সংগ্রাম চূড়ান্তভাবে সফল হয়নি। বাংলাদেশে ১৯৬২ সাল থেকে 'অপূর্ব সংসদ' নামে একটি সংগঠন ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আড়ালে ছাত্র জনতাকে স্বাধীনতার জন্য উজ্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছিল। অপূর্ব সংসদের প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন আবদুল আজিজ বাগমার। তিনি ছিলেন ৬২ সালে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র সংস্থার সাধারণ সম্পাদক। অপূর্ব সংসদের আসল ব্যাখ্যা হলো 'অ' অস্থায়ী, 'পূ' পূর্ব, 'ব' বঙ্গ এবং 'স' সরকার। অর্থাৎ অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকার। সংগঠনের প্রথম সভাপতি ছিলেন প্রয়াত অধ্যাপক অবনী বর্মণ।

সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন প্রচারপত্র, ইশতেহার ইত্যাদির মাধ্যমে বাঙালির শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের পাশাপাশি স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেন। আইউব খানের সামরিক শাসনের ভীতিকর পরিবেশে সংগঠনের উদ্যোক্তা ও অন্য সংগঠকরা গোপনীয় সভায় মিলিত হতেন। পর্যায়ক্রমে এই সংগঠনের কাজের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন ছাত্র ফোরাম ইডেন কলেজ শাখার তৎকালীন সাধারণ সম্পাদিকা নাজমা রহমান, ড. আহমদ শরীফ, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, বেগম সুফিয়া কামাল,

অধ্যাপক আবদুল হাই, শওকত ওসমান প্রমুখ। তবে সীমিত সাংগঠনিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। পূর্ব বাংলার মেহনতি জনগণের মজলুম জননেতা হিসেবে খ্যাত মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৫৭ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে 'আসসালামু আলাইকুম' বলেছিলেন। অনেকে একে স্বায়ত্বশাসনের দাবি হিসেবে দেখেন। কেউ কেউ একে পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলাকে পৃথক করার হুঁশিয়ারি হিসেবেও ভাবেন। কিন্তু সর্বস্তরের জনগণের কাছে তা বোধগম্য হয়নি। বামপন্থী সংগ্রামী সংগঠন কম্যুনিস্ট পার্টি পূর্ব বাংলার জনগণের শোষণমুক্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি হাতে নিলেও স্বাধীনতার কথাটি তখনও স্পষ্ট করেনি যেমনটি ষাটের দশকের শুরুতে কম্যুনিস্ট পার্টির সভায় করেছিলেন শেখ মুজিব।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সংগ্রামের নানা দিক নিয়ে নানাজনে নানাভাবে গবেষণা করেছেন, নানা লেখা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু দেশকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হতে পারে এবং এজন্য প্রগতিশীল ছাত্র যুব সমাজকে তৈরির পাশাপাশি স্বাধীনতাকামী বাঙালি সৈনিকদের সংগঠিত করার ব্যাপারে তাঁর বিপ্লবী ভূমিকার বিষয়টি প্রায় উপেক্ষিত থেকে গেছে। তাঁর সেই ভূমিকার কথা স্পষ্ট হলে বোঝা যাবে স্বাধীনতার জন্য তিনি ষাটের দশকের আগে থেকেই কতটুকু আন্তরিক ছিলেন এবং প্রয়োজনে যে কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন।

একথা অনস্বীকার্য যে, শেখ মুজিব ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মতো সংগ্রামী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো গণতান্ত্রিক নেতার ভাবশিষ্য। তাঁদের হাত ধরেই শেখ মুজিবের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। কিন্তু তারুণ্য-যৌবনের জয়যাত্রায় তাঁর চিন্তা-চেতনা ছিল ওই দুই নেতার তুলনায় অগ্রসর, আধুনিক এবং স্পষ্ট। তবে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করার আগে তাঁর চিন্তাগুলোর বহিঃপ্রকাশ তিনি ওই নেতাদের সামনে করতেন না। চীনের সাথে সম্পর্কের কারণে পাকিস্তানের অখণ্ডতার ব্যাপারে মাওলানা ভাসানী ছিলেন দোদুল্যমান। আর সোহরাওয়ার্দী ছিলেন আন্তরিক। বিষয়টির প্রতি খেয়াল রেখেই তিনি কৌশলে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং অন্যান্য পেশাজীবীদের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন বিকশিত করার কাজটি সুকৌশলে এগিয়ে নেন। প্রথমে তিনি উদ্যোগ নেন আওয়ামী মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করার। ১৯৫৫ সালের ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর দলের সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি তুলে দেওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'তখনকার বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের সংগঠনকে একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থা আর নেই। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আজ অবসান ঘটেছে। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল পাকিস্তানবাসীর নিজস্ব রাজনৈতিক জোট হিসেবে গণআন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করার দায়িত্ব আজ আওয়ামী লীগ গ্রহণ করতে পারে।

আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করতে পারি যে, দেশের সকল ধর্মের, সকল বর্ণের এবং সকল ভাষাভাষী মানুষকে একটি গণপ্রতিষ্ঠানে সমবেত করা প্রয়োজন। বস্তুত আওয়ামী লীগ দলকে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য অবারিত করার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের প্রগতিশীল ভূমিকাকে অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হব'।

১৯৫৬ সালেই পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন শেখ মুজিব। সে সময় গণপরিষদে দেওয়া বক্তৃতায় তিনি তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করে বলেন, "...মাননীয় স্পীকার, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে, ওরা 'পূর্ব বাংলা' নামটা পাল্টিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান' করতে চাচ্ছে। অথচ আমরা বারবার এই দাবি করছি যে, এখন এর নাম শুধু 'বেঙ্গল' (বাংলা) করা হোক। 'বেঙ্গল' (বাংলা) শব্দের একটা ইতিহাস রয়েছে, এর নিজস্ব ঐতিহ্য বিদ্যমান। আপনারা নাম বদলাতে পারেন, তবে এক্ষেত্রে জনসাধারণের মতামত নিতেই হবে। যদি আপনারা এই নাম বদলাতে চান, তাহলে আমাদের বাংলায় ফিরে যেয়ে জনগণকে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা এ ধরণের পরিবর্তন মেনে নেবে কি না।"

ওই অধিবেশনেই তিনি বাঙালিদের ওপর জুলুম-শোষণ বন্ধ না হলে জনগণ 'অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি' গ্রহণ করতে বাধ্য হবে বলে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীকে হুঁশিয়ার করে দেন। তিনি বলেন, 'জুলুম মাত করো ভাই (অত্যাচার করো না ভাই)। যদি এসব কিছু আপনারা আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চান, তাহলে আমাদের বাধ্য হয়েই সংবিধান বিরোধী পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। সংবিধানের বিধি মোতাবেক আপনাদের এগুতে হবে। আপনারা যদি জনসাধারণকে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন, তাহলে তারা অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণে বাধ্য হবে। এটাই বিশ্বের সর্বত্র ঘটে থাকে এবং তা বিশ্বের ইতিহাস থেকে অনুধাবন করা সম্ভব।'

ষাটের দশকের শুরুতে (১৯৬১ সালে) আওয়ামী লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির এক গোপন সভায় আন্দোলনের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। ওই সভায় শেখ মুজিব খোলাখুলিভাবে স্বাধীনতার দাবিকে আন্দোলনের কর্মসূচিতে রাখার আহ্বান জানান কমরেড মনি সিংকে। এ সম্পর্কে পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক খোকা রায় তাঁর 'সংগ্রামের তিন দশক' গ্রন্থে লিখেছেন, 'শেখ মুজিব তুললেন এক মৌলিক প্রশ্ন। তিনি বললেন, এসব দাবী-দাওয়া কর্মসূচিতে রাখুন, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা আমি খোলাখুলি বলতে চাই, আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র, স্বায়ত্বশাসন এসব কোন দাবীই পাঞ্জাবিরা মানবে না। কাজেই স্বাধীনতা ছাড়া বাঙালীদের মুক্তি নেই। স্বাধীনতার দাবীটা আন্দোলনের কর্মসূচিতে রাখা দরকার।'

পাকিস্তানিদের অন্যায় শাসন-শোষণ, জুলুম কিন্তু থেমে ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি বেসরকারি সংস্থা ও সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপরও শোষণ নিপীড়ন চলতে থাকে সমানতালে। সেখানে তাঁরা পাকিস্তানিদের হাত থেকে বাঁচার উপায় এবং এজন্য যোগ্য নেতৃত্বের সন্ধান করছিলেন। সংশ্লিষ্ট কেউ কেউ তাঁদের ওপর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে প্রতিকারের জন্য তৎকালীন জ্যেষ্ঠ নেতা যেমন,

মাওলানা ভাসানী, ফজলুল কাদের চৌধুরী, সবুর খান, ইউসুফ আলী, ফরিদ আহমদসহ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু কেউ তাঁদের সুস্পষ্ট কোনো আশ্বাস বা দিক নির্দেশনা দিতে পারেননি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন শেখ মুজিব।

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। শেখ মুজিব ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেছেন। ফেব্রুয়ারিতেই একদিন পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত এমপি হোস্টেল সামাকো হাউসে বসেই তিনি কয়েকজন বাঙালি প্রতিবাদকারীকে বললেন, 'এদের সঙ্গে (পাকিস্তানিদের সঙ্গে) আর থাকা চলবে না। ঢাকায় গিয়ে আলাদা হওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে নেব।' এ ঘটনার সাক্ষী তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি (পরবর্তীতে ন্যাপ ও গণফোরামের সঙ্গে যুক্ত) মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী। তিনি ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর 'নন কমিশন অর্ডিনারি রিক্রুট' হিসেবে যোগ দেন। পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটায় একবছর প্রশিক্ষণ শেষে পাকিস্তানিদের অবিচার ও স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হয়ে প্রতিবাদ করায় সেনাবাহিনীর চাকরি করার সুযোগ হারান। পরবর্তীতে মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী বাংলাদেশকে স্বাধীন করার গোপন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হন এবং আগরতলা মামলার আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার হয়ে নির্যাতন ভোগ করেন।

শেখ মুজিব যে স্বাধীনতার জন্য ষাটের দশকের শুরু থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তার সত্যতা ১৯৬২ সালেই পূর্ব পাকিস্তান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৈরি এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'পূর্ব পাকিস্তান লিবারেল পার্টির নামে যারা প্রচারপত্র বিলি করেন, তাদের একজনকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তিনি কলকাতায় গিয়ে সেখানে কয়েক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেও তাঁর কথায় প্রকাশ হয় যে, পোস্টারগুলো (প্রচারপত্র) আওয়ামী লীগের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী, একজন অধ্যাপক ও অন্যান্য স্থানীয় লোকজনের অনুরোধে প্রস্তুত করা হয়। সে প্রচারপত্রে নিজস্ব সেনা ও নৌবাহিনী সমেত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রস্তাব করা হয় এবং তাতে কোন্ কোন্ ব্যক্তি শীর্ষস্থানীয় পদে আসীন হবেন তার তালিকাসহ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়। তা পেশোয়ারে নিয়োজিত একজন বিক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট, পূর্ব পাকিস্তানী এয়ারম্যানের কাজ বলে প্রতীয়মান হয়।' তৎকালীন ছাত্রনেতা আবদুর রাজ্জাক (সাবেক মন্ত্রী ও এমপি) আমাকে (লেখক) দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এ রকম একটি প্রচারপত্র তিনিসহ কয়েকজন ছাত্র বিলি করেছেন। (দেখুন তাঁর সাক্ষাতকার অংশে)।

ভয়েস অব আমেরিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে (২০০৯ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে প্রচারিত) বঙ্গবন্ধুর বড় মেয়ে ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ষাটের দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার একটা প্রস্তুতি বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন। যে কোনো কারণে হোক সেটা সফল হয়নি।

৯৪ সালের ১০ আগস্ট লেখা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক নিবন্ধে শেখ হাসিনা লিখেছেন "তখন রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। আওয়ামী লীগের সব নেতা 'এবডো' ছিলেন অর্থাৎ সক্রিয় রাজনীতিতে কেউ অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। তাই ছাত্রদের সংগঠিত করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু করা হয়। আব্বা অবশ্য আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি বেড়াতে যেতেন বিভিন্ন জেলায়। সেখানে দলকে সংগঠিত করার কাজ ও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রতি জেলা, মহকুমা, থানায় গোপন সেল গঠন করেন। দেশকে স্বাধীন করার জন্য দলকে সুসংগঠিত করার কাজ গোপনে চলতে থাকে। ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। '৬২তে বহু ছাত্র গ্রেপ্তার হয়। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের বহু নেতা এ বাড়িতে এসেছেন গোপনে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ নিতে ও আলোচনা করতে।"

দেশকে স্বাধীন করার গোপন প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সামরিক বাহিনীর সাবেক সদস্য, সরকারি আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেও পৃথক সাক্ষাৎকারে সশস্ত্র প্রস্তুতির বিষয় আমার কাছে স্বীকার করেছেন। ইতিমধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের মধ্যে যাঁরা এখনো জীবিত আছেন তাঁদের মধ্যে খান শামসুর রহমান সিএসপি, ব্রিগেডিয়ার (অব.) খুরশিদ উদ্দিন, কর্নেল (অব.) শওকত আলী, কর্নেল (অব.) শামসুল আলম, কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ, নূর মোহাম্মদ বাবুল, (ক্যাপ্টেন বাবুল), করপোরাল এবিএম সামাদ, ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুল জলিল, মাহফুজুল বারী, রাজসাক্ষী ডা. ছৈয়দুর রহমান, বিধান কৃষ্ণ সেন, লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের স্ত্রী কোহিনুর বেগম, রুহুল কুদ্দুসের ছেলে এহসান উল-আমিন, প্রয়াত মানিক চৌধুরীর স্ত্রী সবিতা চৌধুরী ও ছেলে দীপংকর চৌধুরী, সুবেদার আবদুর রাজ্জাকের স্ত্রী রিজিয়া বেগম ও ছেলে এসএম তরিকুল ইসলামের সাক্ষাতকার নিয়েছি। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কিন্তু চার্জশিটভুক্ত হননি এমন ব্যক্তি সাবেক সেনা প্রধান লে. জে. মাহবুবুর রহমান, আলী রেজার ভাই আলী নওয়াজ, বৈরী সাক্ষী মো. আবুল হোসেন, জয়নাল আবেদীন খান, সুলতান উদ্দিনের ভাই কামালউদ্দিন, প্রয়াত জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমদ, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক সৈয়দ ইলিয়াছ ধামী প্রমুখের সাক্ষাৎকারও নিয়েছি। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে পশ্চিম পাকিস্তানে তৎকালীন সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীরা পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের হাতে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, কথায় কথায় চাকরিচ্যুতি, ছুটি ছাঁটা বা পদোন্নতিতে বৈষম্য ইত্যাদির শিকার হচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কিছু স্বাধীনচেতা, প্রতিবাদীমনস্ক বাঙালি পাকিস্তানিদের অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁরা বিক্ষিপ্তভাবে চিন্তা করতে থাকেন কীভাবে পাকিস্তানিদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কেউ কেউ এমনও ভাবেন যে এই অত্যাচার ও বৈষম্যের হাত থেকে বাঁচতে হলে পূর্ব বাংলাকে পশ্চিমাদের শাসনের কবল থেকে মুক্ত অর্থাৎ স্বাধীন করতে হবে। প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করতে হবে। কিন্তু অল্প কয়েকজন সৈনিক চাইলেই তো আর স্বাধীনতা এসে যাবে না। এজন্য প্রয়োজন

সাংগঠনিক শক্তি, রাজনৈতিক শক্তির সমর্থন ও সহযোগিতা এবং আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা। এ পর্যায়ে তাঁরা প্রাথমিকভাবে পাঁচ-সাতজন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তৎকালীন বাঙালিদের মধ্য থেকে এমন সাহসী ও যোগ্য নেতার খোঁজ করতে থাকেন যিনি গোপন তৎপরতায় প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা দিতে পারবেন এবং একই সঙ্গে এই সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি রাজনৈতিক সমর্থন যোগাতে পারবেন। নানা সূত্রের মাধ্যমে তাঁরা বেশ কজন জ্যেষ্ঠ নেতার সমর্থন চেয়ে ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে নিশ্চিত হন যে, শেখ মুজিবই হতে পারেন তাঁদের কাঙ্ক্ষিত সাহসী, প্রতিবাদী, উপযুক্ত সংগ্রামী নেতা।

শেখ মুজিব ইতিমধ্যে অর্থাৎ '৬১ সালেই 'পূর্ব বাংলা মুক্তিফ্রন্ট' নামে একটি গোপন সংগঠনের জন্ম দেন। পাশাপাশি চলে ছাত্রদের মধ্যে সশস্ত্র ক্যাডার সৃষ্টির প্রক্রিয়া। এর অংশ হিসেবেই বঙ্গবন্ধুর তত্ত্বাবধানে ছাত্রলীগের স্বাধীনতাপন্থী প্রগতিশীল বিশ্বস্ত বাছাই করা কর্মীদের নিয়ে '৬২ সালে গঠন করা হয় 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ।' ১৯৬৪ সালে গঠন করা হয় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের 'কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস'। শুরুতে এসব সংগঠনের নেতৃত্বে যুক্ত ছিলেন সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমদ। এ সম্পর্কে প্রয়াত জাসদ নেতা বিধান কৃষ্ণ সেন, কাজী আরেফ আহমদ ও আবদুর রাজ্জাকের পৃথক সাক্ষাৎকারে মোটামুটি ধারণা দেওয়া হয়েছে।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত নৌবাহিনীর বিক্ষুব্ধ লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পরোক্ষ যোগাযোগ শুরু হয়। ৬২ সালের শেষের দিকে করাচিতে নৌবাহিনীর কামাল উদ্দিনের টিচার্স হাউজিং সোসাইটির বাসায় এক গোপন বৈঠকে নৌবাহিনীর সদস্যেরা তাঁদের মনোভাবের কথা শেখ মুজিবকে খুলে বলেন এবং তাঁর নেতৃত্ব ও পরামর্শসহ সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা চান। ওই বৈঠকে বিক্ষুব্ধ সৈনিকদের পক্ষে তাঁদের গ্রুপ নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন, মোজাম্মেল হোসেন, সুলতান উদ্দিন, স্টুয়ার্ড মুজিব, নূর মোহাম্মদ বাবুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শেখ মুজিব তাঁদের মনোভাব জেনে নিজেরও একই মনোভাব ও পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি বলেন, 'স্বাধীনতার জন্য আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিতে রাজি আছি। আপনাদের যখন যে রকম সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন তা আমি দেব।' এ ছাড়া স্বাধীনতার আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে ছাত্রদের দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করেন। একই সঙ্গে তিনি দেশপ্রেমিক সৈনিকদের সুসংগঠিত হওয়ার পরামর্শ দেন। তার আগে অর্থাৎ কমান্ডার মোয়াজ্জেমের প্রস্তাব পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু রুহুল কুদ্দুসসহ কয়েকজন অতি বিশ্বস্ত লোক নিয়ে বিষয়টি পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। সমস্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত হয়। এরপর থেকে নৌ, বিমান ও সেনা সদস্যেরা তাঁদের বিশ্বস্ত লোকজন নিয়ে ধীরে ধীরে পৃথক পৃথক গ্রুপ সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত হতে থাকেন। ১৯৬৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপের নেতা ও সদস্যদের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর বাসভবন, করাচিতে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমের করাচির বাসা, কামাল উদ্দিনের বাসা, ঢাকায় তাজউদ্দিন আহমদের বাসা, চট্টগ্রামে ভূপতিভূতিভূষণ চৌধুরী,

(মানিক চৌধুরী), ডা. ছৈয়দুর রহমান, বিধান সেনের বাসা, হোটেল মিসকা, হোটেল শাহজাহানসহ বিভিন্ন স্থানে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নিরাপত্তা, গোপনীয়তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু কেবল নির্দিষ্ট কয়েকজন ছাড়া অন্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ দিতেন না। এমনকি আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ-যুবলীগের তৎকালীন নেতৃত্বকে পর্যন্ত এই গোপন প্রক্রিয়ার আসল রহস্য জানানো বারণ ছিল। কারণ কোনো কারণে ঘটনা ফাঁস হলে সবাইকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে এবং বাঙালিদের মুক্তি তথা স্বাধীনতার আন্দোলন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। বিপ্লবী সংগঠনের সূচনাকালীন ও গোপন বিপ্লবী কাউন্সিলের একমাত্র জীবিত সদস্য নূর মোহাম্মদ বাবুল জানিয়েছেন ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণার পর করাচিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বাসভবনের সামনে টেকসি দুর্ঘটনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তা সফল হয়নি। বঙ্গবন্ধু তাঁর পক্ষে সৈনিকদের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যোগাযোগের জন্য চট্টগ্রামের মানিক চৌধুরীকে মনোনীত করেন। পরে ডা. ছৈয়দুর রহমান ও বিধান কৃষ্ণ সেনকেও নির্বাচিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর বিশ্বস্ত বেশ কয়েক জন সিএসপি কর্মকর্তা যেমন রুহুল কুদ্দুস, আহমদ ফজলুর রহমান, খান শামসুর রহমান প্রমুখের সঙ্গেও স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়োজন এবং সৈনিকদের সহযোগিতার ব্যাপারে আলোচনা করতেন। মানিক চৌধুরী শেখ মুজিবের পক্ষে অনেক সময় খবরাখবর জানাতেন বেগম মুজিবকে।

বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ অনুযায়ী কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বাধীন সৈনিক গ্রুপের সঙ্গে সিএসপি কর্মকর্তাদেরও একাধিক বৈঠক হয় করাচি, ঢাকা ও চট্টগ্রামে। সিএসপি কর্মকর্তাসহ আগরতলা মামলার সব আসামি স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা জানলেও এর বাস্তবায়নের প্রকৃত কৌশল সম্পর্কে সবাই পুরোপুরি জানতেন না। সংশ্লিষ্ট বেশিরভাগই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা ও তাঁর কার্যক্রমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মূল (বঙ্গবন্ধুর) লক্ষ্য ছিল, সকল প্রগতিশীল স্বাধীনচেতা শক্তির সম্মিলন ঘটিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি করা। তবে এ পর্যায়ে সরকারের দিক থেকে সশস্ত্রভাবে বাধাবিঘ্ন এলে সশস্ত্র উপায়েই তা মোকাবেলার মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার প্রস্তুতি নিতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন হলে ভারতের সহযোগিতা নেওয়া এবং এ ব্যাপারে উপায় বের করার জন্য ভারতীয় রাষ্ট্রদূতসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনার প্রক্রিয়াও চলে। এমনকি বঙ্গবন্ধু এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য ৬৩-৬৪ সালে বিলোনিয়া সীমান্ত দিয়ে গোপনে ভারতে গিয়েছেন তাও নিশ্চিত করেছেন তাঁর সফরসঙ্গী বৈরী সাক্ষী আবুল হোসেন। কিন্তু চারদিকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ হওয়ার আগেই নানা কারণে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার কাছে বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়। মামলা চূড়ান্ত করার আগেই শেখ মুজিবকে জেলে আটক রাখা হয়। পরে একে একে গোপন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত তিন হাজারের (কারো মতে ৪ থেকে ৫ হাজার) বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। এর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হিসেবে চিহ্নিত ৩৫ জনকে চার্জশিটভুক্ত আসামি এবং ১১ জনকে রাজসাক্ষী করে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' শিরোনামে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা

দায়ের করা হয় যা আগরতলা মামলা নামে পরিচিতি পায়। মামলায় মোট ২০০ সামরিক বেসামরিক ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে দেখানো হয়। চার জন সাক্ষী মামলার জেরাকালে অভিযোগ অস্বীকার করলে বৈরী ঘোষণা করা হয় তাঁদের। মামলার প্রধান অর্থাৎ এক নম্বর আসামি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং দু নম্বর আসামি ছিলেন লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেন।
আগরতলা মামলায় মাত্র ৩৫ জনকে আসামি করা হলেও এতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সরাসরি যুক্ত, তাঁদের নানাভাবে সহযোগী হিসেবে জড়িত সদস্য সংখ্যা অন্তত পাঁচ হাজারের ওপরে হবে বলে সংশ্লিষ্টরা দাবি করেছেন। মূল আসামি ছাড়াও মামলা শুরুর দিক থেকে পরবর্তীতে তিন হাজারের বেশি লোককে, কারো কারো ধারণা, আরো বেশি সংখ্যক লোককে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের অনেকে বিনা বিচারে এক থেকে দেড় বছর জেল খেটেছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন। কিন্তু মামলায় অভিযুক্ত করার মতো পর্যাপ্ত সাক্ষী প্রমাণের অভাবে তাঁদেরকে আসামি হিসেবে দেখানো হয়নি এবং অভিযোগপত্রও সেভাবে দেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত মামলা প্রত্যাহার করা হলে সংশ্লিষ্ট সবাই জেল থেকে মুক্তি পান।
এরকম বেশ কয়েকজনের সঙ্গে পরে সার্জেন্ট (অব.) আবদুল জলিল ও অন্য কয়েকজন আসামির পরিচয় হয়, কথা হয়। আসামির তালিকাভুক্ত না হওয়ায় ওইসব দেশপ্রেমিকদের তখন যেমন, পরবর্তীতেও তেমন কোনো রকম খোঁজ খবর নেওয়া হয়নি বা লেখালেখি হয়নি। কত লোক বিপ্লবীদের দলভুক্ত হয়েছিলেন তার প্রকৃত তথ্য পাওয়া না গেলেও আবদুল জলিলকে গ্রেপ্তারকারী পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তা ওসমানীর কয়েকটি কথায় এ সংখ্যা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যায়।
ওসমানীর কথাটুকু শোনা যাক আবদুল জলিলের ভাষায়, "আমাকে গ্রেপ্তারকারী পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা ওসমানী পুলিশ প্রহরায় আমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে সামান্য কথা হয়। আমাদের গ্রেপ্তারের কারণ, কতজনকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এরকম ছোটখাটো কথা। তিনি (ওসমানী) আমাকে বলেছিলেন, 'তোমাদের আন্দোলনের কারণ হয়তো জেনুইন। কিন্তু তোমরা আন্দোলনকে যে পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছিলে তা ঠিক ছিল না। তোমরা এরই মধ্যে যেভাবে অগ্রসর হয়েছ তাতে আর্মি, নেভি ও এয়ার ফোর্সে বাঙালি যাঁরা আছেন তাঁদের সকলকেই গ্রেপ্তার করতে হয়। কিন্তু সবাইকে গ্রেপ্তার করতে গেলে বিষয়টি একদিকে জটিল, অন্যদিকে হাস্যস্পদ দেখাবে, আদালতে প্রমাণ করাও কঠিন হবে। কাজেই আমরা শুধু তোমাদের নেতৃস্থানীয় কিছু লোককে ধরে এমন সাজা দেব, যাতে এই সাজা দেখে বাকিরা আপনাআপনি চুপ হয়ে যাবে।"
আসামি বিধান কৃষ্ণ সেন, নূর মোহাম্মদ বাবুল, কমান্ডার আবদুর রউফসহ অন্য অনেকের কাছেও জানা গেছে, প্রথম দিকে চার পাঁচজন করে এক একটা গ্রুপ বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় যাত্রা শুরু করলেও ঘটনা ফাঁস হওয়ার আগে পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রুপের সংস্পর্শে এসে পাঁচ হাজারের বেশি সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি অলিখিতভাবে তাঁদের সদস্য হয়েছিলেন। এর প্রমাণ হিসেবে প্রাক্তন সেনাপ্রধান লে.জে. মাহবুবুর রহমান, আসামি আলী রেজার ভাই আলী নওয়াজ এবং আসামির তালিকাভুক্ত না হয়েও ১৪ মাস জেল খাটা জয়নাল আবেদীন

খানের কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁদের পৃথক সাক্ষাৎকার এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অভিযোগপত্র পর্যালোচনায়ও দেখা যায়, অভিযুক্তদের সঙ্গে বিভিন্ন বৈঠকে এমন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন যাঁদের নাম পরিচয় তদন্তকারীরা উদ্ধার করতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভারতের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্টরা বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন তথা স্বাধীন করতে চায় এমন স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা আসামিদের ওপর সীমাহীন নির্যাতন চালায়। ভারতের সহায়তায় পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রের কথা শুনে পূর্ব বাংলার মানুষ শেখ মুজিবসহ স্বাধীনতাকামীদের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে এবং এতে শেখ মুজিবকে ফাঁসিতে ঝোলানোর মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলন চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া যাবে এই ধারণা থেকে সরকার মামলাটিকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে প্রচার করে। কিন্তু বাঙালিরা সরকারের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেন শেখ মুজিবসহ আসামিদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ব্যাপক গণআন্দোলনের মাধ্যমে। অবশেষে গণবিস্ফোরণের মুখে উপায়ান্তর না দেখে সরকার মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হন এবং বঙ্গবন্ধুসহ সব বন্দী জেল থেকে মুক্তি পান। মামলা থেকে মুক্তির পর '৬৯ এর ২৩ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ আহূত সমাবেশেই শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কার্যক্রমের জন্য যে টাকা পয়সার দরকার তা নানা উৎস থেকে পাওয়া যেত। এসব উৎস মূলত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আগ্রহেই সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম উৎস ছিলেন চট্টগ্রামের মানিক চৌধুরী। আসামি সুলতান উদ্দিন ১৯৯২ সালে তা জানিয়েছিলেন তার ভাই কামাল উদ্দিনকে।

বিধানকৃষ্ণ সেনও বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সূত্র থেকে টাকা সংগ্রহ করে আন্দোলনের কাজে খরচ করতেন। তিনি চাইলেই টাকা পেতেন। বেগম মুজিবের মাধ্যমেও টাকা পয়সা কিছু পাওয়া গেছে। চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে নিউ এজেন্সি নামে যে কাস্টমস ক্লিয়ারিং, ফরওয়ার্ডিং অ্যান্ড ইন্ডেন্টিং ফার্ম ছিল তার আয়ের বড় একটা অংশ গোপন আন্দোলনের পেছনে খরচ করা হতো।' এ ছাড়া, রুহুল কুদ্দুসের মতো প্রভাবশালী পদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তা ও সমমনা শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকেও কিছু অর্থের সংস্থান হতো বলে সংশ্লিষ্টরা ধারণা দিয়েছেন।

শেখ মুজিবের বিপ্লবী চেতনার উৎস

অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাভিত্তিক স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং এজন্য প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি তথা বিপ্লবী তৎপরতা চালানোর মতো চিন্তা-চেতনা বঙ্গবন্ধুর মনোজগতে এল কোন উৎস থেকে? এ প্রশ্নের বোধগম্য জবাব পাওয়া যেতে পারে লেখক হাবিব আহমদ দত্ত চৌধুরীর 'গুরু সদয়ে উদ্ভাসিত মুজিব' নিবন্ধে। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট ভোরের কাগজে প্রকাশিত নিবন্ধের উল্লেখযোগ্য অংশ পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হলো।

'গুরুসদয়ে উদ্ভাসিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কথাটা হালআমলের রাজনীতিবিদ বা বর্তমান প্রজন্মের অনেকের কাছেই আনকোরা ধরনের তাতে সন্দেহ নেই। অথচ বঙ্গবন্ধুর জীবনেতিহাসের এ অধ্যায়টি ইতিহাসের মানদণ্ডে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।

'...জাতি যদি তার আত্মপরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার স্পৃহা দুর্দমনীয় রূপ লাভ করবে না। আর তা না হলে স্বাধীনতা অর্জনের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কাজেই স্বরাজ আন্দোলনের আগে জাতীয় জীবনে স্বদেশী ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে ভাস্বর করে তোলা সর্বাগ্রে জরুরি। বাঙালি জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা এই বঙ্গজননীর পল্লী অঞ্চলকে ঘিরে। তাই পল্লীবাংলার উন্নয়নই হচ্ছে জাতীয় মুক্তির প্রথম সোপান। পল্লীবাংলার মানুষ যেদিন নিজের হাজার বছরের আবহমান জাতীয় ঐতিহ্যকে যথাযথভাবে জানতে পারবে সেদিনই সৃষ্টি হবে স্বদেশমুক্তির পক্ষে গণজোয়ার। আর তখনি দেশনেতাদের রাজপথের সংগ্রাম সফল হবে, তার আগে নয়– এই ছিল গুরুসদয়ের পরিকল্পনা।

বাংলার নৃত্য, বাংলার সাহিত্য, বাংলার লোকসংগীত, লোকশিল্প, লোককথা, ছড়া, বাঙালির জাতীয় খেলা, বাংলার মেয়েদের আলপনা প্রভৃতি গণশিল্প-সংস্কৃতি বাঙালির জীবনে পুনঃপ্রবর্তন করে জাতীয় জাগরণ ঘটানোই হচ্ছে ব্রতচারী আন্দোলনের মূল কাজ এবং অতঃপর জাতীয় মুক্তি বা স্বরাজলাভ। এই দুটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলার ব্রতচারীদের জন্য গুরুসদয় দত্ত দুটি স্লোগানও সৃষ্টি করলেন। প্রথমটি হলো আমি বাংলাকে ভালোবাসি, আমি বাংলার সেবা করবো এবং দ্বিতীয়টি হলো জয় সোনার বাংলা। অপরদিকে তিনি স্বজাতিকে শাশ্বত বাঙালি হওয়ার আহ্বান জানালেন তাঁর অবিস্মরণীয় বাঙালি হ' শীর্ষক গানে।

ব্রতচারী আন্দোলনে শামিল হলেন বাংলার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্ম ও মতের জনগণ। বিশেষ করে বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের মিলনমেলায় পরিণত হলো এই আন্দোলন। গুরুজির ধর্মনিরপেক্ষ নীতির ফলে এই আন্দোলন সর্বজনীন আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করলো। প্রথমদিকে ব্রতচারী আন্দোলন ইংরেজদের বিরোধিতা এবং ছোট মাথার কিছু অবাঙালি রাজনৈতিক ব্যক্তির সমালোচনার মুখে পড়লো। গুরুজি অতীব সুবুদ্ধির সঙ্গে ইংরেজ গভর্নর Sir John Anderson-কে এ আন্দোলনের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে বশীভূত করলেন। এদিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, পল্লীকবি জসীমউদ্দীন, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ, নেতাজির অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু, অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, দুর্ধর্ষ রাজনীতিবিদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ মহামানবগণ গুরুজির ব্রতচারী আন্দোলনকে স্বাগত জানালেন এবং এর প্রচার ও প্রসারে সর্বাত্মক সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও এই আন্দোলনের একান্ত সমর্থক ছিলেন। কিন্তু জীবনের বেশিরভাগ সময় কারান্তরালে থাকায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় এ আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকতে পারেননি।

এবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি, কীভাবে গুরুসদয়ের ব্রতচারী আন্দোলনের প্রভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। শেখ মুজিব ১৯৩১ সালে ভর্তি হলেন মাদারীপুর ইসলামিয়া হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে। এই সময়কালে গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে মাত্র। বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতির মাধ্যমেই এর শুরু। এটা পূর্বেই বলা হয়েছে। এ সময়কালে চট্টগ্রামের প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক মাস্টারদার নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধী রক্তাক্ত বিদ্রোহ ঘটে এবং সমগ্র উপমহাদেশে ব্যাপক রাজনেতিক ডামাডোল। মাস্টারদার বিপ্লবী অভ্যুত্থান ব্যর্থ করে দিলো স্বৈরাচারী ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার। শেখ মুজিব বাল্য বয়স থেকেই ছিলেন অত্যন্ত স্বদেশ-সচেতন এবং দেশের হালহকিকত অনুধাবনের ক্ষমতা তাঁর আর দশজন সহপাঠীর চেয়ে বেশি ছিল। ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ব্রতচারী আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং তা সমগ্র বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে Scouting-এর পাশাপাশি 'ব্রতচারী শিক্ষণ' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন মাদারীপুর ইসলামিয়া হাইস্কুলেও এই ব্রতচারীচর্চা চালু হয়ে যায়। কিশোর মুজিব ব্রতচারীভুক্তি গ্রহণ করলেন এবং আস্তে আস্তে শিখে নিতে লাগলেন গুরুসদয় দত্তের আবিষ্কৃত যুদ্ধনৃত্য: রায়বেঁশে, ঢালী ও কাঠিনাচ। এই নৃত্যগুলো প্রশিক্ষণের সঙ্গে এগুলোর ঐতিহাসিক তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করা হতো শিক্ষণার্থীদের মধ্যে। বঙ্গবন্ধুর কিশোর মনকে দারুণভাবে নাড়া দিলো এই ব্রতচারীচর্চা। এদিকে ১৯৩৩ সালে বঙ্গবন্ধু আক্রান্ত হলেন বেরিবেরি রোগে এবং এই রোগ থেকেই তাঁর চোখে গ্লোকুমা নামের একটা রোগ দেখা দিলো। বছর তিনেকের জন্য মুজিবের লেখাপড়া স্থগিত হয়ে পড়ে।

১৯৩৫-৩৬ সালের দিকে শেখ মুজিবের পিতা শেখ লুৎফর রহমান ভগ্নহৃদয়ে মাদারীপুর

থেকে গোপালগঞ্জে বদলি হয়ে এলেন। বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শক্রমে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে পুত্রের চোখে অস্ত্রোপচার করালেন। ফিরে এসে তাকে পঞ্চম শ্রেণীতে (Fifth Class) ভর্তি করালেন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে। প্রধান শিক্ষকের নাম গিরিশ বাবু। তিনি গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং স্কুলে ব্রতচারী প্রশিক্ষক ছিলেন তিনি স্বয়ং। উল্লেখ্য, ইসলামিয়া হাইস্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায় যখন ব্রতচারীচর্চায় শেখ মুজিবের হাতেখড়ি হয় তখন থেকেই ব্রতচারীনৃত্য ও ব্রতচারী সঙ্গীতগুলোর প্রতি তাঁর আলাদা আকর্ষণ



সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। পাড়া প্রতিবেশী ও স্কুলের ছেলেদের নিয়ে স্কুলের বাইরেও তিনি একটি ব্রতচারী দল গঠন করলেন এবং ব্রতচারীচর্চা, ভলিবল খেলা ও ফুটবল খেলা নিয়েই বেশিরভাগই সময় মেতে থাকতেন।

১৯৩৯ সালে শেখ মুজিব যখন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন তিনি ১৯ বছরের একজন পরিপূর্ণ যুবক ও দক্ষ ব্রতচারী। খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় হয়ে দাঁড়ালো ব্রতচারীনৃত্য। তিনি বেশকটি ব্রতচারীসঙ্গীত শিখেছিলেন। তন্মধ্যেঃ বাঙালি হ’, ‘আমরা বাঙালি’, ‘জয় সোনার বাংলার এবং বাংলাদেশ’ ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবন্ধুর জীবনীকারগণ লিখেছেন-

শরীরের গড়ন হ্যাংলা ও ছিপছিপে আর লম্বা হওয়ার কারণে ভলিবল খেলায় তিনি ছিলেন পারদর্শী, তবে সবচেয়ে প্রিয় ছিল গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারীনৃত্য। এখান থেকেই তাঁর বাঙালি চরিত্রের উন্মেষ।

অর্থাৎ পল্লীবাংলার দুর্গত মানুষ তথা কৃষক-শ্রমিকদের দুরবস্থার উন্নয়ন চিন্তা, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা আর ধর্মনিরপেক্ষ সাম্যবাদী মানসিকতা তিনি ব্রতচারী আন্দোলন থেকেই লাভ করেছিলেন। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্যবাদী চরিত্র গঠনে ব্রতচারীদের প্রতি গুরুসদয়ের কঠোর নির্দেশ:

কে হিন্দু, কে মুসলমান, জানেন তা ভগবান:
দেশের সেবায় জীবনপাত, কর ভুলে তুই কে কোন জাত।

আগেই বলেছি, গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলন বাংলার স্বদেশপন্থী নেতা ও বুদ্ধিজীবীমহলে নতুনভাবে স্বদেশী চেতনা সঞ্চার করে দিয়েছিল। এখানে একটা বিষয়

গরুত্বসহকারে উল্লেখ্য যে, ১৯৩৯ সালে গুরুসদয় দত্ত সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে শাশ্বত সোনার বাংলার একটি মানচিত্র প্রণয়ন করেন এবং বাঙলাদেশ নামে একটি অখণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নিয়ে শেরে বাংলা, শরৎ বসু, সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ বাঙালি নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে আলোচনা করেন। নেতারা গুরুসদয়ের এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। বলাবাহুল্য যে, এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে শেরে বাংলা কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ছিল মূলত অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের একটি কৌশলী উদ্যোগ যা জিন্নাহর তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের প্যাঁচে পড়ে পাকিস্তান প্রস্তাবে পরিণত হয়। পুনরায় ১৯৪৭ সালের দেশ বিভক্তিকালে সোহরাওয়ার্দী-শরৎবসুর উত্থাপিত স্বাধীন যুক্তবাংলার দাবিও হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক চক্রান্তের কবলে পড়ে ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯৪০ সালে ব্রতচারী শেখ মুজিব ছিলেন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে-বাংলা ফজলুল হক এবং খাদ্যমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী দুজনই এলেন স্কুল পরিদর্শনে। তাঁরা উভয়েই কিন্তু ব্রতচারী আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্কুলের হোস্টেলের চাল মেরামত সংক্রান্ত একটি দাবি নিয়ে ব্রতচারী ছাত্রনেতা মুজিবের এক সাহসী প্রয়াস দেখে মন্ত্রীদ্বয় যারপরনাই মুগ্ধ হলেন। ব্রতচারী শেখ মুজিবের জীবনে আরেকটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটলো। দুর্ধর্ষ বাঙালি রাজনীতিবিদ শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নজরে পড়ে গেলেন ব্রতচারী শেখ মুজিব। গুরুসদয়ের বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় আপ্লুত রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাতেই রাজনীতির জগতে অনুপ্রবেশ ঘটলো ব্রতচারী শেখ মুজিবের। ১৯৪১ সালের ২৫ জুন বাঙালি জাতিসত্তার মুক্তির প্রেরণা এবং শেখ মুজিবের মাতৃভূমি প্রেমের দীক্ষাগুরু গুরুসদয় দত্তের মহাপ্রয়াণ ঘটে। কিন্তু ব্রতচারী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা থেমে থাকেনি।

১৯৪২ সালে শেখ মুজিব প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হলেন। সেখানেও গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের প্রভাব ছিল পুরোমাত্রায়। ব্রতচারী আন্দোলনের স্বদেশপ্রেম ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা হৃদয়ে লালন করে শেখ মুজিব জড়িয়ে পড়লেন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে। কলকাতায় গিয়ে নেতাজি সুভাষ বসুর হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলনের কথা এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য নেতাজির স্বদেশ ত্যাগের রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনার পর যুবক মুজিবের হৃদয় নতুনভাবে শিহরিত হয়ে উঠলো। তিনি নেতাজির উডবার্ন পার্কের বাসায়ও যাতায়াত করতেন এবং নেতাজির অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ঘটে। ১৯৪৪ সালে মুজিব যখন বিএ ক্লাসের ছাত্র তখন নেতাজির আজাদ হিন্দু ফৌজ দিবসে কলকাতার বেকার হোস্টেলের অদূরে পুলিশের গুলিবর্ষণে আব্দুস সালাম নামে জনৈক সুভাষ-প্রেমিকের মৃত্যু ঘটে। এ ঘটনায় নেতাজির কর্মকাণ্ডের প্রতি মুজিব আরও বেশি আকৃষ্ট হলেন। নেতাজির সংগ্রামী জীবন ও আজাদ হিন্দু ফৌজের বীরত্ব গাথা মুজিবের প্রতিবাদী হৃদয়কে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে। তখন থেকেই তিনি অনুধাবন করলেন যে, প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামের

মাধ্যমে ব্রতচারী আন্দোলনের বাঙালি জাতীয়তাবাদ তথা বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর জীবনে নিখাদ মাতৃভূমি প্রেম, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ধর্মনিরপেক্ষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রাপ্তি ঘটেছে কৈশোরে গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলন থেকে। উদার মনমনাসিকতা ও পল্লীবাংলার কৃষক-শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়ন ভাবনা তাঁর ব্রতচারীচর্চার ফসল।

সাম্রাজ্যবাদী মোগলদের বিরুদ্ধে বীরবাঙালি সেনাপতি ঈশাখাঁর যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নেতাজির সশস্ত্র সংগ্রাম এবং বিপ্লবী নায়ক সূর্যসেনের সশস্ত্র বিপ্লব থেকে তিনি বাঙালির স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করেছিলেন। অপরদিকে দুর্ধর্ষ রাজনীতিবিদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে থেকে শিখেছিলেন সাংগঠনিক দক্ষতা ও নির্বাচনী কলাকৌশল আর পার্লামেন্টারি রাজনীতির সুচতুর পদক্ষেপগুলো। আর মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর কাছ থেকে রপ্ত করেছিলেন বক্তৃতার দেহাতী ভাষা। এসব গুণাবলীর সমন্বয়ে পাকিস্তানি শাসকচক্রের কবল থেকে মাতৃভূমি পূর্ববাংলার মুক্তির জন্য ২১৪ বছরের প্রান্তে তিনিই গড়ে উঠেছিলেন যোগ্যতম নেতৃত্বরূপে।

আমৃত্যু তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কিন্তু যৌবনের ব্রতচারী আদর্শ ক্রিয়াশীল ছিল। ১৯৪৮ সালের পর থেকেই তাঁর হৃদয়ে বাংলা মায়ের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নতুনভাবে জেগে উঠেছিল। আর সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তিনি রাজনীতির মাঠে যথাপ্রয়োজনীয় কর্মসূচি নিয়ে ক্রমে ক্রমে এগুতে লাগলেন। ১৯৬৮ সালে তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ফাঁদে আটকে দিলো পাক-সরকার। ১৯৬৯-এর দুর্বার গণআন্দোলনের ফলে মুক্তি পেলেন তিনি। কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন মাতৃভূমির নামকরণ কী হবে, এ নিয়েও তিনি অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু কারও মতামতে তিনি তুষ্ট হতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯-এর ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীর আলোচনা সভায় তিনি তাঁর ব্রতচারী আন্দোলনের স্মৃতি রোমন্থন করে গুরুসদয় দত্তের বাংলাদেশ নামক বিখ্যাত ব্রতচারী সঙ্গীতের নামকরণকেই চয়ন করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে পূর্ববাংলার নাম ঘোষণা করলেন–বাংলাদেশ। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের স্লোগানটিও গুরুসদয়ের ব্রতচারী আন্দোলনের অখণ্ড স্বাধীন বাংলার স্লোগান জয় সোনার বাংলার থেকে পূর্ববাংলার জন্য কেবল জয় বাংলা শব্দ দুটি নির্ধারণ করলেন। এ বিষয়ে অনেকেই প্রকৃত ইতিহাস না জানার কারণে ভিন্ন তথ্যও প্রদান করেছেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এই অনন্য স্লোগান দিয়েই আমরা সুদীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর আমাদের মাতৃভূমি পূর্ববাংলাকে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম।'

৬৯ থেকে রাজনীতিতে নতুন মোড়

১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী ঘোষণার পরও পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুটোর পরামর্শে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এতে অতি সাধারণ বাঙালিরাও বুঝে নেন যে, পাকিস্তানিদের সঙ্গে একই পতাকাতলে আর বসবাস করা সম্ভব হবে না। বঙ্গবন্ধুর পরামর্শক্রমে স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতৃবৃন্দ জনগণকে সাথে নিয়ে ছয়দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে রাজপথে নেমে স্বাধীনতার প্রতি প্রকাশ্য ইঙ্গিতসহ নানা স্লোগান নিয়ে মাঠে নামেন। চারদিকে রব উঠতে থাকে 'পিন্ডি না ঢাকা-ঢাকা ঢাকা' 'তোমার আমার ঠিকানা– পদ্মা মেঘনা যমুনা,' 'তোমার নেতা আমার নেতা– শেখ মুজিব শেখ মুজিব।' যতই দিন যাচ্ছিল ততই বঙ্গবন্ধুর একচ্ছত্র নেতৃত্বের প্রতি স্বাধীনতার জন্য আগ্রহী অন্য প্রায় সব দলের নেতৃবৃন্দ এমনকি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও সমর্থন জানান। অন্যদিকে কেউ 'পূর্ব বাংলা স্বাধীন করো', কেউ 'পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করো,' আর কেউ 'স্বাধীন সার্বভৌম গণবাংলা কায়েম করো' ইত্যাদি ভাসা ভাসা স্লোগান উপস্থাপন করতে থাকে বিভিন্ন প্রচার পত্রের মাধ্যমে। তবে ওই সব রাজনৈতিক দল বা সংগঠন ৭১ এর মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত 'বাংলাদেশ' বা 'স্বাধীন বাংলাদেশ', শব্দ উচ্চারণ করেননি। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ছিলেন এগিয়ে। তার প্রমাণ মেলে ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে তাঁর পূর্ব পাকিস্তানের নাম 'বাংলাদেশ' ঘোষণার মধ্য দিয়ে। ১৯৬৯ এর ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু দিবসের এক আলোচনা সভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "এক সময় এদেশের বুক হইতে মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির শেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে,... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। আমি ঘোষণা করিতেছি আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'। সে সময় থেকে স্বাধীনতাপন্থীদের স্লোগান ছিল 'জয় বাংলা', 'আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ'।

মাওলানা ভাসানী প্রথম থেকে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে মাঝে মধ্যে কথা বললেও পূর্ণ স্বাধীনতার ব্যাপারে ছিলেন দোদুল্যমান। ১৯৬৩ সালে তিনি আইউব খান সরকারের প্রতিনিধি হয়ে চীন সফর করে আসার পর থেকে চীনের পরামর্শে পাকিস্তান সরকারকে 'ডিস্টার্ব' না করার নীতি গ্রহণ করেন। তাঁর দল ন্যাপ ছয় দফাকে সিআইএ-এর দলিল হিসেবে আখ্যায়িত করে। ১৯৬৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলে পিকিংপন্থি বা কাউন্সিলপন্থি ন্যাপের দু'দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে মাওলানা ভাসানী পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন। সেখানে তিনি 'স্বাধীন বাংলা' আন্দোলনের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। ওই সময়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং সামরিক বাহিনীর অনেকে জেলে আটক ছিলেন। অবশ্য '৬৯ এর প্রথমদিকে জেলখানা থেকে বঙ্গবন্ধুর অনুরোধক্রমে মাওলানা ভাসানী শেখ মুজিবসহ রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে সভা-সমাবেশ শুরু করেন। একাত্তরের ৭ মার্চের পর থেকে তিনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতার ব্যাপারে আশাব্যঞ্জক কথাবার্তা বলতে থাকেন, যদিও 'বাংলাদেশ' শব্দটি ব্যবহার তাঁর অজ্ঞাত কারণে আপত্তি ছিল। ৯ মার্চ তিনি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় খোলামেলা ঘোষণা করেন সাত কোটি বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। তিনি ঘোষণা করেন সাত কোটি বাঙালিকে ২৫ মার্চের মধ্যে স্বাধীনতা দানের দাবি মেনে না নিলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে এক হয়ে বাঙালির স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করবেন। তিনি ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানান পাকিস্তানকে ভাগ করে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের জন্য। তিনি বলেন, 'আমার তিনটি ছেলে, তার মধ্যে শেখ মুজিব একটি।' তিনি আশা করেন শিগগিরই 'পূর্ব পাকিস্তান' বা 'পূর্ব বাংলা' স্বাধীন হবে।

ওই জনসভায়ই মাওলানা ভাসানী ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে শেখ মুজিবের আপসের আশঙ্কা নাকচ করে দিয়ে তাঁর ওপর (শেখ মুজিবের ওপর) আস্থা রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনারা তাকে অবিশ্বাস করবেন না। আমি তাকে ভালো করে চিনি।' ইতিহাস প্রমাণ করে তৎকালীন বামপন্থী রাজনৈতিক দল এবং প্রগতিশীল বলে দাবিদার কতিপয় সংগঠন বাঙালির স্বাধিকার ও তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে গুঞ্জরিত বাসনার কথা বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ৭০-এর দশকের শুরু থেকে তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব ক্রমেই লোপ পেতে থাকে। এক্ষেত্রে জনগণের কাছে বঙ্গবন্ধুই হয়ে ওঠেন বাঙালির আকাঙ্ক্ষা পূরণের একমাত্র যোগ্যতম প্রতিনিধি, সে সাথে তাঁর দল আওয়ামী লীগ।

সে সময়কার আন্দোলনে নিজেদের ভূমিকা যে ভুল ছিল সে সম্পর্কে তৎকালীন ভাসানী ন্যাপের অন্যতম নেতা (পরবর্তীতে বিএনপি মহাসচিব ও মন্ত্রী) প্রয়াত আবদুল মান্নান ভূঁইয়া লিখেছেন, 'ষাটের দশকের বিভিন আন্দোলনের মধ্যদিয়ে কৃষক-শ্রমিক মধ্যবিত্ত নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে ৬৯-এ গণঅভ্যুত্থান ঘটে। এসব আন্দোলনে প্রগতিশীলদের ভূমিকা কাজ করেছে নিয়ামক হিসেবে। তাদের ভূমিকা ছিল ব্যাপক। কিন্তু বামপন্থীদের কোনো কোনো অংশের ভুলের কারণে পরিস্থিতি

ভিন্নখাতে মোড় নেয়।
রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবক্তা হয়েও বামপন্থীরা ছয় দফার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করায় এবং সত্তরের নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকায় রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। জনগণের সমকালীন দাবির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে কেউ কেউ শ্রেণী সংগ্রামের রাজনীতি অব্যাহত রাখে। ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে যায় আওয়ামী লীগ এবং ৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের একক নেতৃত্ব। এরপর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানিদের অনীহা ও চক্রান্ত একাত্তরের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে।'
বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দও আস্থাশীল হয়ে ওঠেন সম্ভাব্য বিকল্প নেতৃত্বের কোনো সন্ধান না পেয়ে। ৯ মার্চ পল্টনের জনসভায় জাতীয় লীগ প্রধান (যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে মুখ্যমন্ত্রী '৫৬-৫৮, এবং এরশাদ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, ৮৫-৮৬) খান আতাউর রহমান কাল বিলম্ব না করে বাংলার জাতীয় সরকার গঠনের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি আহ্বান জানান। ১১ মার্চ সিএসপি ও ইপিসিএস সমিতির পদস্থ বাঙালি সরকারি কর্মচারীরা শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান এবং আওয়ামী লীগের তহবিলে একদিনের বেতন দান করেন।
১৫ মার্চ বায়তুল মোকাররমে স্বাধীন বাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এক্ জনসভায় আসম আবদুর রব (পরবর্তীতে জাসদ নেতা) ঘোষণা করেন 'বাংলাদেশ আজ স্বাধীন, আমাদের ওপর সামরিক বিধি জারি করার ক্ষমতা কারো নেই। বাংলাদেশের জনগণ একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশই মেনে চলবে।' আবদুল কুদ্দুস মাখন বলেন, 'বাংলাদেশে যদি কোনো আইন জারি করতে হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানই তা করবেন।' ৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জানিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে জনতার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করা হয়।
'৭১ এর মার্চে সারাদেশে (বাংলাদেশে) প্রশাসন, ব্যাংক, বীমা, ডাক, তার বিভাগ, কোর্ট কাচারি, রেডিও টেলিভিশন সবকিছুই কেবলমাত্র বঙ্গবন্ধুর নির্দেশক্রমে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এবং তার অগ্রগামী সংগঠন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় চলতে থাকে। এ অবস্থায় ভুট্টো-ইয়াহিয়া-সামরিক চক্রের মাথা ঘুরে যায়। দেশব্যাপী স্বাধীন বাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কৌশলে যুদ্ধ প্রস্তুতির কথাও কারো জানতে বাকি রইল না। এরই মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যকার আলোচনায় ইতিবাচক ফলাফল না দেখে দেশের ছাত্র ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর প্রতি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন। ২১ মার্চ চট্টগ্রামে এক জনসভায় মাওলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান শেখ মুজিবের

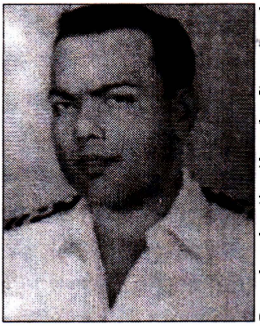
নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্যে। মাওলানা ভাসানী বলেন, 'শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলে বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে।' লক্ষণীয়, মাওলানা ভাসানী এই প্রথম 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা' কথাটি বললেন। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। ওইদিন পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার বদলে সারা বাংলায় ওড়ানো হয় 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' নির্ধারিত বাংলাদেশের নতুন জাতীয় পতাকা। ওইদিন পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জয়বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধুর চার-খলিফা খ্যাত নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আসম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। সেই কুচকাওয়াজে জাতীয় সংগীত হিসেবে বাজানো হয় 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' কুচকাওয়াজ শেষে মার্চপার্টি করে জয়বাংলা বাহিনীর সদস্যরা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গেলে তিনি রক্ত দিয়ে বাঙালিদের অধিকার আদায়ে তাঁর দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন। তাঁর বাসভবনেও সেদিন টাঙিয়ে দেওয়া হয় নতুন জাতীয় পতাকা। এভাবে ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ষাটের দশকের আগে থেকেই পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসানের জন্য শেখ মুজিব স্বাধীনতাকে লক্ষ্য করে তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। আর এ লক্ষ্য পূরণে সামরিক-বেসামরিক সব পর্যায়ে জেগে ওঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন শক্তি ও সংগঠনগুলোকে একই কাতারে সামিল করতে পেরেছিলেন। আর সংগ্রামে অবিচল থাকার অঙ্গীকার বজায় রাখার মধ্য দিয়ে তৎকালীন নবীন প্রবীণ সব নেতাকে ডিঙিয়ে একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর নামে পরিচালিত হয় '৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ।

অপ্রকাশিত জবানবন্দি

(আসামিদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তি, মৃতদের নিকটাত্মীয় ও
ঘটনার সঙ্গে জড়িত অথচ আসামি হননি
এমন ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের
ভিত্তিতে তৈরি লেখা)

পাকিস্তানিদের নিয়ে একসঙ্গে থাকা যায় না

লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন



ষাটের দশকের শুরু থেকে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে বাঙালি সৈনিকদের ওপর শোষণ, বঞ্চনা ও নিগ্রহের প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্বাধীনতার যে চেতনা জেগে ওঠে এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেনা সদস্যদের নিয়ে যে বিপ্লবী সংগঠনের সূচনা হয় তার সামরিক নেতৃত্বে ছিলেন লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি ছিলেন 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' মামলার (তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা) ২নং অভিযুক্ত আসামি। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ রাতেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মোয়াজ্জেম হোসেনকে তাঁর বাসা থেকে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। পাকিস্তান নৌবাহিনীতে চাকরিরত এই সেনা কর্মকর্তার সাহস, বুদ্ধিমত্তা, দেশপ্রেম, সাংগঠনিক তৎপরতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চাভিলাসী সম্পর্কে তাঁর সহযোগী নানা জনের কাছ থেকে নানা তথ্য পাওয়া গেছে যা সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তাঁর স্ত্রী হিসেবে কোহিনুর হোসেনের অনেক কিছু জানার কথা স্বামী মোয়াজ্জেমের কর্মতৎপরতার নানা দিক সম্পর্কে। তাই তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। ২০০৭ সালের ১৮ মার্চ সন্ধ্যায় তাঁর ধানমন্ডির বাসায় বসে নেওয়া এই সাক্ষাৎকারে মিসেস মোয়াজ্জেমের কণ্ঠে বেরিয়ে এসেছে অনেক অজানা তথ্য। ছোট বেলায় মোয়াজ্জেম হোসেনের ডাক নাম ছিল মনু হোসেন। জন্ম ১৯৩১ সালে গ্রামের বাড়ি পিরোজপুর জেলার ধুসরিতাল গ্রামে। বাবার নাম মৌলভি মোফাজ্জল আলী। ১৯৪৭ সালে পিরোজপুর কচুয়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৫০ সালে বরিশাল বিএম কলেজে আইএসসি পড়ার সময় পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগ দেন মোয়াজ্জেম। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে লন্ডন পাঠানো হয় রাজকীয় নৌবাহিনীর সঙ্গে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য। ৫৭ সালের ডিসেম্বরে প্রশিক্ষণ শেষে কমিশন পেয়ে করাচির কর্মস্থলে ফিরে যান তিনি। ৫৮ সালের প্রথম দিকে দেশে এসে ১১ ফেব্রুয়ারি বিয়ে করেন বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ির পাংশা গ্রামের ১৬ বছরের তরুণী স্কুল ছাত্রী কোহিনুর বেগমকে। ৫৯ সালের এপ্রিলে আবারও লন্ডনে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্পেশাল কোর্স

করে ৬০ সালের মে মাসে দেশে (করাচি) ফেরেন।

মিসেস মোয়াজ্জেম স্ত্রী হিসেবে প্রায় সময় (৫৯-৬০ সাল থেকে) খেয়াল করতেন তাঁর স্বামীর মনের ভেতর কী যেন একটা ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। কখনো কখনো মুখ ফুটে কিছু একটা বলতে চাইলেও পরক্ষণে আবার লুকোতে চাইতেন। কথার ফাঁকে কথা, বিভিন্ন লোকজনের যাওয়া-আসা, গতিবিধি এবং দু একজন সহকর্মীর সঙ্গে মোয়াজ্জেমের আলাপের সূত্র ধরে মিসেস কোহিনুর বুঝতে পারেন, তাঁর স্বামী কোনো না কোনো কারণে পাকিস্নানিদের ওপর ক্ষুব্ধ এবং এ নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ পরামর্শ করছেন। তবে 'আগরতলা মামলা' শুরু বিশেষ করে মোয়াজ্জেমের গ্রেপ্তারের আগে পর্যন্ত স্পষ্ট জানতেন না যে তাঁর স্বামী বা শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতির মতো বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যস্ত। অবশ্য তিনি মামলার অনেক আগেই শুনেছেন শেখ মুজিবসহ মামলার আসামিদের বেশ কজন তাঁদের করাচির বাসায় গিয়েছেন অতিথি হিসেবে। চট্টগ্রামে থাকাকালে বাসায় তাঁর স্বামী কথা বলেছেন কর্নেল (অব.) ওসমানীর সঙ্গে। বরিশালের বাসায়ও যাতায়াত ছিল বিভিন্ন জনের। মিসেস কোহিনুর 'অতিথিদের' জন্য কখনো চা-নাস্তা, কখনো ভাতের আয়োজন করেছেন স্বামীর নির্দেশে। তবে সামনে আসেননি কখনো। পর্দার আড়ালে থেকে ভাসা ভাসা অস্পষ্ট কথা শুনলেও এ নিয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, '৫৯-৬০ সালে লন্ডনে বিশেষ কোর্স করার সময় মোয়াজ্জেম মাঝে মাঝে দাপ্তরিক কাজে করাচির কর্মস্থলে যাওয়া আসা করতো। লন্ডনে কিংবা করাচিতে কর্মস্থল নিয়ে কখনো কথা উঠলেই তাঁর (মোয়াজ্জেমের) কণ্ঠ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো। গালাগাল দিতো পাকিস্তানি-পাঞ্জাবিদের। বলতো 'বেটারা আমাদের দেখতে পারে না।'

মাঝে মাঝে দেখতাম, বাসায় বসে আনমনে কী যেন ভাবছে সে। আমার বয়স তখনো কম হওয়ায় আমি তেমন কিছু বুঝতাম না বা বুঝতে চাইতাম না। কখনো কিছু জানতে চাইলেও বলতো না সে। হয়তো সে মনে করতো মেয়েদের পেটে কথা থাকে না, কখনো কোথাও যদি বলে দিই।

১৯৬০ সালে লন্ডনে আমার বড় ছেলের জন্মের পর আমরা দেশে (করাচিতে) ফিরি। এরপর থেকে পাকিস্তানিদের ব্যাপারে তার বিতৃষ্ণা আরো বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে দেখি বাসায় বিভিন্ন লোকজন আসতে শুরু করে। পদস্থ অফিসারদের চাইতে জুনিয়র অফিসার ও সিপাই শ্রেণীর লোকজন বেশি আসতেন। সেও কারো কারো বাসায় যেতো। আমি কখনো কখনো বিরক্ত হতাম, ওসব লোকের জন্য বিভিন্ন আয়োজন করার ঝামেলার জন্য। সে (মোয়াজ্জেম) বলতো, 'পাকিস্তানিদের নিয়ে এক সঙ্গে থাকা যায় না, ভাত রুটি খাওয়া যায় না। ওরা বাঙালিদের সঙ্গে প্রায় সময় খারাপ ব্যবহার করে। কাজেই আমাদের লোকজন এলে যেন কিছু না খেয়ে না যায়। সামান্য ডাল ভাতও যদি এদের খাওয়াও তাতেই তাঁরা খুশি হবে। পাকিস্তানিদের আচরণ যদি তুমি দেখতে তাহলে বুঝতে।' সে কোথায় কার কাছে যেতো কিংবা আমাদের বাসায় কারা আসতেন এসব আমি জানতে

চাইতাম না, তাঁদের কোনো কথা বুঝতামও না। আমি শুধু ভেতর থেকে চা-নাস্তা বা খাবার পাঠাতাম। পরে যখন দু একটা ঘটনা ঘটে তখনই বুঝতে পারি, মোয়াজ্জেম ওদের সিপাই কর্মকর্তাদের সংগঠিত করার কাজ করছিল।'

মোয়াজ্জেমের বাসায় শেখ মুজিব

মিসেস মোয়াজ্জেম জানিয়েছেন, ৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের আগে পাকিস্তান নৌবাহিনীর তৎকালীন একজন কর্মকর্তা ডা. খুরশিদ উদ্দিন (৩৪নং আসামি) প্রায় সপ্তাহে রাতে তাঁদের বাসায় যেতেন। তাঁদের সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছিল রোববার। মোয়াজ্জেম সাহেব মাঝে মাঝে শনিবার ঢাকা আসতেন। রোববার এখানে থেকে সোমবার সকালের ফ্লাইটে করাচি ফিরে গিয়ে অফিস করতেন। ডা. খুরশিদ কখনো কখনো তাঁর স্কুটার দিয়ে মোয়াজ্জেম সাহেবকে বিমান বন্দরে পৌঁছে দিতেন ঢাকা আসার সময়। আর মিসেস মোয়াজ্জেমকে বলতেন 'কেউ খোঁজ করলে বলো, বাইরে গেছে।' মিসেস মোয়াজ্জেমের স্মৃতি থেকে; 'আমার জানা মতে, শেখ সাহেব আমাদের করাচির বাসায় গিয়েছিলেন সম্ভবত ১৯৬৪ সালের জুন-জুলাই মাসের কোনো এক রাতে। ওই দিন বিকেলে মোয়াজ্জেম অফিস থেকে এসে আমাকে বললো, 'একটু ভাল নাস্তা তৈরি করো, কয়েকজন অতিথি আসবেন।' আমি যথারীতি চা-নাস্তা তৈরি করেছি। রাতে অতিথি কয়েকজনও এসে চা-নাস্তা খেয়ে কথাবার্তা বলে চলে গেছেন। কিন্তু কারো সামনে না যাওয়ায় কাউকে সরাসরি চিনতে পারিনি। পরে একদিন মোয়াজ্জেমই বলেছিল, 'ওইদিন বাসায় শেখ সাহেব ও আহমদ ফজলুর রহমানরা এসেছিলেন।' আহমদ ফজলুর রহমান তখন করাচিতে থাকতেন।

এমনিতে শেখ সাহেব ছিলেন আমার বড় ভাই ডা. একেএম আশরাফের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বড় ভাই মুসলিম লীগের প্রভাবশালী সদস্য হলেও তাঁর সঙ্গে তুই-তোকারি সম্পর্ক ছিল শেখ সাহেবের। আমার আব্বাকে পায়ে ধরে সালাম করতেন তিনি। অবশ্য বড় ভাই পরে 'তকমায়ে খেদমত পার্টি' করেছেন। স্বাধীনতার পর ৮৩/৮৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন তিনি। আমাদের পরিবারের সাথে শেখ সাহেবের সম্পর্কের বিষয়টি জানা থাকলেও মোয়াজ্জেমের সঙ্গে গোপন সম্পর্কের বিষয়ে কিছুটা জেনেছি আগরতলা মামলা উদ্ভবের পর।

মোয়াজ্জেম জানিয়েছিল, তাদের সংগঠিত হওয়া ও আন্দোলন (বিদ্রোহ) সফল করার জন্য টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সমর্থন প্রয়োজন ছিল। সিএসপি রুহুল কুদ্দুস ও আহমদ ফজলুর রহমানরা মোয়াজ্জেমদের বলেছিলেন, 'তোমরা শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করো, তিনি সব ঠিক করে দেবেন।' এরপর মোয়াজ্জেম শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করলে তিনি প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দেন। এরপর আমার বাসায় তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। পরে শেখ সাহেব তাকে (মোয়াজ্জেমকে) ওঝার সঙ্গে (ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি) পরিচয় করিয়ে দেন।"

শেখ মুজিবের সঙ্গে মোয়াজ্জেমের যোগাযোগের প্রমাণ হিসেবে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ

করেন মিসেস মোয়াজ্জেম। বললেন, "গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বরিশাল থাকতে সে (মোয়াজ্জেম) আমার শাড়ির একটি প্যাকেটের ভেতর কিছু কাগজ বেঁধে রেখে আমাকে বলেছিল, 'যদি কখনো আমার কিছু হয়, তাহলে এই কাগজগুলো পুড়ে ফেলবে।' সেখানে একটা পিস্তলও ছিল। আর একটা মানি ব্যাগ দিয়ে বলেছিল, 'এই ব্যাগটার ভেতর একটা জিনিস আছে, সেটিও নষ্ট করে ফেলবে।' ওর কী হবে জানতে চাইলে বলেছিল, 'না যদি কিছু হয় আর কি?' তার যে কী বিপদ হতে পারে তা আমার মাথায় তখনো আসছিল না। গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েকদিন আগে দেখি ওর মানি ব্যাগে শেখ সাহেবের কিছু কাগজপত্র ছিল। সেখানে বেগম মুজিব কার কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছিলেন সেরকম কিছু হিসাবও ছিল। তবে কারো নামধাম আমি মনে রাখিনি। তাঁকে (মোয়াজ্জেমকে) নিয়ে যাওয়ার পর সকালে আমি বাথরুমে গিয়ে ম্যাচের কাঠি দিয়ে সেই মানি ব্যাগটা পুড়ে ফেলি। পিস্তলটা ওরা নিয়ে গিয়েছিল গ্রেপ্তারের সময়।

করাচির বাসায় মাঝে মাঝে খেয়াল করতাম মোয়াজ্জেম রাত জেগে একাকী কী যেন লিখতো। পরে জেনেছি সে দেশের জন্য ম্যানিফ্যাস্টো লিখতো।"

মিসেস মোয়াজ্জেম জানান, পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ মোয়াজ্জেমকে সাবমেরিনে নিয়োগের জন্য মনোনীত করেছিল। কিন্তু তিনি নানাভাবে চেষ্টা চালান ঢাকায় বদলি হয়ে আসার জন্য। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখাশোনার প্রয়োজন ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশে বদলি হয়ে আসেন। প্রথমেই পোস্টিং হয় অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সংস্থার চট্টগ্রাম অফিসে। ৬৭ সালে যান বরিশালে।

চট্টগ্রামের বাসায় ওসমানী

চট্টগ্রামে মোয়াজ্জেম সাহেবের বাসা ছিল জুবিলি রোডের বিপরীতে নৌ বাহিনী অফিসার্স মেস/ কোয়ার্টারে। সেখানেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহের পরিকল্পনা বাস্বায়নের ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল মোয়াজ্জেমের। এরকম একদিন মিসেস মোয়াজ্জেম দেখেন কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীসহ আরও কয়েকজন চট্টগ্রামে মোয়াজ্জেমের বাসায় এসেছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে (ওসমানী- মোয়াজ্জেম) কি কথা হয়েছে তা তিনি বুঝতে পারেননি। এ ব্যাপারে মিসেস মোয়াজ্জেম বলেন, "আমি তখন জানতাম না ওসমানী সাহেব কেন এসেছেন। পরে জেনেছি তাঁদের বিদ্রোহের পরিকল্পনা নিয়ে ওসমানী সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ওসমানী সাহেব তখন সিনিয়র অফিসার। মোয়াজ্জেম জুনিয়র। সে নাকি তাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে ওসমানী সাহেবকে বলেছিল, 'স্যার, আপনারা যদি উৎসাহ দেন তাহলে আমরা সফল হবো।' তবে ওসমানী সাহেব নাকি তখন খুব একটা উৎসাহ দেখাননি। বলেছিলেন, 'এখন এ ধরনের বিদ্রোহ করার সময় নয়। যা হয় ভেবে চিন্তে করতে হবে।'

বরিশাল থাকতেও কখনো কখনো বিভিন্ন জন আসতেন আমাদের বাসায়। আমি রান্নাবাড়া করে টেবিলে রাখতাম। ওরা আলাপ সালাপ করে খেয়ে দেয়ে কখন চলে যেতো জানতাম না। হয়তো ততক্ষণে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম।

সম্ভবত ১৯৬৬ সালের জুন-জুলাই মাস হবে। বরিশালের বাসায় একদিন মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে দেখি মোয়াজ্জেম কোরান শরীফ পড়ছে। এক পর্যায়ে ঘড়ি দেখে বলে উঠলো, 'ওরা যদি এতক্ষণে যায়, এখন অমুক গ্রামের অমুক জায়গায় (জায়গার নাম মনে নেই) পৌঁছেছে।' আমি ওরা কারা জানতে চাইলেই সে চুপ করে থাকে। কিছু বলে না, পরে জেনেছিলাম ওই সময় স্টুয়ার্ড মুজিব ও আলী রেজার আগরতলা যাওয়ার কথা। তখনো বাঙালি কর্মকর্তাদের কেউ উচ্চ পর্যায়ের ছিলেন না। বেশিরভাগই নিম্ন পর্যায়ের হওয়ায় ভারতীয়রা খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। আলাপ-আলোচনাও তেমন একটা সফল হয়নি। আগরতলা মামলার পর আবার দিল্লী যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তো সব শেষ হয়ে যায়। তাদের দলে আমির হোসেন নামে একজন লোক ছিলেন। শুনেছি সে টাকা পয়সা নিয়ে কিছু গণ্ডগোল করেছে। তাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলে সে ঘটনা ফাঁস করে দেয়।"

মোয়াজ্জেমকে নিয়ে যান নূরুল ইসলাম শিশু

মিসেস মোয়াজ্জেম জানান, আগরতলা মামলা উদ্ভব হওয়ার প্রাক্কালে কমান্ডার মোয়াজ্জেম সপরিবারে ছিলেন বরিশাল। নভেম্বরে ঢাকা আসেন। এ সময় করাচি থেকে চিঠি দিয়ে তাঁকে রাওয়ালপিণ্ডি ডেকে পাঠানো হয়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই তিনি পিণ্ডি গিয়ে বাঙালি সহকর্মীদের মাধ্যমে ইঙ্গিত পান যে, তাঁকে সেখানে যে কোনো সময় গ্রেপ্তার করা হতে পারে। তাই তিনি কৌশলে সরে গিয়ে তিন দিনের মাথায় ঢাকা ফিরে আসেন। মিসেস মোয়াজ্জেম তখন ছিলেন শান্তিনগরে দেবরের বাসায়। স্বামীর দ্রুত ফিরে আসার ঘটনায় তিনি প্রথমে কিছুটা অবাক হন। সেখান থেকে চলে যান শান্তিনগরেরই মিসেস মোয়াজ্জেমের বোনের বাসায়। সেখান থেকে ৯ ডিসেম্বর রাতে গ্রেপ্তার হন মোয়াজ্জেম। তখন তাঁর শরীরে প্রচণ্ড জ্বর ছিল। রাতে ক্যাপ্টেন নূরুল ইসলাম শিশু (পরে বিএনপি নেতা), আমির হোসেন (রাজসাক্ষী) এবং অন্য কিছু সংখ্যক লোক এসে তাঁকে নিয়ে যান। নূরুল ইসলাম বলেছিলেন, 'একটা মিটিংয়ে যেতে হবে, ঘণ্টাখানেক পর দিয়ে যাবো।' কিন্তু পরে আর দিয়ে যাননি। পরদিন সকাল বেলা পুলিশ এসে ঘরের ভেতর থেকে মোয়াজ্জেমের বই, কাগজপত্র যা পেয়েছেন খুঁজে নিয়ে যায়।

অবশ্য মোয়াজ্জেম তাঁর লিখিত জবানবন্দিতে ৯ ডিসেম্বর ঢাকায় গ্রেপ্তার হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেননি। এতে তিনি ৩ ডিসেম্বর বিকেলে পিণ্ডি পৌঁছার পর সাদা পোশাক পরা দুজন লোক তাঁকে ইন্টারোগেশন সেলে নিয়ে যায় বলে উল্লেখ করেন। ধারণা করা হয়, ঢাকায় পালিয়ে আসার বিষয় আদালতে স্বীকার করলে তা ক্ষতিকর হতে পারে এই আশঙ্কায় মোয়াজ্জেম কৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে যান।

অর্থ পেতাম মানিক চৌধুরীর কাছ থেকে

সুলতান উদ্দিন আহমদ



পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রথম দিকে যে ক'জন নৌসেনা গোপন প্রক্রিয়া শুরু করেন তাঁদের একজন গাজিপুর জেলার কাপাশিয়া উপজেলার উত্তর খামার গ্রামের প্রয়াত শামসুদ্দিন আহমদের ষষ্ঠ ছেলে সুলতান উদ্দিন আহমদ। তিনি কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৪ নম্বর আসামি। ১৯৯৩ সালের ১৫ জানুয়ারি তিনি মারা যান। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ২০০৭ সালের ১৩ মার্চ তাঁর ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভেনিউর কাছে মনিপুরি পাড়ার বাসায় গিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু তাঁর (স্ত্রীর) সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, স্বামীর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে তাঁর তেমন কোনো ধারণা নেই। তবে সুলতান উদ্দিনের ছোট ভাই সত্তরের দশকের ছাত্রলীগ নেতা ও স্বাধীনতা পরবর্তী জাসদের ঢাকা নগর কমিটির সদস্য কামাল উদ্দিনের কাছ থেকে জানা যায় বেশ কিছু তথ্য। তিনি জানান, আগরতলা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার আগে পর্যন্ত সুলতান তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পরিবারের কাউকে কোনো কিছু বলেননি। কিন্তু চাকরি চলাকালে বিশেষ করে ষাটের দশকের গোড়ার দিক থেকে ঘন ঘন করাচি থেকে ঢাকায় আসা, ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুল, স্টুয়ার্ড মুজিব ও কামাল উদ্দিন প্রমুখের সঙ্গে একান্তে বৈঠক, তাঁদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সন্দেহজনক ঘোরাফেরা ইত্যাদি দেখে মনে হয়েছে তিনি বা তাঁরা এমন কিছু কাজের সঙ্গে জড়িত যা অন্যকে জানাতে চান না। আগরতলা মামলা থেকে মুক্তির পরও এ ব্যাপারে তেমন কিছু বলতে চাননি সুলতান। তবে মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁকে দেখতে আসা প্রয়াত জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমদ, আসম আবদুর রবের সঙ্গে স্মৃতিচারণ করার সময় কামাল উদ্দিন তাঁদের বিপ্লবী তৎপরতা সম্পর্কে কিছু কথা শুনেছেন। এ ছাড়া মৃত্যুর আগে ভারতের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুলতান উদ্দিন চিকিৎসা খরচ নিয়ে আলাপকালে চট্টগ্রামের মানিক (চৌধুরী ভূপতিভূষণ চৌধুরী) সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলেন।

কামাল উদ্দিন বলেন, "সুলতান ভাই নৌবাহিনীতে যোগ দিয়ে আমেরিকা যাতায়াত এবং পরে বাংলাদেশে আসা-যাওয়ার সময় তাঁর মাঝে উন্নত জীবন-যাপনের একটা মানসিকতা

দেখতে পাই। আব্বাও ভাল চাকরি করতেন। কিন্তু শেষ দিকে আমাদের আর্থিক অবস্থা ভাল যায়নি। এ অবস্থায় সুলতান ভাইকে চিকিৎসার জন্য ভারতের মুম্বাই এ টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু তিনি এত টাকা খরচ করে অপারেশন করাতে রাজি হচ্ছিলেন না। অনেক অনুনয় করে রাজি করানোর পর তিনি ওই রাতেই আমাকে বললেন, 'তোমাকে আমি অনেক টাকা দেব।' মনে হলো আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই তিনি একথা বলছেন। তাই কৌতুহলী হয়ে জানতে চাই 'তুমি কোত্থেকে টাকা দেবে?' বললেন, 'তোমাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি, কারণ মৃত্যুতো কালও হতে পারে। এই যে আমরা স্বাধীনতার জন্য গোপন আন্দোলনটা করেছিলাম তার জন্য যে অর্থের দরকার ছিল সেই অর্থ পেতাম মূলত চট্টগ্রামের এক আওয়ামী লীগ নেতা মানিক চৌধুরীর কাছ থেকে। চট্টগ্রামের একটি ঘরে আমাকে নিয়ে তিনি ভোল্টেজ ভর্তি টাকা দেখিয়ে তার একটা চাবি দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমাদের যত টাকা লাগবে তত টাকা এখান থেকে নিতে পারবে।' সুলতান ভাই আরও বলেন, 'মানিক চৌধুরীর সঙ্গে শেখ সাহেবের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি এখন বেঁচে আছেন কিনা জানি না। বেঁচে থাকলে আমি তোমাকে ওনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।'

ছোট ভাই হিসেবে নিজের পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্টদের উদ্ধৃতি দিয়ে কামাল উদ্দিনের দেওয়া তথ্যে জানা যায়, সুলতান উদ্দিন ১৯৫৪-৫৫ সালে নন কমিশন অফিসার হিসেবে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগ দেন। করাচিতে চাকরিরত অবস্থায় পাকিস্তানিদের আচার-ব্যবহার ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি মুক্তির পথ খোঁজেন। প্রায় একই সময়ে সুলতানের ভগ্নিপতি কামাল উদ্দিন (প্রথমে রাজসাক্ষী ও পরে বৈরী সাক্ষী) পাকিস্তান বাহিনীতে চাকরি করতেন। তিনিও ছিলেন একই রকম ভুক্তভোগী ও বিক্ষুব্ধ। এক পর্যায়ে তাঁরা লে. কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে পাকিস্তানিদের অন্যায় অবিচার থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতে গোপন শলাপরামর্শ করে সংগঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সম্ভবত ৬২-৬৩ সালের দিকে সুলতান উদ্দিনের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান কামাল উদ্দিনের বাসায় যান। সেখানে লে. মোয়াজ্জেম, নূর মোহাম্মদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু, সিএসপি অফিসার খান শামসুর রহমান, আহমদ ফজলুর রহমানসহ অনেকের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বৈঠকে সুলতান উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রথম দিক থেকেই প্রায় সপ্তাহে প্রতি রোববার ছুটির দিন ঢাকা আসতেন। কিন্তু ওই সময়ে ঘরে কিংবা আত্মীয় স্বজনের কাছে গিয়ে না থেকে বাইরের কিছু লোককে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। আগরতলা মামলা সৃষ্টি হলে কামাল বুঝতে পারেন তিনি (সুলতান) ওইসব ব্যক্তিকে নিয়ে গোপন আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজ করছিলেন।

কামাল উদ্দিন স্মৃতিচারণ করে বলেন, '১৯৯২ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে তৎকালীন জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমদ ও আসম আবদুর রব অসুস্থ সুলতান ভাইকে দেখতে আসেন। তখন আরেফ ভাই আবেগপ্রবণ হয়ে অতীতের কিছু স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, তিনি

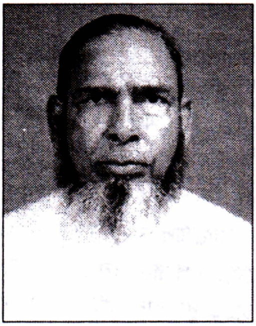
সুলতান ভাই এবং নূর মোহাম্মদ বাবুলকে ৬২ সাল থেকে চিনতেন এবং তাঁরা যে স্বাধীনতার লক্ষ্যে কিছু একটা করতে যাচ্ছেন যে বিষয়ে জানতেন।

আরেফ ভাই বলেছিলেন, স্বাধীনতার জন্য কি কি করতে হবে, কোন কোন দেশের সঙ্গে কী রকম সম্পর্ক করা যায়, কোথায় কার সহযোগিতা পাওয়া যাবে এসব কিছু প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এসব নিয়ে বঙ্গবন্ধু ছাত্রনেতাদের মধ্যে সিরাজুল আলম খান, আরেফ ভাই এবং রাজ্জাক ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতেন। স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস গঠনে তাঁরাই মূল ভূমিকা পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর অনুমতি নিয়ে তাঁরা স্বাধীনতার জন্য গোপন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন।

আমি বিদ্যালয়ে সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকে নূর মোহাম্মদ, স্টুয়ার্ড মুজিবসহ কয়েকজনকে আমাদের মনিপুরী পাড়ার বাসায় আসতে দেখেছি। মনিপুরী পাড়া তখন ছোট একটি গ্রামের মতো ছিল। একদিন সুলতান ভাই আমাকে নিয়ে ঢাকা থেকে জয়দেবপুর যান। সেখানে রাজবাড়িতে অবস্থিত একটি সেনা ক্যাম্পে (বেঙ্গল রেজিমেন্টের) কয়েকজন সেনা সদস্যের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে দেখেছি। তখন আমি পঞ্চম কি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। অতকিছু বোঝার বয়স হয়নি। ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে সুলতান ভাই একদিন বললেন, কিছু বিলাই চিমটি সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য। তাঁর সঙ্গে নূর মোহাম্মদ ও স্টুয়ার্ড মুজিবও ছিলেন। তাঁদের খুবই ব্যস্ত ও বিচলিত দেখাচ্ছিল। ওই রাতে কি পরের দিন রাতে তাঁরা চট্টগ্রাম যান এবং দু-একদিনের মধ্যে ঢাকা ফিরে আসেন। রাতে সুলতান ভাই মগবাজার অয়্যারলেস গেট এলাকায় অবস্থিত দুলাভাই কামাল উদ্দিনের বাসায় ছিলেন। সেখান থেকেই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন আমি মোহাম্মদপুর উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র। গ্রেপ্তারের পর তাঁদেরকে কোথায় নেওয়া হয় জানতাম না। পরে জেনেছি তাঁরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁদের ওপর চরম অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল।'

মুজিবের নির্দেশে সাংগঠনিক কাজ শুরু করি

নূর মোহাম্মদ বাবুল



ষাটের দশকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে গঠিত বিপ্লবী সংগঠনের প্রথম সংগঠকদের অন্যতম নূর মোহাম্মদ বাবুল। এলাকাবাসীর কাছে তিনি ক্যাপ্টেন বাবুল নামে পরিচিত। তিনি নয় সদস্য বিশিষ্ট বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের একমাত্র জীবিত সদস্য, ছদ্মনাম 'সবুজ'। আগরতলা মামলার ৫ নং আসামি। ষাটের দশকের বিপ্লবী আন্দোলন প্রক্রিয়া ছাড়াও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধেও সক্রিয় অংশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৭ ডিসেম্বর ফরিদপুরে পাক সেনারা তিনি এবং ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার বরেন্দ্র নাথের কাছে যৌথভাবে আত্মসমর্পণ করে।

নূর মোহাম্মদ বাবুলের আদি বাড়ি ঢাকা জেলার লৌহজং থানার কুমারবাগ এলাকায়। ছোটবেলায় ব্যবসায়ী বাবা তমিজ উদ্দিন আখন্দের সঙ্গে ফরিদপুর সদরে এসে পড়ালেখা করেন। ১৯৫৩ সালে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই নৌবাহিনীর ভয়েস মেরিনে যোগ দিয়ে করাচি যান এবং ৫৪ সালে করাচি বোর্ডের অধীনে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরে সিডিআই (পরিদর্শক) হিসেবে বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সালে চাকরি হারানোর পর তিনি ফরিদপুর সদরের গোয়াল চামট এলাকায় একখণ্ড জমি কিনে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ২০০৭ সালের ১৬ মার্চ অপরাহ্নে তাঁর বাড়িতে বসে এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। এতে বেরিয়ে এসেছে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালি সেনা সদস্যদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার পেছনের নানা অজানা তথ্য-কাহিনী।

নূর মোহাম্মদ বাবুল জানান, চাকরি জীবনের শুরুতে তিনি এবং অন্য অনেক সহকর্মী পাকিস্তানিদের বিমাতাসূলভ আচরণের শিকার হন এবং তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হন। এক সময় তাঁরা আবিস্কার করেন পাকিস্তানের মোট বাজেটের ৭৫ ভাগ খরচ হয় প্রতিরক্ষা খাতে। এর মধ্যে সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের জন্য খরচ হতো ১০০ টাকায় মাত্র ৩৭ পয়সা। আর পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যদের জন্য খরচ হতো ৭৪.৬৩ টাকা। এ ছাড়া, নিয়োগ পদোন্নতি, ছুটিছাঁটাসহ নানা দিক থেকে বাঙালিরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছিল। এসব নিয়ে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম, স্টুয়ার্ড মুজিব, সুলতান উদ্দিনসহ

বিভিন্ন সময় আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে ৬২ সালের প্রথম দিকে মোয়াজ্জেম সাহেবের বাসায় বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এতে প্রস্তাব আসে বাংলাদেশকে কোনোভাবে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায় কী না। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাঁরা নৌবাহিনীর কিছু লোক গোপনে সংগঠিত হতে থাকেন এবং সময়ে সময়ে ঘরোয়া বৈঠক করে উপায় বের করার চেষ্টা করেন। নূর মোহাম্মদ বাবুল বলেন, 'আমরা পর্যালোচনা করে দেখি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমেরিকা ক্যু ঘটায়। কাজেই আমাদের দেশে একাজের জন্য আমেরিকার কোনো লোক ধরা যায় কি না? বিমান বাহিনীর স্টাফ করপোরাল আমির হোসেন মিয়ার সঙ্গে করাচির তৎকালীন ম্যাগাজিন প্যানোরোমার সম্পাদকের ভালো সম্পর্ক ছিল। তাঁরা দুজনই করাচিতে একই বাসায় থাকতেন। তাঁর মাধ্যমে প্যানোরোমা সম্পাদককে প্রস্তাব দিয়ে আমেরিকার কোনো সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।'

শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রথম বৈঠক ৬২ সালে

তদানীন্তন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে বৈঠক এবং এ প্রক্রিয়ায় তাঁর জড়িত হওয়া সম্পর্কে নূর মোহাম্মদ বলেন, ''আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি যে, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে যেসব রাজনৈতিক নেতা আছেন তাঁদের মধ্যে কারা পূর্ব বাংলার স্বার্থের কথা বলেন। আলোচনায় শেখ মুজিবুর রহমান, সবুর খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, মাওলানা ভাসানী প্রমুখের নাম আসে। তবে সবচাইতে গুরুত্ব পায় শেখ সাহেবের নাম। কারণ বয়সে নবীন হলেও আমাদের জানামতে তিনিই বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানিদের বৈষম্য, শোষণ বঞ্চনা ইত্যাদির ব্যাপারে সবচেয়ে সোচ্চার ছিলেন। তাই তাঁকেই নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমরা জানতে পারি যে, করাচিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বাসভবন লাকামো হাউসে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মেয়ে আকতার সোলায়মান থাকতেন। বঙ্গবন্ধু করাচি গেলে সেখানে থাকতেন প্রায় সময়। ৬২ সালের শেষ দিকে আমরা পত্রিকার খবরে জানতে পারি তিনি করাচি আসছেন। আমাদের মধ্য থেকে সুলতান উদ্দিনকে (৪ নং আসামি) দায়িত্ব দেওয়া হয়, শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আমাদের সঙ্গে একটা বৈঠকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি আসবেন কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য। সে অনুযায়ী সুলতান লাকামো হাউসে গিয়ে শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি সম্মত হন এবং পরদিনই বিকেল প্রায় চারটায় ট্যাকসিতে করে সুলতানের সঙ্গে করাচির টিচার্স হাউজিং সোসাইটিতে অবস্থিত ন্যাশনাল ব্যাংকের তদানীন্তন কর্মকর্তা কেজি আহমদের বাসায় আসেন। ওই বাসায় সুলতানের ভগ্নিপতি কামাল উদ্দিন থাকতেন। সুলতান শেখ সাহেবের কাছে যাওয়ার সময় কৌশলগত কারণে পাঞ্জাবি টাইপের সালোয়ার কামিজ পরেন এবং কিছু ফলমূল নিয়ে যান।

আমার জানা মতে, কামাল উদ্দিনের বাসায় অনুষ্ঠিত বৈঠকটিই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমাদের প্রথম বৈঠক। বৈঠকে তিনি (বঙ্গবন্ধু) ছাড়াও লে. কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম, লে. মোজাম্মেল,

সুলতান, স্টুয়ার্ড মুজিব এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। ওই বৈঠকেই আমরা শেখ সাহেবকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ব্যাপারে আমাদের আগ্রহের কথা জানাই এবং তাঁর সহযোগিতা চাই। তিনি সম্মতি দিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, আমিও তাই চাই। বাঙালি জাতির স্বাধীনতার জন্য আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু দিতেও প্রস্তুত। আপনাদের টাকা পয়সাসহ যা যা সাহায্য প্রয়োজন সবরকম সাহায্য আমি করব।' তিনি ছাত্রদের দিয়েও একটা গ্রুপ তৈরি করে দেবেন বলেও আমাদের জানান। এরপর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সাংগঠনিক কাজ শুরু করি এবং মাঝে মাঝে আমাদের অগ্রগতি তাঁকে অবহিত করি। তিনি বিভিন্ন সময় মোয়াজ্জেম সাহেবের কাছে মানি অর্ডার বা ভিপি করে টাকা পয়সা পাঠাতেন।"

সার্জেন্ট জহুরুল হক, ক্যাপ্টেন খুরশিদ উদ্দিনসহ (পরে ব্রিগেডিয়ার) অন্যদের সাথে সমসাময়িক সময়ে বঙ্গবন্ধুর যোগাযোগ প্রসঙ্গে নূর মোহাম্মদ বাবুল বলেন, 'অন্য কোথাও আরও কেউ কেউ এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন কী না বা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁদের পৃথক আলোচনা হয়েছে কী না সেটা তখন পর্যন্ত আমার জানা ছিল না। তবে পরে শুনেছি বিভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে স্বাধীনতার লক্ষ্যে কাজ করতেন। আমি শুধু নিজে যেটুকু দেখেছি, জড়িত ছিলাম এবং শুনেছি সেটুকুই বলতে পারি। আমাদের গ্রুপে লে. কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম, সুলতান উদ্দিন, আমির হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিব, লে. মোজাম্মেল এবং আমি এই কজন এক সাথে বসতাম, শেখ সাহেবের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতাম এবং আমাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁকে জানাতাম। আমাদের গ্রুপের সবাই আমাদের নয় সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় সুপ্রিম কমান্ড কাউন্সিলের সদস্য ছিলাম।'

সুপ্রিম কমান্ড কাউন্সিল

নূর মোহাম্মদ বাবুল জানান, তাঁদের সাংগঠনিক কাজ সম্প্রসারিত হওয়ার এক পর্যায়ে (৬৬ সালের দিকে) বিভিন্ন গ্রুপের কাজের সমন্বয়, অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদির জন্য ন' সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় সুপ্রিম কমাণ্ড কাউন্সিল গঠন করা হয়। কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যের একটা সাংকেতিক বা ছদ্মনাম ছিল। নিজেরা কোথাও কারও (সংশ্লিষ্ট সদস্য) সম্পর্কে কথাবার্তা বলার সময় ওই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। কাউন্সিলের ছয় জন সামরিক এবং তিনজন বেসামরিক সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন লে. কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (আলো), মো. আমির হোসেন মিয়া (উল্কা), লে. মোজাম্মেল হোসেন (তুহিন), সুলতান উদ্দিন আহমদ (কামাল), স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান (মুরাদ), শেখ মুজিবুর রহমান (পরশ), আহমদ ফজলুর রহমান সিএসপি (তুষার), নূর মোহাম্মদ (সবুজ) এবং রুহুল কুদ্দুস সিএসপি (শেখর)।

করাচিতে মুজিব হত্যার চেষ্টা

১৯৬৬ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণার পর থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটে পাকিস্তানিরা। ছয় দফা

ঘোষণার মাত্র দুদিনের মধ্যে ট্যাকসি চাপা দিয়ে তাঁকে হত্যার একটি চক্রান্ত ভাগ্যক্রমে ব্যর্থ হয়ে যায়। সেই চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিবরণ দেন নূর মোহাম্মদ বাবুল এভাবে– "লাহোরে ছয় দফা ঘোষণার পর ২৩ ফেব্রুয়ারি আমরা খবর পাই, শেখ সাহেব করাচির লাকামো হাউসে অবস্থান করছেন। মোয়াজ্জেম সাহেবের প্রস্তাবক্রমে ২৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর বাসায় একটি বৈঠক ডাকা হয় এবং সেখানে বঙ্গবন্ধুকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দায়িত্ব পেয়ে আমি তাঁকে আনতে যাই লাকামো হাউসে। লাকামো হাউস থেকে অন্ত ত দশ মাইল দূরে প্রথম ট্যাকসি বিদায় করে সেখান থেকে আর একটি ট্যাকসি নিয়ে আমি লাকামো হাউসে পৌঁছি।

সন্ধ্যা ছয়টার দিকে একই ট্যাকসিতে করে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে করাচির কারসাযে মোয়াজ্জেমের বাসার দিকে রওনা দিই। সেখানে আমাদের জন্য লে. মোজাম্মেলও অপেক্ষা করছিলেন। যাওয়ার সময়ও কৌশলগত কারণে মরুভূমির কিছুটা নির্জন এলাকায় দ্বিতীয় ট্যাকসিটি ছেড়ে দিয়ে আর একটি রানিং ট্যাকসি নিয়ে আমরা মোয়াজ্জেমের বাসায় পৌঁছি। সেখানে প্রয়োজনীয় আলাপ সেরে যখন লাকামো হাউসে ফিরি তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। এসেই দেখি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মেয়ে আকতার সোলায়মান হাউমাউ করে কাঁদ কাঁদ স্বরে বঙ্গবন্ধুকে বলছেন, 'শেখ মুজিব তোম জিন্দা হ্যায়?' একথা শুনে আমরা হতবাক। তিনি বললেন, 'তোমকো পাত্তা নেহি কেয়া হুয়া, হামতো থানামে টেলিফোন কেয়া হে, হোটেলমে টেলিফোন কেয়া, তোম গিয়া কেদারছে?' শেখ সাহেব আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমি তো ওনার (আমাকে দেখিয়ে) সঙ্গে একটা জরুরি কাজে গিয়েছিলাম।'

আকতার সোলায়মান বললেন, 'তোমকো মারলেনে লিয়ে ট্যাকসিকো মারা হ্যায়, ট্যাকসিওয়ালা এধার খুব হুল্লা হুয়া হ্যায়।' (তোমাকে মারার জন্য ট্যাকসি দিয়ে আর একজনকে মারার চেষ্টা হয়েছে। এদিকে তোমার খবর পাচ্ছি না, তুমি কোথায় যাও, কখন যাও।) শেখ সাহেব আশ্চর্য হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ট্যাকসিটি কোথা থেকে নিয়েছ?' বললাম এমপ্রেস মার্কেট থেকে (প্রায় ১০ মাইল দূরে) এরপর জানতে পারলাম, সন্ধ্যায় সোহরাওয়ার্দীর বাসা থেকে যখন আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম, পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা তখনো সেখানে ছিলেন। তাঁরা একটু পরে বের হয়ে গিয়ে সামনে একটি ট্যাকসি দেখে সেটিতে ওঠেন। তাঁরা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চালক ট্যাকসিটাকে বাড়ির দেওয়ালের সঙ্গে জোরে ধাক্কা মারে। এতে পশ্চিমা নেতারা চিৎকার করে ওঠেন, 'আরে কেয়া করতাহে'। ভাষা বুঝে ট্যাকসিচালক বিস্মিত হয়ে বললো, 'তোম কোন হ্যায়, শেখ মুজিব নেহি হ্যায়?' ওই নেতারা বললেন, 'আম তো শেখ মুজিব নেহি হ্যায়' ট্যাকসিওয়ালাও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'তো শেখ মুজিব কি ধার গেয়া?' ওনারা বললেন, 'ওতো আগর চলা গিয়া'। এ ঘটনায় বুঝা যায়, আমি এবং শেখ সাহেব যাওয়ার পর ওই ট্যাকসিওয়ালা ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়ায় এবং সুযোগমত ট্যাকসির ধাক্কায় শেখ মুজিবকে মারার একটা চক্রান্ত ছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে উনি-আমি দুজনেই রক্ষা পাই।"

ছয় দফা নিয়ে আলোচনা

বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি নামা ঘোষণার পর আইউব খান তা নিয়ে কড়া ভাষায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখান। তিনি প্রয়োজনে অস্ত্রের ভাষায় এর জবাব দেওয়ার ঘোষণা দেন। এতে স্বাধীনতাকামী বাঙালি সৈনিকদের মনেও উদ্বেগ দেখা দেয়। তাঁরা মনে করেন শেখ সাহেব যে কোনো সময় গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারেন। তখন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ও অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতার জন্য বিকল্প হিসেবে কী করা যায় এ নিয়ে তাঁরা ভাবছিলেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমের বাসায় বৈঠকে এসব বিষয়েই মূলত আলোচনা হয়। নূর মোহাম্মদ বলেন, "আমাদের পক্ষে তাঁকে বলা হয়, 'আপনি যে ছয় দফা দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে আইউব খান যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন, এতে আমাদের মনে হয় আপনি শিগগিরই গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারেন। তা যদি হয় আপনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের উপায় কি?' তিনি বলেছিলেন, 'এ ব্যাপারে আপনাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না। আমি গিয়েই সব ব্যবস্থা করে যাব।"

'আমি গভর্নর হওয়ার জন্য লালায়িত নই'

৬৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি নূর মোহাম্মদ বাবুল যখন বঙ্গবন্ধুকে লে. মোয়াজ্জেমের বাসায় নেওয়ার জন্য লাকামো হাউস যান তখন সেখানে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপরত পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা বঙ্গবন্ধুকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। নূর মোহাম্মদ বলেন, "আমি সেদিন লাকামো হাউসে গিয়ে দেখি পশ্চিম পাকিস্তানি কয়েকজন নেতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু আলাপ করছিলেন। আমি তাঁদের থেকে একটু দূরে বসলেও তাঁদের আলাপের কিছু কিছু কথা আমার কানে আসছিল। একজন উর্দুতে যা বলছিলেন তা হচ্ছে, 'আপনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরশিপটা নিয়ে নেন।' শেখ সাহেবের জবাব ছিল 'না আমি গভর্ণর হওয়ার জন্য লালায়িত না। পূর্বপাকিস্ত ানের মানুষ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে যে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে তাঁদের জন্য কিছু করা যায় কী না তা নিয়ে আমি ভাবছি।' এক পর্যায়ে কোনো একজনের কী একটা কথার রেশ ধরে গলা ছাড়িয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'কেয়া তোম কাশ্মীর কাশ্মীর করতাহে, বাঙাল কি বাত করো, যো হামারা কাম হ্যায়।' একথা বলেই তিনি আমার সঙ্গে বের হওয়ার জন্য উঠে এলেন। তাঁর সেদিনের বলিষ্ঠ কণ্ঠের কথাগুলো শুনে মনে হলো তিনি শুধু আমাদের সঙ্গে গোপনে নয়, প্রকাশ্যেই এমনকি পশ্চিমা নেতাদের কাছেও আলাপের সময় বাঙালিদের স্বার্থেই কথা বলতেন।"

আওয়ামী লীগের কোনো নেতার সঙ্গে আলোচনা নিষেধ

নূর মোহাম্মদ বাবুল জানান, তিনি মূলত করাচিতে আয়োজিত বেশ কটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ৬৬ সালে ঢাকায় এবং ৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে নিপার ইন্সট্রাক্টর আলী রেজার বাসায় একটি বৈঠকে তিনি ছিলেন। একটি বৈঠক তাজউদ্দিন আহমদের বাসায় হয়েছিল' সেটিতেও তিনি ছিলেন। এ ছাড়া ঢাকাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায়

আয়োজিত বৈঠকগুলোতে লে. কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম, লে. মোজাম্মেল হে'ন্সন, লে. এমএম রহমান কিংবা অন্য গ্রুপে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন। আর তাজউদ্দিন আহমদের বাসায় যে বৈঠক হয় তাতে তাজউদ্দিন নিজে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখনও এই গোপন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আদৌ জানতেন বলেও নূর মোহাম্মদ মনে করেন না। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'আমাদের কার্যক্রম খুবই গোপনীয়তার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছিল। আওয়ামী লীগের কোনো নেতার সঙ্গেও এসব বিষয়ে আলোচনা না করার জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছিল। তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে বা তিনি জেলে থাকলে তিন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের কথা তিনি বলেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন, চট্টগ্রামের ভূপতিভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী, ডা. সৈয়দুর রহমান ও বিধান কৃষ্ণ সেন। আমার জানামতে, শেখ সাহেব এই গোপন প্রক্রিয়ায় এই তিন জনকেই নিয়োজিত করেছিলেন। এমনকি যে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মেয়ের বাসায় বঙ্গবন্ধু থাকতেন, সেই সোহরাওয়ার্দীর মেয়ে আকতার সোলায়মান বা নাতনী মুন্নীকেও বিষয়টি জানানো হয়নি। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, হোসেন শহীদ সোহরায়ার্দী যে বৈরুতে মারা গেছেন সেটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে অনেকে মনে করেন বা বিশ্বাস করেন। আকতার সোলায়মান এবং মুন্নীকে তিনি ধারণা দেন, সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর জন্য দায়ী আইউব খানের বিরুদ্ধে একটা শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে। তাঁরা কখনো আমাদের কাছে জানতে চাইলে আমরাও যাতে সেই ধারণা দিই সেভাবে আমাদের ব্রিফিং করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি জেলের বাইরে থাকা অবস্থায় আমাদের পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে সময় সময় তাঁকে জানানো হতো। তিনি বিভিন্ন সময় জেলে যাওয়ার পর বিধান সেন, মানিক চৌধুরী ও ডা. সৈয়দুর রহমানের মাধ্যমে খবর পৌঁছানো হতো।

আগরতলার বদলে কাঠমুণ্ডু যাওয়ার প্রস্তাব

ঢাকায় আলী রেজার বাসার বৈঠকটি নূর মোহাম্মদ বাবুলের জন্য শেষ বৈঠক। বললেন, "৬৭ সালের জুন-জুলাই মাসে সুলতান চট্টগ্রাম নেভাল বেইসে আমাকে ফোনে জানান, জরুরি বৈঠক আছে ঢাকা যেতে হবে। আমি ১৫ দিনের ছুটি নিয়ে ঢাকা আসি। ওই বৈঠকে করাচি থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন, লে. এঁমএম রহমান। এ ছাড়া ছিলেন লে. মোয়াজ্জেম, সুলতান, হাবিলদার দলিল উদ্দিন, ইশতিয়াক মজিদ, এবিএম সামাদ, আলী রেজা প্রমুখ। ওই বৈঠকে ভারতীয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনার জন্য আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিব আগরতলা যাবেন বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। ওই বৈঠকে আগরতলা যাতায়াতে সীমান্তসহ অন্যান্য জায়গায় সম্ভাব্য সমস্যার কথা ভেবে ভারতীয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনাটা কাঠমুণ্ডুতে আয়োজনের ব্যাপারে প্রস্তাব করা হয়। কারণ তখন কাঠমুণ্ডু যেতে পাসপোর্ট দরকার হতো না। কিন্তু মোয়াজ্জেম সাহেব বললেন, 'এ ব্যাপারে যেহেতু ভারতের দূতাবাসের কর্মকর্তা পিএন ওঝার সঙ্গে তিনবার দিন তারিখ ঠিক করে সময় পেছানো হয়েছে, তাই আর তারিখ ও স্থান পরিবর্তন করা ঠিক হবে না।' শুনেছি, ওঝার সঙ্গে বৈঠকের ব্যাপারে মানিক চৌধুরী ও এবিএম সামাদ ভূমিকা রেখেছেন। ভারতীয় দূতাবাসের লোকজন আহমদ

ফজলুর রহমানের পেট্রোল পাম্প গ্রিণ ভিউ থেকে তেল নিতেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সামাদকে সেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে মানিক চৌধুরীও ভূমিকা রেখেছেন বলে জেনেছি।”

ঘটনা ফাঁস সম্পর্কে

এত রাখঢাক-গোপনীয়তার পরও ঘটনাবলী ফাঁস কীভাবে হলো এ বিষয়ে নূর মোহাম্মদের ভাষ্য : ‘আমাদের সঙ্গে যুক্ত বিমান বাহিনীর স্টাফ করপোরাল আমির হোসেন মোয়াজ্জেম সাহেবসহ সবার বিশ্বাসভাজন ছিলেন। আমাদের অনেকের মধ্যে তিনি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতেন এবং সে হিসেবে আমাদের ভেতর বাইরে অনেক কথা তাঁর জানা ছিল। অনেক ক্ষেত্রে টাকা পয়সার আদান-প্রদান, সে সংক্রান্ত হিসাব এবং কারো কাছে পাঠানো চিঠিপত্র তাঁর কাছে থাকার কথা। ৬৭ সালেই শুনেছিলাম যে কোনো বিষয়ে মোয়াজ্জেম সাহেবের সঙ্গে তাঁর মনোমানিল্য হয়েছে এবং তিনি দল থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। এনিয়ে মোয়াজ্জেম সাহেবসহ আমরা বৈঠকে বসে আলোচনা করি এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে। আমি, সুলতান উদ্দিন ও স্টুয়ার্ড মুজিবের পরামর্শ ছিল, তাঁকে তাড়াতাড়ি স্যুট (হত্যা) করার ব্যবস্থা করা হোক। নইলে তিনি বড় ধরনের বিপদ ঘটাতে পারেন। কর্ণেল শওকত প্রশ্ন তুলেছিলেন–একটা লোককে মেরে ফেলা ঠিক হবে কী না!

আমরা বলেছিলাম, এটা এমন একটা পথ যেখানে কাউকে ক্ষমা করা হলেই পরে বিপদ হতে পারে। পরে আর তাঁকে মারার প্রস্তাব বাস্তবায়ন হয়নি। মামলার আগে আমি আমির হোসেনের কাছে দুহাজার টাকা পেতাম। তিনি আরজু হোটেলে আছেন জানতে পেরে আমি তাঁর কাছে গেলে তাঁর কথাবার্তার ধরণে বুঝতে পারি তিনি আর আমাদের কাজের সাথে একমত নন। আমি কথা না বাড়িয়ে পাওনা টাকা নিয়ে চলে আসি। পরে মামলা চলাকালে জানতে পারি শামসুল হক বা শামসুর রহমান নামে একজন বাঙালি স্কোয়াড্রন লিডার বাঙালিদের স্বাধীনতার জন্য কিছু একটা করার মনোভাব দেখিয়ে আমির হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর কাছ থেকে পুরো ঘটনা জেনে নেন। তিনি ছিলেন ইন্টেলিজেন্সের লোক। হোটেল আরজুতে বসেই তারা কথাবার্তা বলতেন। সমস্ত ঘটনা জানার পর সেই লোক আমির হোসেনকে আটক করেন।

এ ছাড়া, ক্যাপ্টেন নুরুজ্জমান (স্বাধীনতার পর রক্ষীবাহিনীর প্রধান) সাহেবের কাছ থেকে জানা যায়, বরিশালের সুবেদার আশরাফ আলী এবং ইন্টেলিজেন্সের মোস্তাফিজুর রহমান (তৎকালীন মেজর পর্যায়ের কর্মকর্তা, পরে কর্ণেল ও বিএনপি নেতা) আমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুটা জানতেন। কুমিল্লায় যে গ্রুপটা গোপন আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল তাতে ক্যাপ্টেন নূরুজ্জমান, ক্যাপ্টেন শওকত আলী, মেজর আবদুল মোতালেব, মেজর মো. শামসুল আলম প্রমুখ ছিলেন। সে সময় মোস্তাফিজুর রহমান ছিলেন কুমিল্লায় ফিল্ড ইন্টেলিজেন্সে। তিনি আমাদের কার্যক্রম প্রথমদিকে চেপে গেলেও পরবর্তীতে তিনি এবং আশরাফের মাধ্যমে

কিছু কথা ফাঁস হয় বলে ধারণা করা হয়। আমাদের গ্রেপ্তার ও জিজ্ঞাসাবাদের সময় মোস্তাফিজ সাহেবও আমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অনেক কথা জানতে চেয়েছিলেন।'

মুক্তিযুদ্ধে নূর মোহাম্মদ

নূর মোহাম্মদ বাবুল ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নেন এবং সম্মুখযুদ্ধে বহু খান সেনা হতাহত করাসহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

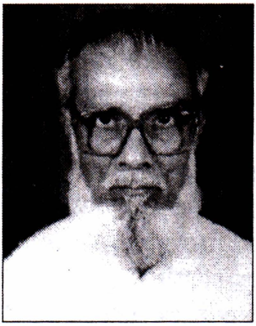
স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, 'একাত্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে আমি নতুন আর একটি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমি তখন মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানা এলাকায় অবস্থান করছিলাম। প্রথমেই সহযোগী আগ্রহী যুবকদের নিয়ে লৌহজং থানা থেকে রাইফেল নিয়ে এসে কয়েকদিন ধরে প্রায় সাড়ে তিনশত ছাত্র যুবককে গুলি চালানোর প্রশিক্ষণ দিই। মে মাসের প্রথম দিকে ফরিদপুর হয়ে আগরতলা গিয়ে ২ নং সেক্টরের কমাণ্ডার মেজর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে দেখা করি তাঁর ক্যাম্পে। সেখান থেকে বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাসের আমাকে এনে দেন ৯ নং সেক্টরে মেজর জলিলের ক্যাম্পে। সেখানে অল্প কয়েকদিন থাকার পর জুন-জুলাইয়ের দিকে সাব সেক্টর কমাণ্ডার হিসেবে বৃহত্তর ফরিদপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের অধিনায়কের দায়িত্ব দিয়ে আমাকে ফরিদপুর পাঠানো হয়। এরপর আমি ফরিদপুরের কাশিয়া থানার ওড়াকান্দি বিদ্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করি। ইতিমধ্যে বেঙ্গল রেজিমেন্ট পুলিশসহ মুক্তিযোদ্ধার বিরাট বহর নিয়ে ফরিদপুর আসেন ডা. এসএ মালেক। সাথে ছিলেন দুই ব্রিটিশ সাংবাদিক মি. পল এবং মি. ফ্রেয়ার।'

নূর মোহাম্মদ জানান, সে সময় বৃহত্তর ফরিদপুরের প্রশাসনিক প্রধান ও মুজিব বাহিনীর প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন ডা. এসএ মালেক। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে নূর মোহাম্মদ তাঁর দলবল নিয়ে ভাটিপাড়ায় অবস্থানরত পাক বাহিনীর ক্যাম্পে পরপর তিনবার আক্রমণ চালান। এতে একবার ১১ জন, একবার সাত জন ও একবার তিন জন পাক সেনা নিহত হয়। ১০ অক্টোবর ভেদরগঞ্জ থানা আক্রমণ করেন। সে সময় তাঁর সহযোদ্ধাদের মধ্যে হাবিলদার মহিউদ্দিন সরদার শহীদ হন। ১৪ অক্টোবর গোসাইর হাট থানার ডামুড্যা এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে এক সম্মুখযুদ্ধে নূর মোহাম্মদের বাহিনীর নয় জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও পাঁচ জন আহত হন। অপরদিকে খান সেনাদের পক্ষে মারা যায় এক জন মেজর, একজন ক্যাপ্টেনসহ দুশতাধিক।

নূর মোহাম্মদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ফরিদপুরে অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে ১৭ ডিসেম্বর। ভারতীয় বাহিনীর সহকারী কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র নাথসহ নূর মোহাম্মদ তাঁর দল নিয়ে ওই দিন ফরিদপুর শহরে পৌঁছেন। ডা. এসএ মালেকের উপস্থিতিতে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে মিত্র বাহিনীর ফাইভ লাইফ মারাঠা কমাডিং অফিসার কর্নেল টর্পি, কর্নেল বারেক, মেজর করমবাইয়া, মেজর চ্যাটার্জি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণ করেন নবম ডিভিশনের প্রধান ব্রিগেডিয়ার ইউসুফ আলী।

পাকিস্তানিরা আমাদের ভাত দিতে চাইতো না

এবিএম আবদুস সামাদ



স্বাধীনতা সংগ্রামের গোপন প্রক্রিয়ায় জড়িতদের অন্যতম ৮নং অভিযুক্ত এবিএম এ সামাদ (আবুল বাশার মোহাম্মদ আবদুস সামাদ) করপোরাল সামাদ নামেই বেশি পরিচিত। বাবার নাম এস্তে আলী মিয়া। ১৯৩০ সালের ১ নভেম্বর পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানাধীন মিঠাখালী গ্রামে তাঁর জন্ম। লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে সামাদের পরিচয় ছাত্রজীবন থেকে। উভয়ে একই বছর ম্যাট্রিক পাস করেন ১৯৪৭ সালে বাগেরহাট কচুয়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে। ১৯৪৯ সালে জগন্নাথ কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালে সামাদ অয়্যারলেস অপারেটর হিসেবে যোগ দেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে। প্রায় কাছাকাছি সময়ে নৌ-বাহিনীতে যোগ দেন মোয়াজ্জেম হোসেন।

চাকরি জীবনের প্রথম দিক থেকেই পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের নানা বৈষম্য ও নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ডের শিকার সামাদ চাকরিস্থলেই প্রতিবাদী ছিলেন। প্রথম থেকে মোয়াজ্জেমদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও স্বাধীনতার লক্ষ্যে শুরু হওয়া গোপন আন্দোলনে তিনি সরাসরি যুক্ত হন ১৯৬৫ সালে। ঢাকার একটি পেট্রোল পাম্পে চাকরির আড়ালে থেকে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ, মোয়াজ্জেমকে নিয়ে দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারির সঙ্গে বৈঠক এবং আগরতলায় দুই সদস্যের প্রতিনিধিকে সীমান্তে পৌঁছে দেওয়াসহ নানা কর্মকাণ্ডের সাক্ষী তিনি। ২০০৭ সালের ২১ মার্চ বিকেলে ঢাকার মতিঝিলে স্টক এক্সচেঞ্জ কার্যালয় সংলগ্ন তাঁর কর্মস্থল একটি শেয়ার ব্রোকারেজ হাউজে বসে তাঁর এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি।

আলাপকালে জানা যায়, এবিএম সামাদ হতে চেয়েছিলেন পাইলট। কিন্তু মেডিকেল টেস্টে পায়ের উচ্চতা প্রয়োজনের তুলনায় এক ইঞ্চি কম হওয়ায় বিকল্প হিসেবে অয়্যারলেস বিভাগেই যোগ দেন। তারপর প্রশিক্ষণের জন্য চলে যান পেশোয়ারের রিসালপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে।

'পাকিস্তানিরা ভাত দিতে চাইতো না'

যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে নিজ প্রদেশ পূর্ব বাংলা ছেড়ে সুদূর পশ্চিম পাকিস্তান পাড়ি জমালেন এবিএম সামাদ, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানিদের সম্পর্কে লাভ করেন তিক্ত অভিজ্ঞতা।

সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের সঙ্গে সব সময়ই খারাপ ব্যবহার করতো। যেকোনো কিছুতেই কথা বলতো খোঁচা মেরে। ছুটি ছাঁটা দেওয়া হতো না প্রয়োজনমতো। জানা যাক এ সম্পর্কে সামাদের অভিজ্ঞতার কথা:

'ধরুন আমাদের সেকশনে পাঁচ জন বাঙালি সদস্য রয়েছেন। সেখানে যত জনের ছুটি দরকার হোক না কেন দেওয়া হতো একজনকে। সেই একজনের ছুটি এক-দেড়মাসের জন্য হলেও তাঁকে আবার পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে যাওয়ার জন্য দেশে (বাংলাদেশে) অপেক্ষা করতে হতো তিনমাস। এই সময়ের মধ্যে অন্য কেউ শত প্রয়োজন মনে করলেও তাঁকে ছুটি দেওয়া হতো না। আমরা বাঙালিরা রুটি খেয়ে স্বস্তি পেতাম না। কিন্তু পাকিস্তানিরা আমাদের ভাত দিতে চাইতো না। এ নিয়ে তাদের আচরণও খারাপ ছিল। অনেক সময় আমরা প্রতিবাদ করতাম নানা কৌশলে। ১৯৬০ সালের কথা। একদিন আমাদের মেসের পাকিস্তানি ব্যবস্থাপক বললেন, 'চাল পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই সবাইকে রুটি খেতে হবে।' আমিসহ বাঙালি সহকর্মীরা এক টেবিলে বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা রুটি খাবো না। যেকোনোভাবে হোক ভাতের ব্যবস্থা করতে হবে। তারা ভাত দিতে অপরাগতা জানিয়ে রুটি দিলে আমরা অঘোষিতভাবে প্রতিকী প্রতিবাদ স্বরূপ অর্ধেক করে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। রুটিগুলো ছিল পোড়া, গন্ধযুক্ত। খবর পেয়ে অর্ডারলি অফিসার মেস পরিদর্শনে এসে সব ঠিকঠাক আছে কিনা কিংবা কোনো সমস্যা আছে কিনা জানতে চান। আমি আমার সঙ্গীদের পক্ষে রুটি খেতে আমাদের সমস্যার কথা জানালে তিনিও চাল না পাওয়ার অজুহাত তোলেন। এ ছাড়া রুটি ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা দেখে তিনি উত্তেজিত হয়ে আমাদের বকাঝকা শুরু করেন। আমরা রুটিগুলো খাওয়ার উপযুক্ত নয় বলে জানালেও পরদিনও একই ব্যবস্থা করা হয়। ওইদিনও আমাদের প্রতিবাদী কার্যক্রম দেখে কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত আমাদের জন্য ভাতের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন।'

সেইদিন থেকে ভাতের ব্যবস্থা হলেও বাঙালি সেনা ও সাধারণ কর্মচারীদের ওপর কথায় কথায় ওদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব, অবজ্ঞা মোটেও কমেনি। এ ছাড়া বাঙালিদের ওপর আরও নানা বৈষম্যমূলক আচরণসহ বিশেষ নজরদারিও করা হতো, যা বাঙালি সৈনিক-কর্মচারীদের হতাশ ও ক্ষুব্ধ করে তুলে।

এ জাতীয় নানা অভিযোগের কথা জানতে পেরে কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটির কর্মকর্তার তদন্তকালে ঘটে এক মজার ঘটনা।

এ নিয়ে সামাদের স্মৃতিচারণ: "কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন এক বাঙালি কর্মকর্তা শামসুদ্দোহা। আমরা ৪০ জন বাঙালি তদন্ত কমিটির সামনে দাঁড়িয়েছি সাক্ষী দিতে। ওই কর্মকর্তা প্রশ্ন এবং কথাবার্তা বলা শুরু করলেন ইংরেজিতে। এতে আমরা সবাই বিব্রত বোধ করি। কারণ আমাদের ক্ষোভের কথা বাংলায় বললে উনি বুঝতে পারতেন ভালো করে। কিন্তু ইংরেজিতে বললে, পাকিস্তানিরাও সব বুঝে ফেলবেন। আমার পাশে ছিলেন সিগন্যাল কোরের এক কর্মকর্তা। তিনিসহ আমরা চুপি চুপি পরামর্শ করে উত্তর দেওয়া থেকে বিরত রইলাম। এক পর্যায়ে দুষ্টুমির ছলে বাঙালি কর্মকর্তাটিকে শুনিয়ে শুনিয়ে সহকর্মীর দিকে

তাকিয়ে আমি বললাম, 'যেভাবে উনি ইংরেজিতে কথাবার্তা বলছেন, প্রশ্ন করছেন মনে হয় মেয়ের জামাই দেখতে এসেছেন।' শামসুদ্দোহা কথাটা শুনে মাথা ঘুরিয়ে বাংলায় বললেন, 'কি হয়েছে? আপনাদের সমস্যার কথা আমাকে খুলে বলুন।' আমরা তাঁকে বললাম 'পাকিস্তানিরা আমাদের অভিযোগের কথা বুঝতে পারলে আপনি যাওয়ার পর আমাদের সঙ্গে আগের চাইতে খারাপ ব্যবহার ওরা করবে। সেজন্য বাংলায় প্রশ্ন করার জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।' এরপর আমরা তাঁকে আমাদের কিছু কিছু সমস্যার কথা জানাই। কিছু কিছু ব্যাপারে পরে সমাধানও হয়েছিল।"

এবিএম সামাদ করাচির মৌরিপুরে দায়িত্ব পালনকালেও দেখেছেন বাঙালিদের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা ও কষ্ট দেওয়ার নানা চিত্র। সেখানে-পশ্চিমা কর্মকর্তারা বাঙালিদেরকে জোর করে মেসের ভেতর ঢুকিয়ে রুটি খেয়ে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিত। কিন্তু বাঙালিরা তা প্রায়ই খেতেন না। এ পর্যায়ে একবার এক নাগারে তিনদিন উপোস থাকেন (প্রতিবাদী অনশন) তাঁরা। কেউ কেউ ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে কিছু শুকনো রুটি লুকিয়ে কাগজে মুড়িয়ে নিয়ে নিজ নিজ ট্র্যাঙ্কের ভেতর রেখে দেন, পরে লুকিয়ে খেয়ে নেয়। অবশ্য কয়েকদিনের মধ্যে সেই অনশন ভেঙে যায়।

সামাদ জানান, তখনো তাঁদের চাকরিকাল ছিল মোট ১৮ বছর। এরমধ্যে ১২ বছর একটিভ সার্ভিস, আর ছয় বছর রিজার্ভ। মোট ১৮ বছর পূর্ণ হলে পেনশনে যাওয়ার কথা। চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময় তাঁরা এমনটাই জেনেছেন। কিন্তু মৌরিপুরের অনশনের ঘটনার পর জানতে পারেন নতুন এক নিয়মের কথা। এতে বলা হয় ১২ বছর একটিভ সার্ভিসের পর আরও ১২ বছর চাকরি করতে হবে। পেনশন হবে ২৪ বছর পর। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের এ রকম সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য বৈষম্যমূলক আচরণ মেনে নিতে না পেরে সামাদ সাহেবসহ আরও অনেকে হতাশ হয়ে পড়েন। এ পর্যায়ে শুধু গ্র্যাচুইটি নিয়ে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে আসেন।

বিপ্লবী দলে সম্পৃক্ততা

এবিএম সামাদ দেশে এসে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভের আশায় ছোটখাটো ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন ঢাকায়। এরমধ্যে ৬৪ সালের শেষ দিকে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের একটি চিঠি আসে তাঁর কাছে। চিঠিতে মোয়াজ্জেম সামাদকে জানান, 'আমি ছুটিতে এলে তোমাকে কিছু কথা বলবো। বড়ো একটা কাজে হাত দিয়েছি। সে কাজে তোমাকেও আমার সঙ্গে থাকতে হবে।' এর আগে দুতিন বছরে একাধিকবার যোগাযোগ ও কথাবার্তা হলেও এ জাতীয় অস্পষ্ট কথা মোয়াজ্জেম বলেননি। তাই খানিকটা কৌতুহলী হয়ে ওঠেন সামাদ। এদিকে ১৯৬৫ সালে লেগে যায় পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ। ওই সময় সরকার দেশের সব সাবেক সৈনিক, পুলিশ, আনসারকে নিজ নিজ সাবেক কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেয় (রিকল)। একই রকম ডাক আসে সামাদের কাছেও।

এরপরের কাহিনী জানা যাক সামাদের জবানীতে: "আমি করাচি গিয়ে পুনরায় চাকরিতে

যোগ দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যে মোয়াজ্জেমের সঙ্গে দেখা করি। সে আমাকে জানায়, 'বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য আমরা সংগঠিত হচ্ছি। এতে তুমিও থাকবে।' আমি এতে সম্মতি দিয়ে এ সিদ্ধান্তের পেছনে আর কে আছে জানতে চাইলে সে বলে, 'এর পেছনে শেখ সাহেব আছেন।' শেখ সাহেবের নাম শুনে আমি বেশ সাহস পাই।

রুহুল কুদ্দুসের বাসায় বৈঠক

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমার হায়দরাবাদে পোস্টিং হয়। সেখানে একদিন মোয়াজ্জেম আমাকে ফোন করে জানায়, ১২ অক্টোবর (৬৫ সালে) একটি জরুরি মিটিং আছে, আমি যেন দুএকদিনের মধ্যে করাচি যাই। করাচিতে আমার এক ঘনিষ্ঠজন রোগীকে দেখতে যাওয়ার কথা বলে আমার আডজুট্যান্টের কাছে দুদিনের ছুটি চাইলে তিনি ছুটি দিতে রাজি হননি। আমি যেকোনোভাবে করাচি যেতে উদগ্রীব হয়ে তাঁকে বললাম, 'স্যার, রোগী আমার ঘনিষ্ঠ, আপনি ছুটি না দিলেও আমাকে যে কোনোভাবে যেতে হবে। দরকার হলে আপনি পরে ব্যবস্থা নেবেন।' তখন আমি হায়দারবাদে বিমান বাহিনীর করপোরাল, নন কমিশন অফিসার। আমি জানতাম, আমি বিনা অনুমতিতে গেলেও আমাকে গ্রেপ্তার করা হতো না। বড়জোর হাজিরা খাতায় লালকালি দিয়ে রাখা হতো আর কিছু বকাঝকা করা হতো। আমার অনমনীয়ভাব দেখে অফিসার নমনীয় হন। প্রধান সহকারীকে (হেড ক্লার্ককে) ডেকে আমাকে মৌখিক ছুটি দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, সাদাকাগজে নাম ঠিকানা লিখে রাখতে। এও বলে দিলেন, আমি ফিরে আসার পর যাতে ওই কাগজ ছিড়ে ফেলা হয়। আজ উল্লেখ করতে হয়, সেদিনের ছুটি মৌখিক হওয়ায় তা আগরতলা মামলার সময় আমার জন্য উপকারই হয়েছিল। সে কথা একটু পরে বলছি। মৌখিক ছুটি পেয়ে পরদিন করাচি এসে মোয়াজ্জেমের দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে জানতে পারি সেটি সিএসপি অফিসার রুহুল কুদ্দুসের বাসা। হায়দরাবাদ থেকে দূরত্ব প্রায় ২৫০ মাইল। সেখানে আহমেদ ফজলুর রহমানসহ আরও কয়েকজন মিলে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিদের শোষণ-বঞ্চনা, বৈষম্য থেকে বাঁচতে হলে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করি। প্রস্তাব করা হয়, আমার কাছে যোগাযোগের জন্য একটা ট্রান্সমিটার থাকবে, যোগাড় করে দেবেন রুহুল কুদ্দুস সাহেব। সিদ্ধান্ত হয় যে, বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হবে, নেতৃত্বে থাকবেন শেখ মুজিবুর রহমান। বৈঠক থেকে ফিরে গিয়ে যথারীতি কাজে যোগ দিই হায়দরাবাদের কর্মস্থলে। গিয়েই হাজিরা খাতায় ছুটির দিনগুলোসহ উপস্থিত দেখিয়ে দস্তখত দিয়ে দিই।

মামলা চলাকালে আমি যে দুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে চাকরিস্থল থেকে চলে গিয়েছিলাম সে প্রসঙ্গটি তোলা হয়েছিল। আমি সেটা অস্বীকার করে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিলাম, 'সেই সময়ের রেকর্ড যাচাই করা হোক আমি কোনো ছুটি ওই সময় নিয়েছি কী না!' কিন্তু সেরকম কোনো তথ্য না পাওয়ায় আমাদের আইনজীবী প্রশ্ন তুললেন, 'কোনো ছুটি না নিয়ে সামাদ ২৫০ মাইল দূরে কোনো সভায় যোগ দিলেন কি করে?' আদালত যুক্তিটি গ্রহণ করেছিল।"

ওপরে চাকরি, আড়ালে ওস্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ

এবিএম সামাদ জানান, রুহুল কুদ্দুসের বাসা থেকে হায়দরাবাদে ফিরে চাকরিতে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর ছুটির সময় হলে তিনি চলে আসেন ঢাকায়। আসার সময় মোয়াজ্জেম

তাঁকে বলেছিলেন, ঢাকার গ্রিণ রোডে সায়েন্স ল্যাবরেটরির বিপরীতে আহমদ ফজলুর রহমানের পেট্রোল পাম্প গ্রিন ভিউতে যোগ দিতে। আহমদ ফজলুর রহমান সেখানে তাঁকে ম্যানেজারের দায়িত্ব দেন। একটা গাড়িও দেন বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া-আসার জন্য। এই পেট্রোল পাম্পে শেখ মুজিব মাঝে-মধ্যে আসতেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সামাদের সরাসরি কোনো আলাপ হয়নি। একদিন মিজানুর চৌধুরী এসেছিলেন আহমদ ফজলুর রহমানকে খোঁজ করতে। তিনি না থাকায় তাঁর জন্য একটা চিঠি দিয়ে যান সামাদকে। সেটি তাঁর পকেটে ছিল। পাকিস্তানি সেনারা চিঠিটি পেয়ে বলেছিল, 'তোমাদের নেতারা যে এখানে আসতেন এই চিঠি তো তার প্রমাণ।'

সামাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গ্রিণ ভিউতে চট্টগ্রামের ভূপতিভূষণ চৌধুরী (১২নং আসামি) ও ভারতীয় দূতাবাসের ফাস্ট সেক্রেটারি মি. পিএন ওঝাসহ সংশ্লিষ্ট আরও কেউ কেউ আসতেন পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ ও খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য। সামাদের কাজ ছিল সংশ্লিষ্টদের মাঝে নির্দেশমতো যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া।

১৯৬৬ সালে মোয়াজ্জেম চট্টগ্রাম বিআইডাব্লিউটিএর (অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ) দায়িত্বে থাকার সময় ঢাকায় এসে দেখা করতেন সামাদের সাথে। তিনি সামাদকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে ভারতের সহযোগিতার বিষয়টি নিয়ে আলাপ করার জন্য। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী সামাদ ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রস্তাব দেন বাঙালিদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য।

সামাদের ভাষায়, "ভারতীয় দূতাবাসের তৎকালীন দুজন সচিব প্রায় সময় আমার এখান থেকে পেট্রোল নিতেন; তাঁদের একজন মি. জর্জ। ১৯৬৬ সালের নভেম্বরের ঘটনা। মোয়াজ্জেমের পরামর্শ অনুযায়ী একদিন আমি মি. জর্জকে আমার অফিসের ভেতরে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু জরুরি ও গোপনীয় কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করি। তিনি কথা বলতে রাজি হলে তাঁকে বললাম, 'আমরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে চাই, এ ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা দরকার।' তিনি বললেন, 'এখানে এসব কথাবার্তা বলা সুবিধের হবে না। বরং আপনি অমুক দিন (দিনটি মনে নেই) বিকেল পাঁচটার সময় আমাদের ধানমন্ডি ৮নং সড়কের বাসায় আসুন, সেখানেই কথা হবে।' নির্দিষ্ট সময়ে আমি তাঁর বাসায় গিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছের কথা জানাই এবং এতে ভারতের সহযোগিতার প্রয়োজনের কথা বলি। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'কেন কোন যুক্তিতে ভারত বাঙালিদের সহযোগিতা দেবে?' আমি মোয়াজ্জেমের কথামত বলেছিলাম, 'দেখুন, আমরা পাকিস্তানের একাংশ আছি পূর্ব দিকে, ওরা আছে পশ্চিমে। আর আপনারা (ভারত-পাকিস্তান) একে অপরকে শত্রু ভাবেন। আপনাদের দুদিকেই সব সময় পাহারায় থাকতে হয়। কিন্তু পূর্বদিকে যদি আমাদের নিয়ে আপনাদের একটি বন্ধু রাষ্ট্র হয় তাহলে আপনাদের আর দুশ্চিন্তা থাকে না।' ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তা এর পেছনে কারা আছে জানতে চাইলে আমি তাঁকে সশস্ত্র বাহিনীর ভেতরের চলমাম তৎপরতার কথা জানাই।

মি. জর্জ আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'আপনার কথাতো ভাল। আমরাও বুঝি- আমাদের একটা কিছু করা উচিৎ। তবে আমাদের দূতাবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফার্স্ট সেক্রেটারি মি. পিএন ওঝা সপ্তাহখানেক পর ছুটি থেকে এলেই তাঁকেই বিষয়টি বলবেন।'
সপ্তাহখানেক পর মি. জর্জ পেট্রোল পাম্পে এসে 'মি. ওঝার আসার খবর দিয়ে তাঁর সেগুন বাগিচার কার্যালয়ে যেতে বলেন। দুজনের মধ্যে পরামর্শক্রমে ঠিক হলো, কেউ কখনও প্রশ্ন তুললে বলতে হবে যে, ভারতীয় দূতাবাসের গাড়ির জন্য নেওয়া তেলের বিলের লেনদেনের হিসাবের মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে। তা ঠিক করার জন্যই আমি সেখানে (দূতাবাস কার্যালয়ে) গিয়েছি। সে অনুযায়ী হিসাবের একটি খাতাও তৈরি করে নিলাম। মি. জর্জ আমাকে একটি চিঠি লিখে দেন যাতে দূতাবাসের ভেতর ওঝার কাছে যেতে আমার অসুবিধা না হয়।
এরপর একদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি সেগুনবাগিচায় ভারতীয় দূতাবাস কার্যালয়ে গিয়ে মি. ওঝার সঙ্গে দেখা করে আমাদের পরিকল্পনার কথা বলি। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'এরকম একটা সিদ্ধান্তের বিষয়টি আগে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলাপ করে নিতে হবে।' যোগাযোগ করে পরদিনই ভালমন্দ জানাবেন বলে তিনি আশ্বাস দেন। কথামতো পরদিন আমি আবার মি. ওঝার কার্যালয়ে গেলে তিনি প্রাথমিক একটা বৈঠকের জন্য আমাদের পক্ষে কে কে থাকবেন তার একটা তালিকা দিতে বলেন। পরদিন আমি মোয়াজ্জেমের সঙ্গে কথা বলে আমরা দুজন (আমি এবং মোয়াজ্জেম) থাকবো বলে সিদ্ধান্ত নিই। তার পরদিন সকালে মি. ওঝা তেল নেওয়ার জন্য পেট্রোল পাম্পে এলে আমি তাঁকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে ওইদিন সন্ধ্যায় বসার আগ্রহ প্রকাশ করি। ইতিমধ্যে মোয়াজ্জেমও ঢাকা এসে পৌঁছেন।

মোয়াজ্জেম বললেন, 'আমাদের সঙ্গে শেখ মুজিব আছেন'

কথা হলো বৈঠক হবে মি. ওঝার বাসায়। কিন্তু সেখানে যেতে হবে যাতে কেউ কোনো কিছু বুঝতে বা ধারণা করতে না পারে। তখন ফার্মগেট সড়কটি ছিল ছোট। রাস্তার পাশে কিছু ফার্ম (খামার) ছিল। সেখান থেকে শ্যামলীর দিকে একটি সড়ক চলে গেছে। ঠিক হলো আমরা সেই সড়কমোড়ে সন্ধ্যা ছয়টার পর অবস্থান করব। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে। আমি আর মোয়াজ্জেম ঠিক সোয়া ছয়টায় সেখানে পৌঁছার একটু পরই একটা গাড়ি এসে আমাদের সামনে দাঁড়ায়। ভেতরে লাইট নেই। আমাদের গাড়িতে উঠিয়ে অন্য একদিকে ঘুরে গাড়িটি ধানমন্ডির ২নং সড়কে মি. ওঝার বাসায় পৌঁছে। তাঁর তৃতীয় তলার বাসায় আমাদের একটি কক্ষে বসানো হয়। সেখানে দেখি, একটা টেবিলে কতগুলো গরম মশলা, দারুচিনি, এলাচি, কিসমিস ইত্যাদি রাখা আছে। কুশল বিনিময়ের ফাঁকে অল্পক্ষণের মধ্যে চা-পান করতে করতেই কথা শুরু হয়। মি. ওঝা আমাদের পরিকল্পনা এবং ভারতের কাছে কী ধরনের সাহায্য চাই তা জানতে চান। আমাদের পক্ষে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম বললো, 'আমরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে চাই। আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ে পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলায়) ক্যান্টনমেন্ট, গভর্নর হাউস সবকিছু দখল করে

নেব। সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করে নিষ্ক্রিয় করে ফেলবো। তার আগে প্রাথমিকভাবে কিছু ছোট অস্ত্র দরকার লোকজনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। আমাদের প্রস্তুতি শেষ হলেই আমরা আক্রমণ শুরু করবো। আপনাদের দেখতে হবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যাতে অস্ত্র ও সৈন্য আসতে না পারে। সেজন্য আকাশ ও নৌপথ বন্ধ করে দিতে হবে।' রাজনৈতিক শক্তির অবস্থানের ব্যাপারে মি. ওঝা জানতে চাইলে মোয়াজ্জেম তাঁকে জানান, 'আমাদের পেছনে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে করাচিতে আমাদের কথা হয়েছে।'

সব কথা শুনে মি. ওঝা জানান, বাংলাদেশের পক্ষে একটা প্রতিনিধি দল ভারতের আগরতলা যেতে হবে। সেখানে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট কর্মকর্তারা থাকবেন। ওই বৈঠকে উভয়পক্ষের লোকজন বসে বাংলাদেশের কী কী সাহায্য দরকার, ভারতীয়রা কী কী সাহায্য দিতে পারেন আলোচনা করে ঠিক করতে হবে।"

ভারতের সীমান্তে গিয়ে সমস্যায় না পড়ার জন্য দুটি পাসওয়ার্ড দেওয়া হয় দূতাবাস থেকে। এর একটি হলো 'বাস্কেট'। ফেনী থেকে সীমান্তে গিয়ে চেকপোস্টে প্রহরীদের 'বাস্কেট' বললেই ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। অপরটি হলো 'ফ্লাওয়ার'। ভেতরে যাওয়ার পর সেনা কর্মকর্তারা কে পাঠিয়েছেন জানতে চাইবেন। তখন ফ্লাওয়ার বললেই তাঁরা বুঝবেন সঠিক লোকই গেছেন এবং আলোচনায় রাজি হবেন।

সামাদ জানান, এই বৈঠক থেকে আসার কয়েকদিন পরই আগরতলায় যাওয়ার জন্য তিনজন প্রতিনিধি ঠিক করা হয়। একজন আলী রেজা (তখনকার ইন্সট্রাক্টর পিএসপি) আর একজন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও অন্যজন নৌবাহিনীর লে. মতিউর রহমান। খবর পেয়ে তিনি (লে. মতিউর) করাচি থেকে এসে বললেন, 'আমরা যদি ওখানে (সীমান্তে বা ভারতে) কোনো কারণে মারা পড়ি তাহলে আমাদের পরিবারের অবস্থা কি হবে? কাজেই আমাদের একটা গ্যারেন্টি দিতে হবে।'

মোয়াজ্জেমের বক্তব্য ছিল, এটাতো অলিখিত-অঘোষিত সংগ্রামের পথ। এখানে তো গ্যারান্টি দিয়ে কিছু হতে পারে না। এরপর লে. মতিউর রহমান অগ্রিম আর্থিক সাহায্যের কথা বললে সেরকম আর্থিক ক্ষমতাও নেই বলে জানান মোয়াজ্জেম। এ অবস্থায় মতিউর রহমান আগরতলা যেতে রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিবকে আগরতলা পাঠানো হয়। সামাদের ওপর দায়িত্ব ছিল তাঁদেরকে ফেনী চেক পোস্ট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসা।

কথামত সামাদ আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিবকে চেক পোস্টের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে ফিরে আসেন। সেখান থেকে এসে আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিব জানান, বিস্তারিত আলোচনার জন্য পরে আরও বৈঠকের প্রয়োজন আছে। সামাদের মতে, আগরতলায় ওই বৈঠকের সূত্র ধরেই পাকিস্তান সরকার মামলাটিকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে সাজিয়েছিল।

শেখ মুজিব বললেন, 'দু'জনে মিলে যুদ্ধ করবো'

রুহুল কুদ্দুস



পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ষাটের দশকের বিভিন্ন সময় রাজনীতি ও প্রশাসনে প্রকাশ্য ও গোপনীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত সহযোগীদের অন্যতম ছিলেন তৎকালীন সিএসপি অফিসার রুহুল কুদ্দুস। তিনি ছিলেন নয় সদস্য বিশিষ্ট গোপন বিপ্লবী কাউন্সিলের সদস্য (ছদ্মনাম শেখর) এবং আগরতলা মামলার ১০ নং আসামি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগরের প্রবাসী বিপ্লবী সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মূখ্যসচিবের দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

রুহুল কুদ্দুসের জন্ম ১৯২৪ সালের ২৬ মে সাতক্ষীরা জেলার কাকরাঙা গ্রামে। মাত্র চার বছর বয়সে তাঁর বাবা রইছ উদ্দিন মারা যান। ১৯৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর ৪৯ সালে সিএসপি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ১৯৯১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তিনি ঢাকার বাসভবনে মারা যান।

রুহুল কুদ্দুস সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ২০০৮ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে যোগাযোগ করি তাঁর সন্তান এহসান-উল-আমিনের সঙ্গে তাঁর ১০১, গুলশান এভেনিউর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে। তিনি তাঁর বাবার মুখ থেকে শোনা কথার উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন এমন অনেক তথ্য-যা বাংলাদেশের জন্ম-ইতিহাস রচনায় বড় সহায়ক হবে। এহসান-উল-আমিনের দেওয়া তথ্যের সার সংক্ষেপ:

রুহুল কুদ্দুস সক্রিয় রাজনীতি না করলেও অনেক ছাত্র নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল তাঁর। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবের কক্ষে গিয়ে প্রায় সময় বিশ্রাম নিতেন তিনি। সেই সুবাদে শেখ মুজিবের সঙ্গে ক্রমে গড়ে উঠে ঘনিষ্ঠতা। রুহুল কুদ্দুস ১৯৫৪ সালে ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে অনেক সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে প্রশাসনিক নানা কাজে যুক্ত থাকতেন। এ সময় তিনি প্রশাসনে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অনৈতিক শাসন শোষণসহ বৈষম্যের নানা চিত্র দেখতে পান।

এসব কিছু বিশ্লেষণ করে তিনি বাঙালিদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে কিছু প্রস্তাবনা তৈরি করে মাওলানা ভাসানী, নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার প্রমুখ জ্যেষ্ঠ বাঙালি নেতার কাছে যান। তাঁরা সবাই 'দেখি কী করা যায়' মন্তব্য করে রুহুল কুদ্দুসকে এড়িয়ে যান। কিন্তু শেখ সাহেবের কাছে গেলে সব কথা শুনে রুহুল কুদ্দুসকে জড়িয়ে ধরে শেখ সাহেব বলেন, 'কুদ্দুস আমি তো লড়াই শুরু করে দিয়েছি তোমাকে পেয়ে ভালই হলো, দুজনে মিলে যুদ্ধ করব।' সেই যে যাত্রা শুরু-বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর সহযোগী হিসেবে ছিলেন রুহুল কুদ্দুস।

১৯৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে বঙ্গবন্ধু 'পূর্ব পাকিস্তান' প্রাদেশিক সরকারের বাণিজ্য, শিল্প ও শ্রমমন্ত্রী থাকাকালে তাঁর চেষ্টায় রুহুল কুদ্দুস পূর্ব পাকিস্তান শিল্প অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক পদে বদলি হন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরামর্শক্রমে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পনীতি প্রণয়ন এবং তা পাশ করার ব্যাপারে ভূমিকা রাখেন। বঙ্গবন্ধু এবং রুহুল কুদ্দুসের সহযোগিতায় পশ্চিমা আমলাদের বাধা সত্ত্বেও এদেশে প্রথম চার শতাধিক বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি পাওয়া যায়। এ এদেশের সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বাঁচানোর তাগিদে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন প্রতিষ্ঠা এবং এফডিসি প্রতিষ্ঠায়ও তিনি সহযোগিতা করেন। ঢাকার তেজগাঁ শিল্প এলাকা, এফডিসি, চট্টগ্রামের কালুরঘাট, বায়েজিদ বোস্তামীর পুরোনো শিল্প ইউনিটগুলো বঙ্গবন্ধু ও রুহুল কুদ্দুসের অবদানের সাক্ষী।

মিথ্যা মামলার ভয়, পদোন্নতির প্রলোভন

এদিকে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করার পর শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ বিভিন্ন বিষয়ে বাঙালিদের সহযোগিতা করায় অসন্তুষ্ট পশ্চিমা আমলারা রুহুল কুদ্দুসকে যশোরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে বদলি করে দেয়। আইয়ুব খান বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র হনন ও সাজা দেওয়ার লক্ষ্যে এবডো তৈরি করলে তাতে প্রধান টার্গেট করা হয় বঙ্গবন্ধুকে। আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে প্রায় ২৫-২৬টি দুর্নীতি মামলা সাজিয়ে বিচারের সম্মুখীন করলেও তিনি প্রতিটি মামলা মিথ্যা প্রমাণ করে আদালত থেকে অব্যাহতি পেতে থাকেন। তখন পূর্ব-পাকিস্তানের অ্যাডভোকেট-জেনারেল বিএ সিদ্দিকীর পরামর্শে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জাকির হুসেন যশোর থেকে রুহুল কুদ্দুসকে ডেকে এনে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অনুমতি প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে উৎকোচগ্রহণ জাতীয় একটি বানানো মামলায় সাক্ষী দিতে বলেন। এজন্য ভালো পোস্টিং, পদোন্নতি এবং অর্থের লোভে দেখানো হলেও এতে রুহুল কুদ্দুস রাজি হননি। ফলে তাঁকে গভর্নর হাউসের একটি নির্জন কক্ষে দুদিন আটক রেখে চাকরিচ্যুতি, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে (মিথ্যা) মামলায় জড়িয়ে জেলখানায় আটক রাখা এবং সবশেষে হত্যা করে লাশ গুম করার হুমকি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে বাঙালি সিএসপি মহলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে তাঁকে আর না ঘাটিয়ে যশোরে ফেরৎ পাঠানো হয়।

১৯৫৯ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসের দিকে কয়েকটি বিদেশি সংবাদপত্রে আইয়ুব খানের সামরিক সরকার পূর্ব-বাংলা ভারতকে দিয়ে কাশ্মীর বদলে দিতে চায় বলে খবর প্রকাশিত হলে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে কিছু গোপন রাজনৈতিক বৈঠকে অংশ নেন রুহুল কুদ্দুস। তাঁর গোপন রাজনৈতিক তৎপরতায় যুক্ত হওয়ার পালা এখান থেকেই শুরু। তেজগাঁ শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন কারখানা, স্বামীবাগ, রাজারবাগ, কবি জসীম উদ্দিন রোড, নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন বাসা ও অফিসে এসব গোপন বৈঠক বসত। এসব বৈঠকে আওয়ামী লীগের দু-একজন নেতা, আহমেদ ফজলুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বন্ধু, অন্য দু-একটি দলের নেতা এবং বিশ্বস্ত কয়েকজন ছাত্রনেতা উপস্থিত থাকতেন।

স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত

এসব বৈঠকের মধ্য দিয়েই রুহুল কুদ্দুস ও আহমেদ ফজলুর রহমানের সমন্বয়ে আওয়ামী লীগের বাইরে বঙ্গবন্ধুর একটি গোপন পরামর্শক সেল গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু নানা বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং সরকারের ভেতরের খবর সরবরাহ করাসহ অন্যান্য বাঙালি নেতাদের সঙ্গে একটি যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব তাঁরা পালন করতেন। গোপন বৈঠকগুলোতে বাঙালির সার্বিক মুক্তির ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনায় বঙ্গবন্ধুসহ রুহুল কুদ্দুস, আহমেদ ফজলুর রহমান সংশ্লিষ্টদের বোঝান যে, স্বাধীনতা ছাড়া মুক্তি নেই। তখন তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাঙালিকে মানসিকভাবে তৈরি করার অর্থাৎ স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নেন। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিকভাবে বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নেন। গোপনে সিভিল সার্ভিসে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করার দায়িত্ব নেন রুহুল কুদ্দুস, আহমেদ ফজলুর রহমান ছাড়াও বিভিন্ন সেক্টরের কয়েক ব্যক্তি। এ সময় থেকে বঙ্গবন্ধু সংশ্লিষ্ট সেক্টরে আরো কিছু বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কাজে নিয়োজিত করেন। তাঁরা অনেকেই অনেককে চিনতেন না। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর দেওয়া দায়িত্ব পালন করতেন। এমনকি পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা থেকে শুরু করে আইয়ুব খানের ক্ষমতাসীন কনভেশন মুসলিম লীগের এমপি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব লোক ছিলেন। তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর সরবরাহ করতেন।

বঙ্গবন্ধুসহ বিভিন্ন বাঙালি রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা জানতে পেরে ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার রুহুল কুদ্দুসকে পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ে উপ-সচিবের পদমর্যাদায় ডাইরেক্টর অব এক্সপেনডিচার অ্যান্ড কন্ট্রোল পদে বদলি করে। সেখানে গিয়ে তিনি বাঙালি সিএসপি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রচেষ্টা চালান।

পাকিস্তানের সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থমন্ত্রণালয়ের কাছে থাকে। রুহুল কুদ্দুস সে সময়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নথি থেকে পাকিস্তানের দুই অংশের রাজস্ব আয়, রপ্তানি আয় এবং দুই অংশের জন্য বরাদ্দ ও ব্যয়ের খতিয়ান সংগ্রহ করে গোপনে তা বঙ্গবন্ধুর কাছে পৌঁছে দেন। বঙ্গবন্ধু এটি পড়ে প্রয়াত সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন

মানিক মিয়াকে দিলে মানিক মিয়া তা দৈনিক ইত্তেফাকের উপ-সম্পাদকীয়তে ছদ্মনামে ১৯৬১-র সেপ্টেম্বর থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন।

পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষ্যমের বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে ইত্তেফাকে প্রকাশের পর থেকে সাধারণ মানুষ পশ্চিম-পাকিস্তানিদের প্রতি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার রুহুল কুদ্দুসকে সন্দেহ করে এবং ১৯৬২-র এপ্রিল মাসে তাঁকে একদিনের নোটিশে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় ছয় মাস পদ ও বেতনহীন থাকার পর অর্থমন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব ভিভি জাফরীর চেষ্টায় তিনি চাকরি ফিরে পান।

রাজনৈতিক অঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর বাইরেও অন্যান্য দলের কয়েকজন বাঙালি রাজনৈতিক নেতা ও ষাটের দশকের কয়েকজন ছাত্র নেতার সঙ্গে রুহুল কুদ্দুসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁদের মধ্যে ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, প্রয়াত বামপন্থী নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা, শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, কমরেড ফরহাদ, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক প্রমুখ অন্যতম।

বিপ্লবের পরিকল্পনা

বঙ্গবন্ধু একবার করাচিতে রাজনৈতিক কাজে গেলে সেখানে নৌবাহিনীর তরুণ অফিসার কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে বাঙালিদের ওপর পশ্চিমাদের অনবরত অত্যাচারের বিবরণ দেন। তিনি ইতিমধ্যে বেশ কিছু বাঙালি সামরিক অফিসার ও কর্মচারীর সংগঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুকে বলেন, 'রাজনৈতিক সমর্থন ছাড়া কোনো কিছু করা সম্ভব নয়, আপনিই একমাত্র বাঙালি রাজনৈতিক নেতা। আপনি সার্বিক নেতৃত্ব দিলে আমরা এগিয়ে যাব।' কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার লোক কিনা তা নিজস্ব সোর্সের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর পূর্ব-সার্কেলের এক বৈঠক ডাকেন এবং এতে মোয়াজ্জেমও উপস্থিত হন। বৈঠকে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরেন।

কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের দেওয়া তথ্য নিয়ে তা দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বাংলাদেশকে স্বাধীন করা হবে। সে অনুযায়ী কর্ম পদ্ধতিও নির্ধারণ করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সবকিছু প্রস্তুত হলে একটি নির্দিষ্ট তারিখে গভীর রাতে বাঙালি সেনা, নৌ, বিমানবাহিনীর সদস্যরা অতর্কিতে কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার দখল ও ঢাকা সেনানিবাসে বিভিন্ন ব্যাটালিয়নের অবাঙালিদের গ্রেপ্তার করা হবে। বিমান বন্দর দখল করে বিমান বাহিনীর যে ২-৩টি বিমান ছিল তা দখল এবং ঢাকা সেনানিবাসসহ ঢাকা শহর নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। এ জন্য বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য একটি কোড মেসেজ ঠিক করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে সবাই এক সঙ্গে বিদ্রোহ করার পর বঙ্গবন্ধু রেডিওর মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এ ব্যাপারে সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাবেন। একই সঙ্গে কুমিল্লা ও যশোরেও বিদ্রোহ হবে এবং রাজনৈতিক সমর্থন হিসেবে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের কর্মীরা রাস্তায় নেমে আসবে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সামরিক বাহিনীতে কর্মরত বাঙালিদের সংগঠিত ও নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় কমান্ডার মোয়াজ্জেমকে, বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সংগঠিত এবং স্বাধীন সরকারের প্রশাসনিক রূপরেখা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় রুহুল কুদ্দুস এবং আহমেদ ফজলুর রহমানকে।

অর্থসংগ্রহ, রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের সংগঠিত করাসহ সার্বিক নেতৃত্বের দায়িত্ব বঙ্গবন্ধু নিজে নেন। পরবর্তীতে (৬৬-৬৭ সালে) অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের দায়িত্ব দেওয়া হয় সিএসপি কেএম শামসুর রহমান (জনসন খান) কে। তিনি তখন ইন্দোনেশিয়ায় পাকিস্তান দূতাবাসে ছিলেন। এই পরিকল্পনা সার্থক করার জন্য বহির্বিশ্ব থেকে কিছু অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে সহযোগিতা দিতে ভারত সরকারকে রাজি করানোর দায়িত্ব ছিল বঙ্গবন্ধু ও সিএসপি অফিসারদের ওপর।

সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্য ছাড়াও ছাত্রনেতৃবৃন্দের মধ্যে দু-এক জনকে দিয়ে তিনি ছাত্র আন্দোলনকে স্বাধীনতার দিকে পরিচালনা করতেন। ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, অতি বিশ্বস্ত দু-এক জন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকেও বিভিন্ন কাজে লাগিয়েছেন। তাঁরা কেউ জানতেন না নিজেরা ছাড়া এ প্রক্রিয়ায় আর কে জড়িত আছেন। এমনকি অনেকে মূল উদ্দেশ্যও জানতেন না। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর দেওয়া দায়িত্ব চোখ বন্ধ করে পালন করতেন। পাকিস্তানের প্রখ্যাত ২২ পরিবারের মধ্যে অন্যতম ধনকুবের ইউসুফ হারুন ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একান্ত অনুরাগী এবং অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষক। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তাজউদ্দিন আহমেদ এ বিষয়ে জানতেন এবং বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু তাঁকে এই গোপন তৎপরতায় না জড়িয়ে প্রকাশ্য রাজনীতির দিকেই নিয়োজিত রাখেন।

কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর বাঙালিদের অধিকহারে সংগঠিত করার কাজ শুরু হলে ধীরে ধীরে বিপ্লবীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। তাঁরা প্রথমে টার্গেট করে বাঙালিদের সঙ্গে খাতির জমাতেন। তারপর আস্তে আস্তে নিজেদের অধিকার আদায়, পাকিস্তানিদের অমানবিক আচরণ, শোষণের অবসান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে ওই ব্যক্তির মানসিকতা অনুমান করে নিতেন। এরপর আস্তে আস্তে বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট করতেন। সাধারণত এসব বৈঠকে চার থেকে সাত জন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন। তবে সবার পরিচয় যাতে গোপন থাকে সেজন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হতো। ক্যাপ্টেন হুদা ঢাকা সেনানিবাসে সেনা পরিবহনের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁকে বলা হয়েছিল অভ্যুত্থানের দিন একটি সংকেত এবং স্থানের নাম জানানোর এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পরিবহন নিয়ে তিনি অভ্যুত্থানের পক্ষে যাত্রা করবেন।

পাক-ভারত যুদ্ধ ও কৌশল পরিবর্তন

প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত হলে বঙ্গবন্ধু নীতি-নির্ধারকদের এক গোপন সভা ডাকেন তাঁর ৩২ নম্বরের বাড়িতে। ৬৫-এর ৪ সেপ্টেম্বরে বৈঠকে অবিলম্বে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে মোয়াজ্জেমও উপস্থিত হন। বিপ্লবীদের জন্য সাব-মেশিন গান, লাইট মেশিনগান, রাইফেল, প্রয়োজনীয় গুলি এবং বেশ কিছু বিস্ফোরক এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু অস্ত্র জোগাড় করার ব্যাপারে সেনা অফিসার-জওয়ানদের কয়েক জায়গায় যোগাযোগ করার দায়িত্ব দেন এবং তিনি নিজে অর্থের যোগান দেওয়ার আশ্বাস দেন। পরপর ভারতের বিমান, নৌ, স্থল পথ বন্ধ রাখার ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা হয়। ভারতে কিংবা লন্ডনে ভারতের একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু বসার সিদ্ধান্ত নেন। কথা হয় যে, ভারতের পূর্ণাঙ্গ সম্মতির সবুজ সংকেত পাবার কয়েক দিনের মধ্যেই সুবিধামত সময়ে বিপ্লব ঘটানো হবে। এদিন রাতেই কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন করাচি রওনা হন। কিন্তু পরদিন সকালেই পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পিছিয়ে যায়। রাজনীতির গতিপথ নতুন মোড় নেয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক কৌশল কিছুটা পরিবর্তন করেন।

ছয় দফার মূল উদ্দেশ্য এক দফা

এভাবে বিপ্লবের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, রুহুল কুদ্দুস, আহমেদ ফজলুর রহমান কয়েক দফা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেন যে, বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দফাওয়ারি দাবিভিত্তিক একটি গণআন্দোলন সৃষ্টি করে মানুষের চেতনাকে আরও শাণিত করা হবে। পাশাপাশি গোপন তৎপরতাও চলবে। ভেতরে ভেতরে সেনা সদস্যদের আরও সংগঠিত এবং প্রশিক্ষিত করে সুযোগমত কাজে লাগানো হবে। এ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শে রুহুল কুদ্দুস বিভিন্ন দেশের ফেডারেল রাষ্ট্রপদ্ধতির সরকার ব্যবস্থাসহ নানা দিক নিয়ে প্রচুর গবেষণা করে একটি দলিল তৈরি করেন। লাহোরে গোল টেবিল বৈঠকের আগেই এই দলিল নিয়ে বঙ্গবন্ধু রুহুল কুদ্দুস এবং তাজউদ্দিনকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। তারপর দলিলটি সাতটি দফায় ভাগ করা হয়। বঙ্গবন্ধু দলিলটির প্রাদেশিক পরিষদের ভোটে প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্তির দাবি সংক্রান্ত সাত নম্বর দফাটি বাদ দিয়ে ছয়টি দফা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করেন যা পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ছয় দফারও মৌল উদ্দেশ্য ছিল এক দফা– স্বাধীনতা। ছয় দফা এমনভাবে তৈরি হয় যাতে পাকিস্তানি শাসকরা ছয়-দফা বাস্তবায়ন করতে গেলে দেখা যেত যে, শুধু দেশটার নাম পাকিস্তান থাকছে, সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাঙালিদের হাতেই চলে যাচ্ছে।

ছয় দফা

১। সরকারের ধরণ হবে ফেডারেল এবং পার্লামেন্টারি। এতে ফেডারেল আইনসভার এবং ফেডারেশনের অন্তর্গত ইউনিট-আইনসভার নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। ফেডারেল আইনসভার প্রতিনিধিত্ব হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

২। ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় এবং নিচের ৩নং দফার শর্তাধীনে।

৩। দেশের দুইটি অংশের জন্যে দুইটি পৃথক এবং সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে অথবা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যবস্থাসহ দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে।
এতে আঞ্চলিক ফেডারেল ব্যাংক থাকবে। এই ব্যাংকগুলি এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর এবং মূলধন পাচার বন্ধের ব্যবস্থা করবে।
৪। রাজস্ব সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব এবং ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর হাতে থাকবে। দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র দপ্তর পরিচলনার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব ফেডারেল সরকারকে দেয়া হবে। শাসনতন্ত্রে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে উক্ত কর আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ফেডারেল সরকারের তহবিলে জমা হবে। করনীতির ওপর অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অভিলক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ফেডারেল সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন মিটাবার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।
৫। ফেডারেশনের অন্তর্গত অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেকটি ইউনিটের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব রাখার শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকবে। শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী ধার্য হারের ভিত্তিতে অঙ্গরাষ্ট্রগুলো ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাবে। ফেডারেল সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পররাষ্ট্র নীতির কাঠামোর মধ্য থেকে আঞ্চলিক সরকারগুলিকে বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা ও চুক্তির ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে দেওয়া হবে।
৬। কাযকরভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের অঙ্গ রাষ্ট্রগুলিকে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিশিয়া বাহিনী রাখার ক্ষমতা দেওয়া হবে।
ছয় দফার আন্দোলনে হরতাল সফল করাসহ নানাভাবে সহযোগিতা দেন রহুহুল কুদ্দুস। ছয়-দফার সমর্থনে প্রচার চালানোর জন্য বঙ্গবন্ধু সারাদেশে ঝটিকা সফর করেন। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ৬-দফার সমর্থনে প্রথম হরতাল আহ্বান করা হয়। জুন মাসে বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের প্রথম সারির প্রায় নেতা কারাগারে আটক ছিলেন। বঙ্গবন্ধু জেল থেকে আওয়ামী লীগের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরীকে দিয়ে রুহুল কুদ্দুসের কাছে খবর পাঠান, 'যে ভাবেই হোক ৭ জুনের সফল হরতাল দেখতে চাই।' রুহুল কুদ্দুস এ হরতাল সফল করবার জন্য ঢাকা নগরীর একটি ম্যাপ কিনে নিয়ে কোথায় কিভাবে ব্যারিকেড দিতে হবে, কোথায় ছেলেরা লুকিয়ে থাকবে সবকিছু এঁকে তৈরি করে দেন। অপরদিকে তিনি ফোনে সারা পূর্ব-বাংলায় অবস্থানরত বিশ্বস্ত বাঙালি সিএসপি ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে হরতাল সফল করার ব্যাপারে আওয়ামী লীগকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান। শেখ ফজলুল হক মনি ও সিরাজুল আলম খান প্রায় সময় কুদ্দুসের কাছে এসে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নিতেন। বঙ্গবন্ধুই তাঁদের বলেছিলেন তাঁরা যেন বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে রুহুল কুদ্দুসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন।
বঙ্গবন্ধু জেলে থাকা অবস্থায় রুহুল কুদ্দুস বেগম মুজিবের মাধ্যমে বিভিন্ন নেতা-কর্মীদের খোঁজ খবর রাখতেন। এ সময় অনেক হুলিয়া প্রাপ্ত কর্মীকে তিনি পুলিশের চোখে ফাঁকি

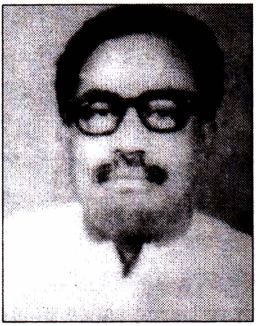
দিয়ে নিজের গাড়িতে করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছড়িয়ে দিতেন।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ এ ইয়াহিয়া খান মার্শাল'ল জারি করার পর তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাবার পর বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক কৌশল কিছুটা পরিবর্তন করেন। তাঁর পক্ষে যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে সে জোয়ারকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাবার কৌশল নেন তিনি। তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তরা পর্দার অন্তরালে চলে যান। এরপর রুহুল কুদ্দুস ঢাকায় ব্যবসা শুরু করেন। তিনি পরবর্তীতে সক্রিয় রাজনীতি না করলেও বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে বিভিন্ন জেলার ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ ও শ্রমিক লীগের বিভিন্ন সম্মেলনে অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

ওইসব তোমাদের জেনে লাভ নেই

ভূপতিভূষণ চৌধুরী



পঞ্চাশের দশকে বৃহত্তর চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতাদের একজন আগরতলা মামলার ১২নং আসামি ভূপতিভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী। ১৯৩০ সালের ১৬ ডিসেম্বর পটিয়া উপজেলার হাবিলাসদ্বীপ গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী ছিলেন চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ এলাকার ব্যবসায়ী। মানিক চৌধুরী ১৯৪৬ সালে চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও ৪৭-৪৮ সালে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র থাকার সময় তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি দেশে এসে পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনার পাশাপাশি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সংস্পর্শে এসে মুসলিম লীগ বিরোধী অসাম্প্রদায়িক আন্দোলনে অংশ নেন। পরবর্তীতে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, বাষট্টির সামরিক আইনবিরোধী আন্দোলন ও ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। আগরতলা মামলা ছাড়াও সরকারবিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখার কারণে আরও একাধিকবার তিনি কারাবরণ করেন। হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

মানিক চৌধুরী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ২০০৯ সালের ২০ জানুয়ারি চট্টগ্রামের আছদগঞ্জ এলাকার রামজয় মহাজন সড়কের বাসভবনে গিয়ে কথা বলি তাঁর স্ত্রী সবিতা চৌধুরী (৭২) ও বড় ছেলে দীপঙ্কর চৌধুরী কাজলের সঙ্গে। তারও আগে ২০০০ সালে মানিক চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, আগরতলা মামলার আসামি বিধানকৃষ্ণ সেনের কাছেও মানিক চৌধুরী সম্পর্কে জানা গেছে বেশ কিছু তথ্য। তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়েই এ সংগঠনের সাথে জড়িত হন মানিক চৌধুরী। প্রয়াত জনপ্রিয় আওয়ামী লীগ নেতা এমএ আজিজ ও জহুর আহমদ চৌধুরীদের সাথে দলের বিকাশে তিনিও ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৪ সালের শুরুতে নিজেদের জায়গা সংক্রান্ত মামলার ব্যাপারে তিনি তৎকালীন আওয়ামী লীগের অন্যতম শীর্ষ নেতা ও আইনজীবী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। সে সময় মানিক চৌধুরীর

সঙ্গে যোগাযোগ এবং অল্পদিনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় তৎকালীন যুব ও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর তিনি জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ষাটের দশকের শুরু থেকে একজন পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত কর্মী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও গভীর হয়।

বিপ্লবী সংগঠনে ভূমিকা

ষাটের দশকের গোপন বিপ্লবী আন্দোলনে মানিক চৌধুরীর সম্পৃক্ততা সম্পর্কে তাঁর সুখ-দুঃখের সাথী বিধান সেন জানান, একজন জাতীয়তাবাদী ও নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা হিসেবে গোপন সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকা বঙ্গবন্ধুর জন্য সে সময়কার পরিবেশ পরিস্থিতিতে বাস্তবসম্মত ছিল না। সামরিক গোয়েন্দা নজরদারি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে চারদিক সামলে ব্যস্ত সময় কাটাতে হতো তাঁকে। এ ছাড়া আন্দোলনের নানা পর্যায়ে সামরিক সরকার বিরোধী বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে গিয়ে প্রায় কারারুদ্ধ হতেন তিনি। এ অবস্থায় বিপ্লবী প্রক্রিয়া যাতে অব্যাহত থাকে এবং বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যদের মনোবল যাতে ভেঙে না পড়ে একই সঙ্গে তাঁর ওপর যাতে গোয়েন্দারা অতিমাত্রায় সন্দেহপরায়ণ হয়ে না ওঠে সে ব্যাপারে সচেতন ছিলেন বঙ্গবন্ধু। আর তাই তিনি বিপ্লবী সংগঠনের প্রথম সারির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ, মতবিনিময়, তথ্য আদান-প্রদান, আর্থিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিকভাবেও স্বাধীনতাপন্থী স্রোত তৈরির জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে তিনি যে কয়েকজন বেসামরিক বিশ্বস্ত দলীয় লোক নিয়োজিত করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ও প্রথম ছিলেন মানিক চৌধুরী খ্যাত ভূপতিভূষণ চৌধুরী, ডা. ছৈয়দুর রহমান, বিধানকৃষ্ণ সেন এবং আবুল হোসেন। প্রথম তিনজন চট্টগ্রামের অধিবাসী। আবুল হোসেন মুন্সিগঞ্জের কামারগাঁওয়ের বাসিন্দা। এঁদের মধ্যে মানিক চৌধুরী বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার বিষয়বস্তু সময় সময় বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বেগম মুজিবকে অবহিত করতেন।

মানিক চৌধুরীর বাসায় মুজিব ও বেগম মুজিব

মানিক চৌধুরীর স্ত্রী সবিতা চৌধুরী বলেন, "৬১-৬২ সালের দিক থেকে তাঁকে (মানিক চৌধুরীকে) প্রায় সময় ব্যস্ত-চঞ্চল দেখাতো। ঘরে বা ব্যবসায় তেমন সময় দিতেন না। আজ চট্টগ্রাম তো কাল ঢাকায়, কয়েকদিন পর অন্য কোথাও যাওয়া আসা করতেন। ৬৪-৬৫ সালে করাচিতেও গিয়েছেন কয়েকবার। আমাদের এখানে (আছদগঞ্জে) তখনও এই দালান উঠেনি। নিচে একতলা ঘর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সেই সময় শেখ সাহেব মাঝে মাঝে আসতেন এখানে। উনিও (মানিক চৌধুরী) শুনতাম ঢাকায় যেতেন, শেখ সাহেবের বাসায় যেতেন। কি করেন, কোথায় যান জানতে চাইলে বলতেন, 'ওইসব তোমাদের জেনে লাভ নেই। তুমি ছেলের পড়াশোনা দেখ।' কখনও কখনও বলতেন, 'ব্যবসার কাজে নানা জায়গায় যেতে হয়।' ৬৪-৬৫ সালের দিকে বেগম মুজিব এবং তাঁর মেয়ে শেখ হাসিনাও আমাদের খাতুনগঞ্জের বাসায় এসেছিলেন বেড়াতে। তখন বুঝেছি শেখ

সাহেব ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ওর (মানিক চৌধুরীর) কত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পরে যখন সে ৬৬ এবং ৬৭ সালে গ্রেপ্তার হয় তখন থেকে জানতে পারি শেখ সাহেবের সঙ্গে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য গোপন আন্দোলনে সে জড়িত ছিল। আর এজন্যই বিভিন্ন জায়গায় মিটিংয়ে যাতায়াত করতো।"

সবিতা চৌধুরী জানান, মানিক চৌধুরীর সঙ্গে বিধান কৃষ্ণ সেনের আন্তরিক, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনিও প্রায় সময় আসতেন রামজয় মহাজন লেনের বাসায়। ডা. ছৈয়দুর রহমানও আসতেন। অন্য আরও অনেকেও দোকানে আসতেন কিন্তু নাম পরিচয় তিনি জানতেন না। তিনি জানান, ৬৭ সালের ডিসেম্বরে আগরতলা মামলায় গ্রেপ্তারের পর মানিক চৌধুরীর ওপর প্রচণ্ড রকম নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতনে তাঁর একটা কান ও একটা চোখ আংশিক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ডা. ছৈয়দুর রহমান ও বিধান সেনের ওপরও একই রকম নির্যাতন করা হয়। সরকার বিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে ১৯৬৬ সালের ২০ মে মানিক চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয় পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে। ওই সময় ডা. ছৈয়দুর রহমান মানিক চৌধুরীর বাসায় এসে তাঁর স্ত্রী সন্তানদের খোঁজ-খবর নিতেন। ৬৭ সালের ২৩ জানুয়ারি মুক্তি পেয়ে মানিক চৌধুরী অবার ৯ ডিসেম্বরে গ্রেপ্তার হন চট্টগ্রামের বাসা থেকে। পরে জানা গেছে, কয়েকদিন চট্টগ্রাম কারাগারে রাখার পর ঢাকার রাজারবাগে নিয়ে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সময় মুক্তি পাওয়ার কয়েকমাস পর আবারও তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ৭০ এর শেষ দিকে মুক্তি পান।

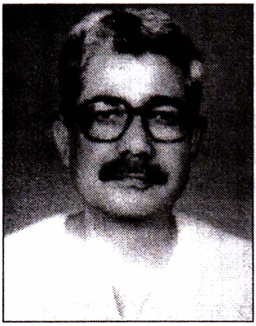
নিউ এজেন্সির টাকা গোপন আন্দোলনে

মানিক চৌধুরীর ছেলে দীপঙ্কর চৌধুরী ও সহযোগী বিধান সেনের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, ষাটের দশকের প্রথম দিক থেকে দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত মানিক চৌধুরী, এমএ আজিজ ও বঙ্গবন্ধুর যৌথ পরিচালনায় খাতুনগঞ্জের আছদগঞ্জ এলাকায় 'নিউ এজেন্সি' নামে একটি ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং ও ইনডেনটিং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল। এটির দেখাশোনার মূল দায়িত্বে ছিলেন মানিক চৌধুরী। প্রতিষ্ঠানের আয়ের সিংহ ভাগই খরচ হতো আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাজে। একটা অংশ গোপনে যেতো সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতিমূলক কাজে জড়িতদের কাছে। বিধান সেনের মতে, স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতির গোপন পরিকল্পনার ব্যাপারটি চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে সম্ভবত মানিক চৌধুরীকেই প্রথম জানান বঙ্গবন্ধু। আর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিধান সেনের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতাও তৈরি হয় মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে। আগরতলা মামলার আরও একাধিক আসামি গোপন বিপ্লবী আন্দোলন প্রক্রিয়ায় মানিক চৌধুরীর সম্পৃক্ততা এবং তাঁর মাধ্যমে সংগঠনের জন্য অর্থ পাওয়ার বিষয়টি এ লেখককে জানিয়েছেন।

সবিতা চৌধুরী ও ছেলে দীপঙ্কর চৌধুরী জানান, তাঁরা জেনেছেন যে, '৭১ সালের মার্চে মুজিব-ভূট্টো আলোচনার সময় অন্যদের সঙ্গে মানিক চৌধুরীও কয়েকবার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন। তাজউদ্দিন আহমদই তাঁকে তখন ফোনে ঢাকায় ডেকে পাঠান। স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের কাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন মানিক চৌধুরী।

আওয়ামী লীগের অনেক নেতা কর্মী জানতেন না

বিধান কৃষ্ণ সেন



শ্রী বিধানকৃষ্ণ সেনের জন্ম ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার সারোয়াতলী গ্রামে। বাবা রাজেন্দ্র নারায়ন সেন ছিলেন সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক। রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক এবং চট্টগ্রাম সিটি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি পাস করা বিধান সেন ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

৪৭ এর আগে তিনি নেতাজী সুভাষ বসুর ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মানিক চৌধুরীর ব্যবসায়িক সহযোগীও ছিলেন তিনি। অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মী বিধান সেনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, কথাবার্তা এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে শ্রী সেন আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। সেই সুবাদে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। তিনি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় ভূমিকা রাখেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে অবহেলিত, বিক্ষুব্ধ বাঙালি সৈনিকদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে যোগাযোগ ও প্রয়োজনে বেগম মুজিবের মাধ্যমে সংবাদ বিনিময়ের জন্য বিধান সেনকেও দায়িত্ব দেওয়া হয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেও তাঁর ছিল সক্রিয় ভূমিকা। স্বাধীনতার পর প্রথমে তিনি চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হন। পরে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠিত হলে তিনি ওই দলের প্রথম সিনিয়র সহসভাপতি হন এবং ৭৭ সালে কিছু দিন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন। এভাবে রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের গোপন বিপ্লবী তৎপরতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার সুবাদে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে নানান আয়োজন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানার কথা শ্রী বিধান সেনের। তাই তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানতে চাই বিস্তারিত।

তাঁর কথার সার সংক্ষেপ: পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ থেকে মুক্ত করে বাঙালি

জাতিকে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় শেখ মুজিবের মধ্যে ৬০ এর দশকের শুরু থেকে স্পষ্ট দেখা গেছে। বাঙালিদের মধ্যে পাকিস্তানের অস্তিত্বে আস্থাশীল, রক্ষণশীল এবং স্বাধীনতাকামী প্রগতিশীল দুটো অংশেরই অস্তিত্ব তখন থেকেই ছিল। সাম্প্রদায়িক, নিপীড়নমূলক ও রক্ষণশীল শাসন থেকে মুক্তির কথা অন্য অনেকেই ভাবলেও সবার আকাঙ্ক্ষাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে তাঁদের হয়ে স্পষ্ট কথা বলার ক্ষমতা ও প্রবণতা একমাত্র শেখ মুজিবেরই ছিল। স্বাধীনতার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হবার সংকল্প, পরিকল্পনা ও কৌশল ছিল বলেই একই লক্ষ্যে বিভিন্ন স্রোতধারার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলো তাঁর নেতৃত্বে আস্থাশীল ও একই প্লাটফরমে সমবেত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হয়েছিল।

একই সুতোয় তিন সংগঠনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড

বিধান সেন জানান, 'পূর্ববাংলা মুক্তিফ্রন্ট', 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ', 'কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস' এবং বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ছিল একই সূঁতোয় গাথা। শেখ মুজিব ৬১ সালেই 'পূর্ব বাংলা মুক্তিফ্রন্ট' নামে একটি গোপন সংগঠনের জন্ম দেন। এর মাধ্যমে কৌশলে ছাত্রসমাজসহ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার পক্ষে প্রয়োজনীয় জনমত সৃষ্টি ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের কথা চিন্তা করছিলেন তিনি। পাশাপাশি চলে ছাত্রদের মধ্যে সশস্ত্র ক্যাডার সৃষ্টির প্রক্রিয়া। এর অংশ হিসেবে ছাত্রলীগের স্বাধীনতাপন্থী প্রগতিশীল ও বাছাই করা বিশ্বস্ত কর্মীদের নিয়ে ১৯৬২ সালে গঠন করেন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ।' ১৯৬৪ সালে গঠন করেন পরিষদের 'কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস'। শুরুতে এসব সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যুক্ত ছিলেন সিরাজুল আলম খান (পরবর্তীতে জাসদের তাত্ত্বিক নেতা বলে পরিচিত), আবদুর রাজ্জাক (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী, বর্তমানে প্রয়াত) ও কাজী আরেফ আহমেদ (প্রয়াত জাসদ নেতা)। ৬৬ সাল থেকে আরো পরে এ সংগঠনের সাথে এমএ মান্নান, আবুল কালাম আজাদ, তোফায়েল আহমদ, আসম আবদুর রবসহ অনেকেই যুক্ত হন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ও পরামর্শে তাঁরা ছাত্র জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ছয় দফা ও স্বায়ত্বশাসনের দাবির আড়ালে স্বাধীনতার পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চালাতে থাকেন।

বিধান সেন বলেন, 'পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শেখ মুজিবের গোপন তৎপরতার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের অনেক প্রবীণ ও রক্ষণশীল নেতা-কর্মী প্রকৃতই অজ্ঞ ছিলেন।

এক পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গঠনের একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটের চিত্র পাওয়া যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কিছু বাঙালি সৈনিক ও অফিসার লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে পাকিস্তান সরকারের বাঙালি বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড বিশেষ করে সৈনিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক ও অপমানজনক আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে সংগঠিত হচ্ছিলেন। তাঁরাও ভাবছিলেন কি করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু

তাঁরা ছিলেন মূলত পশ্চিম পাকিস্তানে, অসংগঠিত ও সংখ্যায় অতি অল্প। তাঁরা তাঁদের মনোভাব প্রকাশের জন্য একজন দৃঢ়চিত্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের খোঁজ করছিলেন। তাঁরা আগে থেকেই বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ও বাঙালি জাতির স্বার্থে তাঁর ত্যাগী ভূমিকার কথা জেনে মুজিবকে তাঁদের মনোভাবের কথা জানাতে উদগ্রীব ছিলেন এবং মুজিবের করাচি আগমনের অপেক্ষা করছিলেন।'

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিভিন্ন সময় আলাপের কথা উল্লেখ করে বিধান সেন জানান, সেনা সদস্যদের এই মনোভাবটা জানতে পেরে শেখ মুজিব তাঁদেরকে নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগী শক্তি হিসেবে দেখছিলেন এবং এই শক্তিকে তাঁর মুক্তি আন্দোলনের সাথে সম্মিলনের চেষ্টা করছিলেন। করাচিতে শেখ মুজিবের সঙ্গে সেনা সদস্যদের গোপন বৈঠকে মুজিব তাঁদেরকে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বার্থে যেকোনো আন্দোলনে সমর্থন সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং এ ব্যাপারে ছাত্রদেরও দায়িত্ব দেবেন বলে জানান। বিক্ষুব্ধ এই সৈনিক গ্রুপের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রয়োজনে সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা ও দাবি জাগিয়ে তোলার সুদূর প্রসারী লক্ষ্য নিয়েই 'স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস' গঠন করা হয় বলে স্পষ্টতাই ধারণা করা যায়। ছাত্র-জনতাকে সংগঠিত করে আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার যে পরিকল্পনা বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করেন সৈনিকদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তাতে নতুন মাত্রা যোগ হয়।

পরে সৈনিকদের ঢাকা ও চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বদলির পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ৬৪'র শেষ দিক থেকে শুরু করে (সৈনিক গ্রুপের একাধিক সদস্যের মতে ৬২ সাল থেকে) ৬৬ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সাথে সৈনিক গ্রুপের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও করাচিতে একাধিকবার বৈঠক হয়। এসব বৈঠকে এক একটি পর্যায়ে রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, মানিক চৌধুরীসহ কতিপয় বেসামরিক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট হন। এ ছাড়া তাঁদের (সৈনিক গ্রুপের) সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নিযুক্ত বেসামরিক প্রতিনিধিদের অনেক বৈঠক হয় বিভিন্ন স্থানে। বিধান সেন বলেন, 'দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশেষ করে স্বৈরাচারী আইউব সরকারের অব্যাহত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার যে কোনো পর্যায়ে শেখ মুজিবের গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই তিনি তাঁর অবর্তমানে অর্থাৎ জেলে থাকাকালে তিনি, সেনা সদস্য ও বেগম মুজিবের সঙ্গে পৃথকভাবে লিয়াঁজো রক্ষার জন্য ভূপতিভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী), ডা. ছৈয়দুর রহমান ও আমাকে মনোনীত করেন। তিনি মানিক চৌধুরীকে প্রথমে বিষয়টি অবহিত করেন। পরে ডা. ছৈয়দুর ও আমাকে এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় দলের ভেতরে বাইরে। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি শেখ মুজিবের কড়া নির্দেশ ছিল যাতে কোথাও কেউ লিখিত কোনো প্রমাণপত্র না রাখেন।

যেখানে যেখানে গোপন বৈঠক

অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট বাঙালি সিপাইরা প্রথম দিকে সেনানিবাস ও নৌবাহিনী মেসসহ তাঁদের নিজস্ব গন্ডির মধ্যে সাংগঠনিক কাজগুলো চালাতে থাকেন। পরে ঢাকা ও চট্টগ্রামে

কয়েকটি বাড়ি ঠিক করা হয় যেখানে গোপন প্রক্রিয়ায় জড়িতদের কেউ কেউ বসে কাজের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। বিভিন্ন সময় যে সব বাড়িতে বৈঠক হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ঢাকার বঙ্গবন্ধুর বাড়ি, তাজউদ্দিন আহমদের বাড়ি, গেন্ডারিয়ার দ্বীননাথ সেন রোডের একটি বাড়ি ও আজিমপুরের সিটি নামে একটি বাড়ির কথা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে। চট্টগ্রামে আমার ৩১ মিরেন্ডা লেনের বাসা, এনায়েত বাজারের ডা. ছৈয়দুর রহমানের আউটার হাউস, রামজয় মহাজন লেনের মানিক চৌধুরী বাসা/অফিস, রহমতগঞ্জস্থ বর্তমান বাংলা কলেজের কাছের শম্ভু চৌধুরীর বাড়ি, লাভ লেইনের নেভাল এভেনিউস্থ লে. ক. মোয়াজ্জেমের বাসা, হোটেল মিসকা এবং সদরঘাটের হোটেল শাহাজাহানে বিভিন্ন সময় গ্রুপ ভিত্তিক বৈঠক হয়েছে। কয়েকটি বৈঠকে শেখ মুজিব নিজে উপস্থিত থাকলেও অধিকাংশ বৈঠকে দায়িত্বপ্রাপ্তরা যোগ দিতেন।'

বেগম মুজিব সব জানতেন

বিধান সেন জানান, 'বেসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি সম্পর্কে বেগম মুজিবেরও অনেক কিছু জানা ছিল। বঙ্গবন্ধু একবার গ্রেপ্তার হবার পর নির্দেশ দেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন খবরাখবর বেগম মুজিবকে জানানো যাবে এবং তিনি মুজিবের নির্দেশাবলী মানিক চৌধুরীদের মাধ্যমে অন্যদের জানবেন। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িতদের মধ্যে রুহুল কুদ্দুস, খান শামসুর রহমান, আহমদ ফজলুর রহমানসহ কতিপয় সরকারি আমলাও ছিলেন। অবশ্য আগরতলা মামলার সব আসামি কিংবা এ প্রক্রিয়ায় যুক্তদের সবাই পরিকল্পনার প্রকৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত জানতেন না। তবে বঙ্গবন্ধুর কথাবার্তা ও কার্যক্রমে সবাই বুঝতেন যে, তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) মূল ধ্যান ধারণা ছিল সকল প্রগতিশীল স্বাধীনচেতা শক্তিগুলোর সম্মিলন ঘটিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি করা। এ পর্যায়ে সরকারের পক্ষ থেকে সশস্ত্রভাবে বাধাবিঘ্ন এলে সশস্ত্র উপায়েই তা মোকাবেলা করে দেশকে স্বাধীন করা। এসব আন্দোলনকে রাজপথে সম্প্রসারণের মূল চালিকা শক্তি ছিল স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ।

স্বাধীনতার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সম্ভাব্য সাহায্য সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল। তাই বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময় ভারতের সাথে যোগাযোগ করেন ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত ও চিত্তরঞ্জন সূতার প্রমুখের মাধ্যমে। ভারতের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, আমাদের পূর্ব বাংলায় সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে তাদের আকাশপথ বন্ধ করে দিতে হবে এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে অস্ত্রশস্ত্রসহ সব ধরনের সহযোগিতা দিতে হবে। কথা ছিল সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ হবার পর একটি দিন ধার্য হবে, যেদিন বিভিন্ন সেনানিবাসের অস্ত্রভাণ্ডার দখল করে, কারাগারের সকল বন্দীকে মুক্তি দিয়ে সেখানে পাক সেনাদের বন্দী করা হবে এবং শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সাহায্য চাওয়া হবে।

পুরো বিষয়টি এগিয়ে নেওয়া ছিল সময় সাপেক্ষ। এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধু তাঁর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সবচেয়ে বড় কৌশল চালিয়ে দেন ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণার মাধ্যমে। ছয় দফা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করছিল, পাশাপাশি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামোও বিস্তৃত হচ্ছিল দেশব্যাপী। এমন অবস্থায় সেনাবাহিনীর যে অংশটি বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনার সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করছিল তাঁদের কয়েক জনের নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয় আর্থিক লেনদেনের হিসেব নিকেশ নিয়ে। বিশেষ করে সাবেক করপোরাল আমির হোসেনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠে। তিনি সরকারের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করছেন বলেও কারো কারো সন্দেহ জাগে। এ পর্যায়ে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতায় সন্দিগ্ধ হয়ে বিপ্লবী পরিষদ খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হন যে, করপোরাল আমির ইতিমধ্যে অনেক গোপন তথ্য সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাকে জানিয়ে দিয়েছে। দলনেতা মোয়াজ্জেম আমির হোসেনকে হত্যার নির্দেশ দিলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত সৈনিকের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে সে নির্দেশ কার্যকর হয়নি। ৬৭'র শেষ দিকে আমির হোসেন পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার সদর দপ্তরে গিয়ে সবকিছু ফাঁস করে দেয়।

এই ঘটনার পর বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় জড়িতদের কেউ কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণতি সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন। কেউ কেউ মনে করেন এসব করে আর হয়তো তেমন লাভবান হওয়া যবে না। কেউ কেউ বিপদ থেকে বাঁচার জন্য তথ্য ফাঁস করে দিয়ে কর্তৃপক্ষের আস্থাভাজন হয়ে লাভবান হওয়াটাকে ভাল মনে করেন।

ইতিমধ্যে এই গোপন প্রক্রিয়ায় জড়িতদের কেউ কেউ সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে হয়ে কাজ করছেন বলে মনে করা হয়। ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির পরিণতিতে আগরতলা মামলার উদ্ভব হয় বলে ধারণা করা হয়। এই মামলার কারণে বিপর্যয় নেমে আসে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের ওপর, সাথে সাথে সেই সব বাঙালি সেনা ও বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তাসহ বঙ্গবন্ধুর সহযোগীদের ওপর– যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করার মতো প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন।'

বেগম মুজিব বললেন, 'সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েই উঠবেন'

সুবেদার আবদুর রাজ্জাক



পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়াই করে দেশ স্বাধীন করার জন্য গোপন বিপ্লবী তৎপরতায় জড়িতদের মধ্যে অন্যতম অভিযুক্ত জ্যেষ্ঠ সদস্য সুবেদার (অব.) আবদুর রাজ্জাক (১৪ নং আসামি)। বাবার নাম সিতু সরকার। ১৯২১ সালে চাঁদপুর জেলার মতলব (উত্তর) থানার চরকাশিম গ্রামে (মামলায় বরোষার চর লেখা হয়েছে) তাঁর জন্ম। এন্ট্রাস (ম্যাট্রিক) পাস করার পর ১৯৪১ সালে তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে প্রায় ২২ বছর পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকরি করেন এবং পশ্চিমা সেনা কর্মকর্তাদের দ্বারা বিভিন্ন সময় নানারকম অবিচার ও অবমাননাকর ব্যবহারের শিকার হন। এক পর্যায়ে পাকিস্তানিদের বিতাড়নের বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় যোগ দিয়ে সংগঠনে সমমনা সদস্য বাড়ানো তথা সাংগঠনিক তৎপরতায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন বলে তাঁর সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে জানা যায়। তিনি সৈনিক থাকাকালে একজন ভাল খেলোয়াড় এবং মুষ্টিযোদ্ধাও ছিলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়, তিনি অল ইন্ডিয়া আর্মিটিমের মূল দলের ফুটবলার, সেনাবাহিনীর হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা এবং একজন ভাল হকি খেলোয়াড় ছিলেন।

সুবেদার (অব.) আবদুর রাজ্জাক ২০০৪ সালের ১৫ আগস্ট নিজ গ্রামে মারা যান। তাই বিস্তারিত জানার জন্য তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ২০০৯ সালের ২০ জানুয়ারি তাঁর স্ত্রী রিজিয়া বেগম (৬৫) এবং ছেলে এসএম তরিকুল ইসলাম যথাক্রমে স্বামী ও বাবার কাছ থেকে শোনা স্মৃতিকথার উদ্ধৃতি দিয়ে জানান বেশ কিছু তথ্য। তবে দীর্ঘদিনের পুরোনো শোনা কথার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে ঘটনাবলির সুনির্দিষ্ট তারিখ বা সময়কাল তাঁরা বলতে পারেননি। জানা যাক আবদুর রাজ্জাক তাঁর স্ত্রী সন্তানদের কী জানিয়েছেন।

বিপ্লবী তৎপরতায় অংশগ্রহণ

আবদুর রাজ্জাক পাকিস্তান আমলে তাঁর চাকরি জীবনের ২২ বছরের মধ্যে (৪৭-৬৯)

প্রায় দশ বছর কাটিয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তানে। ষাটের দশকের শুরুর দিকে তিনি জানতে পারেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সেনাদের সহায়তায় বিপ্লবের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের ক্ষমতা থেকে তাড়ানোর জন্য বঙ্গবন্ধু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত বাঙালি নৌ, সেনা ও বিমান বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, সাধারণ সৈনিক এবং বেসামরিক প্রশাসনের কিছু লোক যে পরস্পর যোগাযোগের মাধ্যমে সংগঠিত হতে থাকেন তাতে সুবেদার রাজ্জাকও যুক্ত হন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত থাকাকালে সুবেদার আবদুর রাজ্জাক কয়েকটি হোটেলসহ অজ্ঞাত স্থানে বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আয়োজিত বেশ কিছু বৈঠকে যোগ দেন। এক পর্যায়ে পূর্ব বাংলায় বদলি হয়ে এসে তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রংপুর সেনানিবাসে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। ওই সময় তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকায় তাঁর বাসা এবং ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর বাসাসহ বিভিন্ন গোপন স্থানে বেশ কয়েকটি সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং যখন যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে বিপ্লব সফল করার জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু এবং বেগম ফজিলতুন্নেসা মুজিবের উপস্থিতিতে কয়েকটি বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন বলে তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের কাছে স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন।

ছেলে তরিকুল ইসলাম তাঁর বাবার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'একদিন বঙ্গবন্ধুর বাসায় এক বৈঠকে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তানিদের জুলুম অত্যাচার থেকে বাঙালি জাতিকে বাঁচানোর উপায় এবং সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নিয়ে নানা আলোচনার সময় উপস্থিত অনেকের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা শেষ হবার উপক্রম হয়। এ সময় বেগম ফজিলতুননেছা মুজিব দরজায় এসে উচ্চকণ্ঠে বলেন, 'সিদ্ধান্ত ছাড়া কোনো সভা মুলতবী হবে না। সবাই বসুন, সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তারপর উঠবেন।'

সুবেদার রাজ্জাক তাঁর কর্মস্থলে থাকার সময় কৌশলে বুঝিয়ে বেশ কিছু সমমনা লোককে বিপ্লবী দলের সদস্য হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যেকোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু ৬৭ সালের দিকে দলের কোনো একজন সদস্যের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সমস্ত পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। রাজ্জাক ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে রংপুর সেনানিবাস থেকে ছুটি নিয়ে যশোরের নিজ বাড়িতে (ষাটের দশক থেকে পরিবার নিয়ে যশোরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন) অবস্থান করছিলেন। ছুটিতে আসার সাত দিন পর যশোর সেনানিবাস থেকে একজন সেনাসদস্য এসে তাঁকে (রাজ্জাককে) জরুরিভিত্তিতে ঢাকা সেনানিবাসে তলব করা হয়েছে বলে খবর দেন। কিন্তু ঢাকা সেনানিবাসে যাওয়ার পরই সেখানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন। পরে ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় অন্য আসামিদের সঙ্গে তিনিও মুক্তি পান।

মুক্তিযুদ্ধে রাজ্জাক

১৯৭১ সালে সুবেদার (অব.) আবদুর রাজ্জাক মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে যান। পরে ৮নং সেক্টরের অধীনে কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শাশার পুটখালী, ঝিকরগাছা ও চৌগাছাসহ কয়েকটি এলাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন। স্বাধীনতার পর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ছয় মাস চাকরি করার পর কয়েকবছর সেনানিবাসের ঠিকাদার হিসেবে কাজ করেন।

তোমাদেরও লাথি মেরে তাড়ানো হবে

সার্জেন্ট জহুরুল হক



বাংলাদেশকে পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ সাহসী সৈনিক সার্জেন্ট জহুরুল হক। আগরতলা মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ফাঁসির হুমকি মাথায় নিয়েও তিনি স্বাধীনতার ব্যাপারে অবিচল ছিলেন এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে সব ঘটনা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু জীবন বিপন্নের পাশাপাশি ভবিষ্যতে স্বাধীনতার সংগ্রামের অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত হবার আশঙ্কার ব্যাপারে আইনজীবী, বঙ্গবন্ধু ও অন্য সহকর্মীদের যুক্তি মেনে নিয়ে তিনি ক্ষান্ত হন।

নোয়াখালীর সুধারামপুর থানার সোনাপুর গ্রামের বাসিন্দা কাজী মুজিবুল হকের ছেলে সার্জেন্ট জহুরুল হক আগরতলা মামলার ১৭ নং আসামি। তিনি ছিলেন করাচিতে বিমান বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষক। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসে আটক অবস্থায় টয়লেটে যাবার সময় একজন পাকিস্তানি নিরাপত্তা রক্ষী তাঁকে সামনাসামনি গুলি করে হত্যা করে।

ব্রিগেডিয়ার (অব.) খুরশিদ উদ্দিনের কাছে জানা যায়, সার্জেন্ট জহুর ও সার্জেন্ট ফজলুল হক ছিলেন কমান্ডো গ্রুপের সদস্য। কারাগার এলাকায় আসা ভিক্ষুক ও স্থানীয় চাকরদের ওপর পাকিস্তানিদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করতেন তাঁরা। এতে তাঁরা পাকিস্তানিদের রোষানলে পড়েন। এবিএম সামাদ জানান, পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা কর্ণেল মন্‌জুর এক বাঙালি ভিক্ষুক ছেলের পেটে লাথি মেরে ফটকের বাইরে পাঠিয়ে দেন। এতে উত্তেজিত হয়ে সার্জেন্ট জহুর ওই কর্ণেলকে বলেছিলেন, 'আজ যে ছেলেটাকে তুমি লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছ, সেরকম তোমাদেরও একদিন বাংলাদেশ থেকে লাথি মেরে তাড়ানো হবে।' এই ঘটনার পরদিন তাঁকে হত্যা করা হয়। মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য বেয়নেট চার্জ করা হয় তাঁর শরীরে। পরে তিনি সিএমএইচে মারা যান। তাঁর মৃত্যু সংবাদ অল্পক্ষণের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজপথের আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু ও অন্য বন্দীদের মুক্তির দাবিতে স্লোগান সমাবেশ

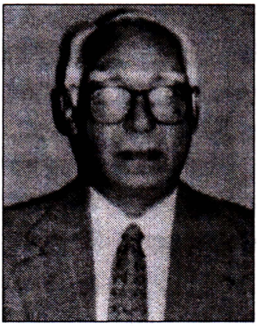
মুখর হয়ে ওঠে বাংলাদেশের মানুষ। বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। আদালত ১০ মার্চ পর্যন্ত মামলার শুনানি স্থগিত রাখে। তবে তার আগে অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার মামলা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়।

তিনি এবং সার্জেন্ট জলিল একই বেসের হওয়ায় এবং জলিলের বাসা একাধিক গোপন বৈঠক ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সুবাদে জহুরুল হক সম্পর্কে অনেক কিছুই জানার কথা ফ্লাইট সার্জেন্ট (অব.) জলিলের। তিনি বলেন, 'মনে হয়েছিল সাংগঠনিক তৎপরতার এক পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে সার্জেন্ট জহুর আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু আসল ঘটনা হল তিনি অনেক আগে থেকেই এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন যা আমি জানতাম না, জানতেন মফিজুল্লাহ। এতে বোঝা যায় এক একজন সদস্য আর একজন সদস্যের কাছে পরিচয় প্রকাশের আগে কী রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। তবে সার্জেন্ট জহুর দৃশ্যত আমাদের দলভুক্ত হওয়ার আগে আমাদেরকে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় (রিফ্রেশার ট্রেনিং) তাঁর কিছু কর্মকাণ্ড আমার নজরে আসে। যেমন প্রশিক্ষণ চলতো বিকেলে অফিস সময়ের পর। অনেকেই চাইতেন কীভাবে প্রশিক্ষণ এড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরা যায়। কিন্তু সার্জেন্ট জহুর অবাঙালিদের ছুটি দিলেও বাঙালিদের দিতেন না। আমাদের সঙ্গে খোলামেলা হওয়ার পরই তাঁর কাছ থেকে জানা যায়, তিনি মনে করতেন, প্রত্যেক বাঙালিকেই অস্ত্র পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে যাতে ডাক এলেই তাঁরা ঠিকমতো কাজ করতে পারেন।

সার্জেন্ট জহুরের দায়িত্ব ছিল গোপন দলে অন্তর্ভুক্তদের 'হ্যান্ড গ্রেনেড' চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়ার। এ জন্য এমন এক বাসা খোঁজা হচ্ছিল যা গুপ্তচরদের দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকবে। শেষে আমার বাসাটাই প্রশিক্ষণের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের নাম পরিবর্তন করে 'সার্জেন্ট জহুরুল হক হল' নামকরণ করা হয়েছে। ঢাকায় সার্জেন্ট জহুরের স্মৃতি রক্ষায় গঠিত 'শহীদ সার্জেন্ট জহুর স্মৃতি সংসদ' প্রতিবছর তাঁর স্মরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

আইউবের চালটা ভুল ছিল

খান এম শামসুর রহমান



আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত সরকারের পদস্থ আমলাদের মধ্যে একমাত্র জীবিত সদস্য ১৯ নং আসামি সিএসপি অফিসার খান এম শামসুর রহমান। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মুখ্যমন্ত্রী (যুক্তফ্রন্ট আমলে), তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সরকারের প্রধান মন্ত্রী (১৯৮৫-৮৬) খান আতাউর রহমানের ছোট ভাই তিনি। বাবার নাম ইমতিয়াজ উদ্দিন খান। ১৯২৭ সালের ৭ এপ্রিল ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার বালিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। খান শামসুর রহমান নিজ বাড়িতে প্রাথমিক শিক্ষা নেওয়ার পর ঢাকার নবকুমার ইন্সটিটিউট থেকে ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক, ৪৪ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমান ঢাকা কলেজ) থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, ৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স এবং ৪৮ সালে এমএ পাশ করেন। শামসুর রহমান জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই তৎকালীন ছাত্র ও যুবনেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একজন প্রতিবাদী দৃঢ়চেতা ব্যক্তি হিসেবে শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব তাঁকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে।

শামসুর রহমান ছাত্রাবস্থায় বামপন্থী ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫১ সালে তিনি সিএসপি অফিসার হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবে সহকারী কমিশনার পদে যোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় মহকুমা প্রশাসক (এসডিও), জেলা প্রশাসক (ডিস্ট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেড) উপসচিব ও যুগ্ম সচিব পদে চাকরি করেন। ষাঠের দশকের স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত অন্যদের সঙ্গে তাঁর 'দু-একটি' বৈঠক হলেও এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর একটি বিশেষ সম্পর্কের বিষয় তিনি জানলেও তিনি নিজে বড় কোনো ভূমিকা রেখেছেন বলে মনে করেন না। আগরতলা মামলায় গ্রেপ্তারের আগে তিনি ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় 'ইন্দোনেশিয়া-পাকিস্তান ইকোনোমিক্যাল কালচারাল অর্গানাইজেশন' এর উপ-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেখান থেকে ৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁকে একটি বিভাগীয় সভায় যোগ দেওয়ার কথা বলে

করাচিতে ডেকে এনে গ্রেপ্তার করা হয়। করাচিতে কয়েকদিন জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাঁকে নিয়ে আসা হয় ঢাকায়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁকে রাশিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন। ১৯৭৫ থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি ভারত ও ইতালীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। খান শামসুর রহমানকে প্রথমে চাপ দেওয়া হয় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি তাতে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত আসামি হিসেবে তাঁর নাম চার্জশিটভুক্ত করা হয়। ২০০৮ সালের ৩ নভেম্বর বিকেল পাঁচটায় তাঁর ধানমন্ডির ৮নং সড়কের বাড়ি 'বাতায়ন' এ বসে দেওয়া সাক্ষাতকারে এসব কথা বলেন তিনি।

স্বাধীনতার জন্য একটি গোপন বিপ্লবী আন্দোলন প্রক্রিয়া এবং এতে নিজের ও বঙ্গবন্ধুর জড়িত থাকার ব্যাপারে জানতে চাইলে খান শামসুর রহমান বলেন, 'পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প কিছু দিন পর থেকেই বাঙালিদের প্রতি পশ্চিমা শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে বিভিন্ন স্তরের বাঙালিদের মধ্যে হতাশার জন্ম নেয়। আমরা নিজেরাও বিভিন্ন ঘনিষ্ঠজনের সঙ্গে বসলে আলাপচারিতায় বলাবলি করতাম ওদের সঙ্গে (পাকিস্তানের সঙ্গে) আর থাকা যায় না। একটা কিছু উপায় বের করতে হবে। কিন্তু প্রকাশ্যে এ জাতীয় কথা বলার সাহস তখন ছিল না কারও। শেখ মুজিবের কথাবার্তায় বোঝা যেত তাঁর ভেতরেও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কাজ করে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে শুনতে পাই, পশ্চিম পাকিস্তানে নৌ ও বিমান বাহিনীতে কর্মরত কিছু বাঙালি সদস্যের মধ্যে অসন্তোষ চলছে। তাঁরাও কিছু একটা করার কথা ভাবছে। কমান্ডার মোয়াজেমের নেতৃত্বে একটা গ্রুপ সংগঠিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্পৃক্ততা ছাড়া কোনো রকম গোপন বা প্রকাশ্য বিপ্লবী প্রক্রিয়া সফল হতে পারে না। তাই তাঁরা মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সাহায্য চান। শেখ মুজিবও তাঁদের সঙ্গে ঠিক সময়ে যোগ দেওয়া ও প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দেন। তবে'এ সম্পর্কে শেখ সাহেব আমাকে বিস্তারিত কিছু বলেননি।'

অপরিপক্কতা ও অনভিজ্ঞতার ছাপ

খান শামসুর রহমান জানান, বঙ্গবন্ধু ও বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকলেও তিনি ওই বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন না। প্রয়োজন হলে প্রশাসনকে কাজে লাগানো এবং বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনসহ খুটিনাটি বিষয়ে পরামর্শ বিনিময় করতেন। বললেন, 'হয়তো বয়সের কারণে অনেক কথা মনেও নেই।' স্মৃতি হাতরে তিনি বলেন, 'পুরোনো বন্ধুত্বের সূত্রে শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রশাসনের ভেতর চলমান নানা বিষয়ে আলাপ হতো। লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমের সঙ্গে পরিচয় ও বৈঠক হয় ১৯৬৬ সালের শেষ দিকে বিমান বাহিনীর রমিজের পাঁচলাইশস্থ বাসায়। সেখানে কমান্ডার মোয়াজ্জেম তাঁদের পরিকল্পনার কথা বলেন। মোয়াজ্জেম জানান, শেখ মুজিব তাঁদের কাজের প্রশংসা করেছেন এবং কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন। মোয়াজ্জেম তাঁদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে আলাপ করার জন্য আমাকে ভারতে যাওয়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু আমি এটা সময়োচিত এবং

যথার্থ বলে মনে করিনি।' শামসুর রহমান বলেন, 'আমার কাছে মনে হয়েছে কাজটিতে যথেষ্ট পরিপক্কতা ও অনভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। প্রথম দিকে আমি এটাকে ছেলেমি মনে করেছি। আমি না যাওয়ায় তাঁরা আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিবকে আগরতলা পাঠান। কিন্তু তাঁরা দুজনই নিজ নিজ এবং প্রতিপক্ষের ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁরা কথা বলেছেন একজন ভারতীয় লে. কর্নেল ও মেজরের সঙ্গে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি সাধারণ অস্ত্র বের করতেও সর্বোচ্চ পর্যায় অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর অনুমতি প্রয়োজন ছিল। সেই পর্যন্ত পৌঁছাতে প্রয়োজন ছিল উভয় দেশের আরও অনেক উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সম্পৃক্ততা। কিন্তু যে সময়ে যেভাবে তাঁরা এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন সে সময়টি এবং প্রস্তুতিতে ছিল অপরিপক্কতা ও অনভিজ্ঞতার ছাপ।'

ভাসানীর চাইতে বিপদজ্জনক শেখ মুজিব

বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে নিজের পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করে খান শামসুর রহমান বলেন, "শেখ মুজিব আমাকে এ ব্যাপারে সরাসরি কোনো কথা বলেননি। তাঁর কথায় আমার মনে হয়েছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে তিনি নানাভাবে কাজ করেছেন। আর এ লক্ষে যাঁরা যেখানে ভাবছেন বলে শুনেছেন সেখানে গিয়ে তাঁদেরকে তিনি উৎসাহিত করেছেন। একটা সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছেন যাতে প্রয়োজনে ডাক দিলে প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গা থেকে কাজ করতে পারে। শেখ মুজিবের যে নেতৃত্বগুণ ও মানুষকে উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা ছিল সেটা আইউব খানকে ভীত ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। কারণ দেখা গেছে, মাওলানা ভাসানী জনপ্রিয় নেতা এবং তৎকালীন আওয়ামী লীগের সভাপতি হলেও তাঁকে প্রভাবিত করে চালাতে পারতেন শেখ মুজিব। আমার বড় ভাই খান আতাউর রহমান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা বা মূখ্যমন্ত্রীর মতো পদে থাকলেও তাঁকেও বিপদজ্জনক মনে করতেন না আইউব খান। কিন্তু শেখ মুজিব সেই সময় থেকেই আইউব খানের কাছে ভাসানী বা অন্যদের চাইতে ক্ষমতাশালী ও বিপদজ্জনক মনে হয়েছে। তাই বিক্ষুব্ধ সেনা সদস্যদের সাথে যোগাযোগ এবং তাঁদেরকে সহযোগিতা দিয়ে উদ্দীপ্ত করার বিষয়টিকে কাজে লাগিয়ে আইউব শেখকে আগরতলা মামলার প্রধান আসামি করে তিনি ও তাঁর দলকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন বাঙালিদের ভেতরের জাগরণী শক্তিকে। আমার এক পরিচিত পাঞ্জাবি সেনা কর্মকর্তাও মামলা চলাকালে আমাকে বলেছিলেন, 'আইউব খানের মনে শেখের ব্যাপারে ভীতি আছে। তাই তিনি শেখকে শেষ করে দিয়ে মানুষের মন থেকে আন্দোলনের স্পৃহা মুছে দিতে চেয়েছেন।"

শামসুর রহমানের মতে, 'আইউবের চালটা ভুল ছিল। জনগণের মনে শেখ মুজিবের সম্পর্কে আস্থা এত গভীর ছিল যে, তাঁরা পুরো মামলার বিষয়বস্তু এবং এতে শেখ মুজিবের জড়িত থাকার কথা অবিশ্বাস করেছে। বরং এই মামলায় কিছু লোক গ্রেপ্তার ও নির্যাতন ভোগ করলেও পরবর্তীতে এই ঘটনা স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্য সাধনে বড় ধরণের সহায়ক

হয়েছে। আগে যে স্বাধীনতার কথা মানুষ প্রকাশ্যে বলার সাহস পেত না, এই মামলায় শেখ মুজিব ও অন্য আসামিরা খালাস পাওয়ার পরে পাকিস্তানের বিরোধিতা তথা স্বাধীনতা অর্জনের দাবিটা সরাসরি তোলার সাহস জন্মে বাঙালিদের মনে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবন বাজি রেখে সাহস করে সবার যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়াটাই এর বড় প্রমাণ।'

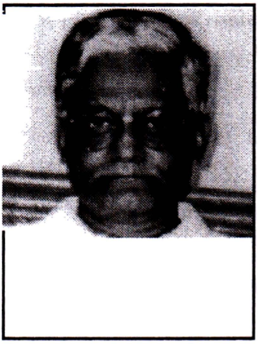
'পাকিস্তান আর এক থাকবে না'

'শেখ মুজিব আদৌ স্বাধীনতা চান নি' কারও কারও এমন অভিমত সম্পর্কে খান শামসুর রহমান বলেন, 'এটা ভুল ধারণা। ভাল করে না জেনেই কিংবা রাজনৈতিক কারণে কেউ কেউ এরকম মন্তব্য করে থাকতে পারেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করার সময় থেকেই আমি তাঁকে চিনি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক বছর জুনিয়র হলেও বয়সে আমার চাইতে সাত বছরের বড়। কলকাতা ইসলামীয়া কলেজে থাকতেই তিনি নেতা হন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। আমার এক বন্ধু (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি আবদুর রহমান) কলকাতা থেকে আসা তরুণ নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। আমার বড় ভাই খান আতাউর রহমানের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রেও তিনি আমাদের বাসায় প্রায় আসতেন। তাঁর সঙ্গে মিশে আমি জেনেছি, তিনি দেশকে খুবই ভালবাসতেন। আগরতলা মামলায় বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার পরও তাঁর ভেতর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বজায় ছিল তার প্রমাণ আমি নিজেই পেয়েছি।'

খান শামসুর রহমান উদাহরণ টেনে বলেন, "১৯৬৯ সালের শেষ দিকে একদিন আমি এবং আমার এক বন্ধু লেবু মিয়া বঙ্গবন্ধুর বাসায় যাই। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি তো আমার পার্টিতে এলে না, কিন্তু আমার কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত ছাড়া পাবে না। তুমি আমার প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান হবে।' লেবু মিয়া বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চাইলেন, 'সে কেন্দ্রীয় সরকারের না প্রাদেশিক সরকারের?' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'দূর বেটা, পাকিস্তান তো আর এক থাকবে না। তো প্রাদেশিক সরকারের হবে কেন? কেন্দ্রীয় সরকারের কমিশনের চেয়ারম্যান হবে'। তাঁর এমন কথাবার্তায় কোনো সন্দেহ থাকে না যে তিনি স্বাধীনতা চেয়েছেন এবং সে লক্ষ্যেই যখন যে রকম দরকার সে রকম কৌশলে এগিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে ছাড়েননি। স্বাধীনতার পর আমাকে প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান না করলেও রাষ্ট্রদূত বানিয়ে ছেড়েছেন।"

কর্ণেল (অব.) মোস্তাফিজও নির্যাতন করেছিলেন

মাহফুজুল বারী



কথিত আগরতলা মামলার ২২ নং আসামি মাহফুজুল বারী পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগ দেন ১৯৫৯ **সালের মাঝামাঝি** সময়ে। প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পর করাচির স্কুল অব এরোনটিকস থেকে বিমানের যন্ত্রপাতি (ইন্সট্রুমেন্ট) বিভাগে তিন বছর লেখাপড়া শেষ করে করাচিতে আইউব খানের ভাইস কাউন্ট ডিভিশনে যোগ দেন। করাচিতে অবস্থানকালে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচার-আচরণ দেখে ওই রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর অনাস্থা এসে যায়।

১৯৬২ সালের শেষ দিকে তিনি দুই মাসের ছুটিতে চট্টগ্রাম আসেন। ওই সময় কোনো একদিন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের এক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। এতে শেখ মুজিব পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যের যে চিত্র তুলে ধরেন তা মাহফুজুল বারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি মনে করেন এতে তাঁর অন্তরে গুঞ্জরিত কথারই প্রতিধ্বনি ঘটেছে। ওই বক্তৃতা শুনেই তিনি শেখ মুজিবের নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

মাহফুজুল বারী স্বাধীনতার পর আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের উপ-প্রধান হন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পরবর্তী পরিস্থিতিতে তিনি কানাডা চলে যান। ২০০৯ সালে মাঝামাঝি সময়ে তাঁর ছোট ভাই চট্টগ্রামের বিশিষ্ট চিকিৎসক এমএম বারীর মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য জানতে চাই। ওই বছরের শেষ দিকেই তিনি চট্টগ্রাম আসেন। মাসখানেক পর ২০১০ সালে ১৫ জানুয়ারি এমএম বারীর রহমতগঞ্জস্থ বাসভবনে বসে এ লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মাহফুজ জানান বিপ্লবী সংগঠনে যোগদানের প্রেক্ষাপটসহ বিস্তারিত।

তাঁর বক্তব্যের সার কথা : 'পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মস্থলে থাকার সময় দেখি সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত বাঙালি চাকরিজীবীদের প্রতি দুর্ব্যবহার, লাঞ্ছনা, সামান্য কারণে চাকরিচ্যুতি এবং পদোন্নতি বৈষম্যের ঘটনা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আমরা জানতে পারি কেন্দ্রীয় সরকারে সচিব পর্যায়ে একজন বাঙালিও ছিলেন না। বিদেশের ১২৬টি দূতাবাসে বাঙালি রাষ্ট্রদূত

নিয়োগ পেয়েছিলেন মাত্র একজন। সহকর্মী-বন্ধুমহলে আলোচনা হতো কীভাবে এসব অত্যাচার ও বৈষম্য থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ১৯৬৫ সালের ৪ জানুয়ারি তৎকালীন বঙ্গশার্দুল শেখ মুজিবুর রহমান করাচি আসছেন জানতে পেরে বিমান বন্দরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি আমার বিমান বাহিনীর দুই বন্ধু সদস্য হাবিবুর রহমান এবং বেলায়েত হোসেনকে নিয়ে। সেখানে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একান্ত আলাপের জন্য পরে আমরা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বড় মেয়ে আখতার সোলায়মানের বাসভবন লাকামা হাউসে যাই। আমাদের ওপর পাকিস্তানিদের শোষণ-বঞ্চনার কথা শুনে শেখ সাহেব বললেন, 'দেশের প্রতিনিধি হয়ে যাঁরা আসেন তাঁরা পাকিস্তানি শিল্পপতিদের টাকার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কাজেই অত্যাচার-বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হলে সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার।' সেদিন তাঁর কথাবার্তায় দেশপ্রেমের যে পরিচয় পাই তাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিমূলক তৎপরতায় যুক্ত হতে সাহস ও অণুপ্রেরণা পাই।

ইতিমধ্যে সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পর্ক হয় বিমান বাহিনীর করপোরাল্ সিরাজুল ইসলাম, সার্জেন্ট আবদুল জলিল, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজ উল্লাহ, সার্জেন্ট জহুরুল হক, নৌবাহিনীর লে. মতিউর রহমান, কমান্ডার আবদুর রউফ, টেক্সটাইল কোম্পানির ব্যবস্থাপক মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে। লে. মতিউর রহমান এবং সার্জেন্ট জলিলের বাসায় বিভিন্ন সময় আলোচনায় দেশকে স্বাধীন করার ব্যাপারে আমরা একমত হই। পরে জানতে পারি লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে এ ব্যাপারে কার্যক্রম আগেই শুরু হয়েছে এবং এতে জনগণের পক্ষে নেতা হিসেবে বঙ্গশার্দুল শেখ মুজিবুর রহমান সব রকম সাহায্য করবেন। ইতিমধ্যে মাওলানা ভাসানী, মশিউর রহমান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, মশিউর রহমান, সবুর খান, ফরিদ আহমদ, ইউসুফ আলী প্রমুখ নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাঁরা কেউ আমাদের এ কাজে সহযোগিতা করতে রাজি হননি।

এরমধ্যে নৌ, বিমান এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিশ্বস্ত লোকজন নিয়ে পৃথক দল সৃষ্টি করেন। আমি নিজে আমাদের একজন সদস্যের মাধ্যমে তখনকার মৌরিপুর (করাচি) বিমান বাহিনীর রেকর্ড কার্যালয় থেকে ব্যক্তিগত ফাইল সরিয়ে ফেলি যাতে অন্য কোথাও বদলি না হয়ে করাচিতে থেকেই সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে পারি। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে, দেশ স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের কথা সবাই জানলেও এর বাস্তবায়নের কৌশল সবার পুরোপুরি জানা ছিল না।

দুঃখের বিষয়, বিমান বাহিনীর বাঙালি সদস্য **করপোরাল** আমীর হোসেন সব পরিকল্পনা ফাঁস করে দিলে আমাদের ওপর দুর্যোগ নেমে আসে। শেখ সাহেবসহ আমাদের নামে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের হয়।

গ্রেপ্তার ও নির্যাতন

পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন মাহফুজুল বারী। তারপর চোখের পানি মুচতে মুচতে বলেন, 'বিপ্লবী কর্মকান্ডে জড়িতদের ধরপাকড় শুরু হলে অন্যদের মতো আমাকেও করাচি থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে আসা হয়। এরপর শুরু করা হয় অমানুষিক নির্যাতন। আমার আত্মীয়-স্বজন জানতো না আমি কোথায় আছি, জীবিত না মৃত। টর্চার সেলে নিয়ে পা বেঁধে উপুড় করে ঝুলিয়ে পায়ের তালুতে পেটানো, গুহ্যদ্বারে বরফ ঢোকানো, কক্ষে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে ঘুমোতে না দেওয়াসহ নানা রকম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয় আমার ওপর।

মামলা শুরু হওয়ার পর নির্যাতন বন্ধ এবং আসামিদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের কিঞ্চিৎ সুযোগ মেলে। বিচার চলাকালে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের নেতা মানিক চৌধুরী খ্যাত ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ও বিধান কৃষ্ণ সেনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। অবস্থা দেখে এবং জিজ্ঞাসা করে বুঝলাম আমাদের অনেকের তুলনায় মানিক চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন, বিধান সেন ও স্টুয়ার্ড মুজিবের ওপর নির্যাতনের মাত্রা ছিল সীমাহীন।'

কর্ণেল (অব.) মোস্তাফিজ প্রসঙ্গ

আগরতলা মামলার কথিত আসামিদের ওপর জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতনকারী পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের কথা বলতে গিয়ে কর্ণেল (অব.) মোস্তাফিজুর রহমানের (৯১ সালে ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী) ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন মাহফুজুল বারী। বলেন, 'তিনি একমাত্র বাঙালি সেনা কর্মকর্তা যিনি আগরতলা মামলায় বন্দী অবস্থায় আমাদের জেরা এবং শারীরিক নির্যাতনকারীদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। মন্ত্রীত্ব পাওয়ার সম্ভবত এটাই ছিল তাঁর যোগ্যতা।'

মাহফুজুল বারী জানান, মামলা চলাকালে বঙ্গবন্ধুর বড় মেয়ে শেখ হাসিনার স্বামী এম ওয়াজেদ মিয়া তৎকালীন ডাকসু নেতা তোফায়েল আহমদকে নিয়ে আত্মীয় পরিচয়ে কারাগারে এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা বঙ্গবন্ধুসহ আসামিদের মুক্তির আন্দোলন পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপে তাঁর পরিকল্পনার একটা বিশেষ দিক আমি বুঝতে পেরেছিলাম-সেটা হলো তিনি যাঁরা অস্ত্র ধরার পক্ষে তাঁদেরকে অস্ত্রের মাধ্যমে এবং যাঁরা রাজপথের আন্দোলনে আগ্রহী তাঁদেরকে সেভাবে স্বাধীনতার জন্য তৈরি হতে উৎসাহিত করেছিলেন।

এদিকে আগরতলা মামলাকে ভিত্তিহীন ও ষড়যন্ত্রমূলক আখ্যায়িত করে রাজপথে ছাত্র-জনতার আন্দোলন শুরু হয়। এরমধ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হলে আন্দোলন আরো তীব্র হয়। অবশেষে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার বিনা শর্তে মামলা প্রত্যাহার করলে সবাই মুক্ত হন। সারা দেশে বয়ে আয় আনন্দের বন্যা।

মুক্তি পাওয়ার পর চট্টগ্রাম থেকে অভিযুক্তদের মধ্যে তিনি (মাহফুজ), মানিক চৌধুরী ও বিধান সেনকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

মুক্তিযুদ্ধে মাহফুজ

১৯৭১ সালে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ শুরুর অল্প কিছুদিন পর মাহফুজ ভারত চলে যান যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বলেন, "৬৯ এর গণ-আন্দোলনের পর আমাদের বিপ্লবী কর্মকান্ড স্থগিত হলেও পাকিস্তানিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য যুদ্ধ যে একটা হবে সেটা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। মনে পড়ে, ৭০ এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পর বঙ্গবন্ধু ত্রাণ বিতরণের জন্য হাতিয়া এসেছিলেন। আমি সেখানে সমন্বয়ের কাজ করছিলাম। আমার এখনো কানে বাজে, বঙ্গবন্ধু সেদিন আমার হাতে এক টাকার দুইশটি নোটের একটি বান্ডিল দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, 'তোরা তৈরি থাকিস। সময়মতো দেশ স্বাধীন করবো। তোরা তোদের কাজ চালিয়ে যাবি।'

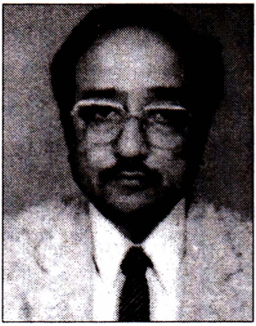
যুদ্ধ চলাকালে আমি প্রথমে সাবরুমে গিয়ে আতাউর রহমান খান কায়সার ও জহুর আহমদ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করি। পরে ত্রিপুরার উদয়পুরে ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিংয়ের অধীনে থেকে মেজর রফিক ও খালেদ মোশাররফের এক ও দুই নম্বর সেক্টরের সমর্থনে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা কাজে নিয়োজিত হই। এই কাজে সাবেক সিংয়ের কার্যালয়ে গিয়ে সেখানে একদিন হঠাৎ দেখি মানিক চৌধুরী। আমি তাঁকে উচ্ছসিত হয়ে সম্বোধন করি ফাইন্যান্স মিনিস্টার হিসেবে। কারণ পাকিস্তান আমলে আমাদের সশস্ত্র প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ড চালাতে যে অর্থ খরচ হতো তার অন্যতম উৎস ছিলেন তিনি। কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বললেন, 'দেশ স্বাধীন হবে। বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে বের হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন। কিন্তু জাতির শত্রুরা হয়তো অচিরেই তাঁর ওপর আঘাত হানবে।' প্রায় একই কথা বলেছিলেন জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক চট্টগ্রামের মরসরাইয়ের নিজাম উদ্দিন।"

মাহফুজ বলেন, 'আমার জানামতে, একাত্তরে গ্রেপ্তার হবার আগেই বঙ্গবন্ধু মানিক চৌধুরী এবং বরিশালের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য চিত্তরঞ্জন সূতারকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন ভারতে অবস্থান নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজ করার জন্য। সে সময় দক্ষিণ কলকাতার একটি বাড়িও ভাড়া করা হয় দাপ্তরিক কাজের জন্য। এরকম পূর্ব প্রস্তুতি না থাকলে ভারতের মাটিতে থেকে তাদের সাহায্য না নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ চালানো এবং দেশ স্বাধীন করা এতো সহজ ছিল না। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু আমাকে বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উপ-প্রধান নিযুক্ত করেন।'

মাহফুজুল বারীর পৈত্রিক বাড়ি নোয়াখালী জেলার রামগতি হাটের চরলক্ষ্মী গ্রামে। তাঁর বাবা এ কে মোমাজ্জাদ ছিলেন সাব-রেজিস্ট্রার। থাকতেন চট্টগ্রামের জয়নগর এলাকায়। আতাউর রহমান খান কায়সার, ড. মুহাম্মদ ইউনূস, বেলাল বেগ প্রমুখ ছিলেন তাঁর সহপাঠী। ছাত্র জীবনে প্রগতিশীল ছাত্র-রাজনীতির সমর্থক ছিলেন। ১৯৫৬-৫৮ শিক্ষাবর্ষে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ৫৯ সালে তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগ দেন।

জেলাখানায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার চেষ্টা

কর্নেল (অব.) শামসুল আলম



'ছোটকাল থেকেই ব্রিটিশকে তাড়ানোর জন্য সূর্যসেন প্রীতিলতা প্রমুখের সংগ্রামী কাহিনী পড়তাম এবং এরকম একটা স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বাদ গ্রহণের জন্য উদগ্রীব ছিলাম। ৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এলে বিপুল জনসমাগম হয়। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য অন্যদের মতো আমি এবং খুরশিদ উদ্দিন রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে চরম হতাশ হই। তাঁর 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' এমন বক্তব্য শুনে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন জ্বলে উঠে। সেদিন ক্ষোভে সঙ্গে সঙ্গে সভা থেকে চলে আসি। সেই থেকে পরবর্তী বিভিন্ন সময় তাঁদের বিমাতাসুলভ আচরণ দেখে আমি পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ি। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই– যে করেই হোক পাকিস্তানিদের এদেশ থেকে তাড়াতে হবে।'

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্রোহের মতো কঠিন সংগ্রামের ঝুঁকি নেওয়ার প্রেক্ষাপট এভাবেই বর্ণনা করলেন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল, আগরতলা মামলার ২৪নং আসামি মুক্তিযোদ্ধা ডা. শামসুল আলম। শামসুল আলমের আদি বাড়ি রংপুর জেলায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে তাঁর বাবা ড. শামসুদ্দোহা কলকাতায় মারা যাওয়ার পর থেকে পুরোনো ঢাকার লালবাগ এলাকার নানার বাড়ি খাজে দেওয়ান-এ থেকে বড় হয়েছেন তিনি।

শামসুল আলম ১৯৪৮ সালে ঢাকার আরমানিটোলা উচ্চবিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ৫০ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আইএসসি এবং ৫৭ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন। দেশের জন্য কিছু করার সংকল্প নিয়ে তিনি ১৯৫৯ সালে সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরে যোগ দেন ক্যাপ্টেন পদে। এরপর পশ্চিম পাকিস্তানের আবোটাবাদে সামরিক প্রশিক্ষণ ও করাচিতে পেশাগত প্রশিক্ষণ শেষে রাওয়ালপিন্ডির মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কোয়েটা এবং পেশোয়ারের নওশেরায় দায়িত্ব পালন করেন। মামলার ৩৪ নং আসামি ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. খুরশিদ উদ্দিন শামসুল আলমের মেডিকেল কলেজের শিক্ষাজীবনের বন্ধু। ১৯৬২-৬৩ সালে ডা. খুরশিদের মাধ্যমে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমের সঙ্গে করাচিতে প্রথম পরিচয় হয় শামসুল আলমের। তবে স্বাধীন বাংলা

প্রতিষ্ঠার গোপন প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত হন ৬৫ সাল থেকে। ২০০৯ সালের ৪ জানুয়ারি রাত আটটায় তাঁর গুলশান বারিধারায় অবস্থিত বাসায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন বিস্তারিত।

কুমিল্লা সেনানিবাসে সদস্য সংগ্রহ

সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর থেকে পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণের নানাদিক, বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের পটভূমি বর্ণনা করেছেন তিনি এভাবে: "চাকরিতে যোগ দেওয়ার অল্প কদিনের মধ্যে দেখি পাঞ্জাবিরা বাঙালিদের প্রতি যখন তখন, অমানবিক-অবমাননাকর আচরণ করছে। নিয়ম ছিল মেসে কেউ এমন কথা বলবে না বা ব্যবহার করবে না যাতে অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে। একদিন আমি ও আমার এক সহকর্মী চক্ষু বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন (পরে কর্নেল) সালাম বাংলায় আলাপ করছিলাম। অন্যদিকে দুজন পাঞ্জাবি অফিসার তাদের ভাষায় কথা বলছিলেন। তারা হঠাৎ আমাদের তীরস্কারের সুরে বললেন, 'মেসে কী ভাষায় কথা বলতে হয় জান না!' আমি বললাম, 'তোমরা যে ভাষায় বলছো সেটা কোন ভাষা? তোমাদের পাঞ্জাবি ভাষা নিশ্চয়ই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা নয়।' তখন তারা চুপ হয়ে যান। কিন্তু এভাবে কটাক্ষমূলক কথায় পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ ও স্নায়ুযুদ্ধ বাড়তে থাকে। ৬২-৬৩ সালে আমি পেশোয়ারের নওশেরায় কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম। সে সময় একদিন ছুটি নিয়ে করাচিতে ক্যাপ্টেন খুরশিদের বাসায় যাই। উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের জায়গায় পরিবেশ যাচাই করা।

খুরশিদ আমাকে এক বাসায় বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় নিয়ে যায়। সেখানে কথায় কথায় পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং বাঙালিদের মধ্যে যে ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে এসব বিষয় উঠে আসে। তাঁদের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা না বললেও মনে হয়েছে তাঁরা কিছু একটা করার চিন্তা করছেন এবং এ ব্যাপারে আমাকে যাচাই করে দেখছেন। ৬৪ সালে আমি বদলি হয়ে ঢাকায় আসি। ৬৫ সালের শেষ দিকে রিক্রুটিং মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিয়োগ পেয়ে পরিবারসহ কুমিল্লা সেনানিবাসে অবস্থান করি। সে সময় একদিন খুরশিদ চিঠি দিয়ে আমাকে জানায় লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম আসবেন, আমি যেন তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করি।

ইতিমধ্যে মোয়াজ্জেম বাংলাদেশে এসে চট্টগ্রামে যোগ দিয়ে আমাকে ফোন করে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুরোধ করেন। আমি বিভিন্ন জায়গায় রিক্রুটিং ট্যুরে যেতাম। সে হিসেবে চট্টগ্রামেও চিটাগাং স্যুটিং ক্লাবে (রাইফেল ক্লাব) গেলে মোয়াজ্জেম সেখানে আসেন। কিন্তু সেখানে কথা বলা নিরাপদ হবে না ভেবে আমার এক আত্মীয়ের (সড়ক ও জনপথ বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ারিং মশিউর রহমান) বাসায় গিয়ে কথা বলি। ওই সময় তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বলেন, 'এই পরিকল্পনার সাথে সিএসপি অফিসার রুহুল কুদ্দুস, আহমদ ফজলুর রহমান, খুরশিদসহ অনেকে

আছেন। করাচিতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা হয়েছে। তবে তিনি (বঙ্গবন্ধু) বলেছেন, তিনি যেহেতু সংসদীয় রাজনীতি করেন, তাই সরাসরি জড়িত থাকতে পারবেন না। তবে আমাদের কাজে তাঁর সব রকম সমর্থন সহযোগিতা থাকবে।' সব কথা শুনে আমি স্বাধীনতার লক্ষ্যে কাজ করতে সম্মত হই। বঙ্গবন্ধু কীভাবে, কি কি সাহায্য করেছেন সে ব্যাপারে আমি তেমন কিছু না জানলেও খুরশিদ এবং আমার আর এক বন্ধু কামাল বলেছিলেন যে তিনি (বঙ্গবন্ধু) অর্থসহ নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করছেন। আমারও মনে হয়েছে বঙ্গবন্ধু না থাকলে রুহুল কুদ্দুস, আহমদ ফজলুর রহমান, শামসুর রহমান- এঁরা জড়িত হতেন না।

মোয়াজ্জেমের সঙ্গে পরামর্শক্রমে আমি কুমিল্লা সেনানিবাসে সমমনাদের সাথে আলাপ করে সমর্থক সংগ্রহের কাজ শুরু করি। প্রথমে ক্যাপ্টেন শওকত আলীর সঙ্গে কথা বলি এবং দুজনেই একই লক্ষ্যে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিই। শওকতের মাধ্যমে অর্ডিন্যান্স এর আলীম ভূঁইয়া (রাজশাহী), আমার মাধ্যমে ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) মোতালেবসহ আরও কয়েকজন আমাদের সদস্য হয়। জুনিয়র একজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলে মনে হলো, তাঁর সঙ্গে মোয়াজ্জেমের আগে থেকে যোগাযোগ ছিল। সেও তার মতো কিছু লোক সংগ্রহ করে। ওই সময় মাহবুবুর রহমানকেও (পরে সেনা প্রধান) আগ্রহী দেখা যায়। আমাদের গ্রুপে প্রধানত আমি, শওকত, মোতালেব ও আলীম ভূঁইয়া ছিলাম প্রধান। এক পর্যায়ে দেখি নূরুজ্জামান এবং নাজমুল হুদাও এ তৎপরতায় যুক্ত হয়েছেন। তাঁরা দাউদকান্দিতে এলে আমরা এদিক থেকে গিয়ে আলাপ করতাম। আমার বাসায়ও কয়েকটা বৈঠক হয়েছে। মোয়াজ্জেম, স্টুয়ার্ড মুজিব, এবি খুরশিদ এরাও কয়েকবার এসেছে। রমিজের মোহাম্মদপুরের বাসায় একটা বৈঠকে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে খান শামসুর রহমানও ছিলেন। ওই বৈঠকে আমরা কোনো সিনিয়র অফিসার বিশেষ করে ওসমানী সাহেবের মতো যোগ্য ব্যক্তিকে এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে রাখার প্রস্তাব করি।

এভাবে অত্যন্ত গোপনে সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে আমাদের সদস্য ও সমর্থক বাড়ানোর চেষ্টা চলছিল। কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগেই আমাদের পরিকল্পনার কথা ফাঁস হয়ে যায়।"

যেভাবে গ্রেপ্তার হলেন

ঘটনা ফাঁস হওয়ার পর গ্রেপ্তার ও মামলায় জড়ানোর অভিজ্ঞতার কথা জানান কর্নেল (অব.) শামসুল আলম। বলেন, "ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান ছিলেন গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এর সঙ্গে যুক্ত। তিনি সেখান থেকে কিছু গোপনীয় খবরাখবর নিতে পারতেন। ৬৭ সালের কোনো একসময় কর্নেল জামিল অথবা ব্রিগেডিয়ার রউফ এদের কেউ নূরুজ্জামানের মাধ্যমে এই বলে খবর পাঠান যে, 'তোমাদেরই কেউ গোপন তৎপরতার খবর ফাঁস করে দিয়েছে। কাজেই তোমরা কিছুদিনের জন্য চুপ হয়ে যাও। আপাতত কোনো সভা করো না।' এতে আমরা বেশ সাবধান হয়ে যাই। সদস্যদের কেউ 'কী খবর, কাজ কেমন

এগোচ্ছে' এ জাতীয় প্রশ্ন করতেই কৌশলগত কারণে না শোনার ভান করে মুখ ফিরিয়ে নিই। কিন্তু মোয়াজ্জেম সাহেব এসব ভালভাবে না নিয়ে নিজের মতো করে চলতে লাগলেন। এরমধ্যে একদিন ঢাকা মেডিকেলে আমার মেয়ের জন্মের পর আমি তাকে দেখতে গেলে সেখান থেকে খুরশিদ আমাকে মোয়াজ্জেমের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর ভায়রার ধানমন্ডি ২নং সড়কের বাসায় নিয়ে যায়। সেখানে মোয়াজ্জেমের কথাবার্তায় মনে হলো তিনি কিছুটা উচ্চাভিলাষ পোষণ করেন।

এর অল্পদিন পর আমি স্বাস্থ্যের ওপর প্রশিক্ষণ নিতে রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়ার জন্য মনোনীত হই। যাওয়ার কয়েকদিন আগে ৬৭ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা এসে আমার শ্বাশুরের শান্তি নগরের বাসায় উঠি। একদিন সকালে এক মেজর এসে বললেন, 'আপনি নাকি আমেরিকা যাচ্ছেন কোর্স করতে, আমি আমার এক আত্মীয়ের জন্য কিছু জিনিস পাঠাতে চাই।' আমি আমেরিকা নয়-পিণ্ডি যাওয়ার কথা বললে তিনি 'সরি' বলে চলে যান। প্রসঙ্গত ইতিমধ্যে আমি মেজর পদে উন্নীত হয়েছি। এদিকে পিণ্ডিতে গিয়ে খবর পাই, মোয়াজ্জেম ও কামাল উদ্দিন গ্রেপ্তার হয়েছেন। ৬৮ সালের ৬ অথবা ৭ জানুয়ারি আমি কোর্স শেষ করে বাসায় এসে বিশ্রাম নেওয়ার সময় একজন মেজর এসে আমাকে কোনো এক অজ্ঞাত মেসে নিয়ে যায়। সেখান থেকে নেওয়া হয় ইন্টারোগেশন সেলে। ওই সেলে ছিল অত্যন্ত ভীতিকর পরিবেশ– যা দেখে ভয়ে যে কারো গা শিউরে ওঠার কথা। আমার এক খালু ছিলেন পদস্থ সেনা কর্মকর্তা। আমাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন না করলেও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য। এর আগে দেশে থাকতে কোথায়, কখন, কার কার সঙ্গে বৈঠক হয়েছে, কী ধরনের পরিকল্পনা আমাদের ছিল, এমনকি হাসপাতালে মেয়েকে দেখতে গিয়ে সেখান থেকে যে মোয়াজ্জেমের কাছে গিয়েছি সবই তারা বলে দিচ্ছিল জিজ্ঞাসাবাদের সময়। এরপর নানা রকম ভয়ভীতি দেখিয়ে পিণ্ডির এক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে তাঁদের মতো তৈরি একটি জবানবন্দিতে সই দিতে বলা হয়। আমি জানতাম এরকম জোর করে নেওয়া জবানবন্দির তেমন মূল্য বিচারিক আদালতে নেই। তাই সই দিয়ে দিই। সপ্তাহখানেক পর আমি এবং শওকত (অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল, পরে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার) কে একই বিমানে ঢাকা নিয়ে আসা হয়। তবে কারো সঙ্গে কেউ কথা বলিনি। ঢাকায় এনে প্রথমে সেনানিবাসের একটি কক্ষে বন্দি করে রাখা হয় আমাকে। পরে দেখি পাশের কক্ষে খুরশিদ। কয়েকদিন পরই জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি ঢাকা থেকে রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়ার আগে আমার শ্বশুর বাড়িতে আমেরিকায় জিনিস পাঠানোর নাম করে যে ভদ্রলোক গিয়েছিলেন তিনি বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত সিপাইর কাছে জানা গেল তিনি গোয়েন্দা বিভাগের এক বাঙালি সদস্য। কিছুদিন পর আমাকে পাঞ্জাবি মেসে এবং আরো পরে বঙ্গবন্ধুর কক্ষে স্থানান্তর করা হয়।"

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বন্দি জীবন

বন্দি জীবনের স্মৃতিচারণ করে কর্নেল (অব.) শামসুল আলম বলেন, "আমার কক্ষ ছিল

নিম্নমানের। কাপড়-চোপড় বিছানা– সবই ছিল সাধারণ ও নোংড়া। বঙ্গবন্ধুর কক্ষ ছিল মোটামুটি উন্নত। সোফা-চেয়ারের ব্যবস্থাও ছিল সেখানে। এই প্রথম আমি বঙ্গবন্ধুকে সামনাসামনি দেখি এবং তাঁর আচরণে মুগ্ধ হই। তিনি আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি তো জেলখানায় নতুন এসেছেন, কাপড়-চোপড়ও ময়লা। আমাকে তো প্রায় সময় আসতে হয়। তাই সব তৈরি থাকে।' তিনি একটি ট্যাংক দেখিয়ে বলেন, 'ওই ট্যাংকে বিছানার চাদর, লুঙ্গি সবই ধোয়া আছে, নিয়ে আপনারগুলো বদলে ফেলুন।' অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি আমাকে অতি আপনজনের মতো আপনি থেকে তুমি, তারপর তুমি থেকে তুই সম্বোধন করতে শুরু করেন। আমাকে খুবই স্নেহ করতেন তিনি। সেখানে আমি দেখেছি তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বগুণ। পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগের (আইএসআইপি) প্রধান প্রায় এসে ওনাকে বোঝাতেন স্বীকারোক্তির ব্যাপারে রাজি হওয়ার জন্য। বঙ্গবন্ধু সকালে যখন হাঁটতেন তখন তাঁকে বোঝানোর জন্য আইএসআই প্রধান তাঁর পেছনে পেছনে এমনভাবে হাঁটতেন যেন জমিদারের পেছনে পেছনে পেয়াদা যায় মাথা নিচু করে। পাকিস্তানের তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী সাহাবুদ্দিন এসেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য লাহোর যাওয়ার প্রস্তাব দিতে। মনে হলো কিছু আওয়ামী লীগ নেতাও এ ব্যাপারে তাঁকে বুঝিয়ে নিমরাজি করিয়েছিলেন। কিন্তু একদিন সকালে তাঁর স্ত্রী (বেগম মুজিব) এসে বললেন, 'তুমি নাকি প্যারোলে যাচ্ছ আলোচনার জন্য। তা করলে ছাত্রজনতাকে নিয়ে আমি তোমার বিরুদ্ধে রাস্তায় নামব।' তখনই বঙ্গবন্ধু সরাসরি বলে দেন, 'না আমি প্যারোলে যাব না। মামলা তুলে নিয়ে সবাইকে মুক্তি দিলে তারপরই আমি আলোচনায় যাব।'

বঙ্গবন্ধুর প্রিয় ছিল 'ধনে ধানে পুষ্পে ভরা, আমাদেরই বসুন্ধরা' গানটি। গানটি গেয়ে শোনানোর জন্য তিনি আমাকে প্রায় বলতেন। আমি আগে থেকেই সংস্কৃতিমনা ছিলাম। মাঝে মাঝে গানটি গেয়ে শোনাতাম তাঁকে। এক সময় জেলখানা এলাকায় বাইরের লোকজনের যাতায়াতে একটু শিথিলতা এলে আমার আত্মীয়দের দিয়ে একটি টেপ রেকর্ডার আনাই। পরে সেটিতে গানটি বাজিয়ে তাঁকে শোনাতাম ”

জেলখানায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার চক্রান্ত

আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিতে ঝোলানো সম্ভব হবে না-পাকিস্তানিরা সম্ভবত এটা মামলা চলাকালে রাজপথের আন্দোলন দেখে বুঝতে পেরেছিল। আর তাই তাঁকে সেখানে কৌশলে হত্যার চক্রান্ত করেছিল তারা। আজাদ কাশ্মীরের অধিবাসী এক তরুণ নিরাপত্তা কর্মকর্তার আগাম হুঁশিয়ারি পেয়ে বঙ্গবন্ধু সতর্ক হয়ে গেলে সে চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর সেই সময়ের বন্দি জীবনের সঙ্গী শামসুল আলম বললেন সেই চক্রান্তের কথা: "সার্জেন্ট জহুরকে যেমন তুচ্ছ অজুহাত তুলে হত্যা করা হয়েছে সেরকম বঙ্গবন্ধুকে পালানোর চেষ্টার অজুহাতে গুলি করে হত্যার একটি চক্রান্ত হয়েছিল। তাঁকে অনেক সময় একা হাঁটতে দেওয়া হতো। আমাদের থাকার যে মেস তার পাশে দেয়াল এবং তারপরে

ছিল ছোট্ট একটি রাস্তা। কিছু বেসামরিক লোকজনও ওই পথ দিয়ে অনেক সময় চলাচল করতো। বঙ্গবন্ধু অনেক সময় ওই পথ পর্যন্ত হেঁটে আসতেন। সার্জেন্ট জহুরকে হত্যার আগে একদিন নিরাপত্তা কর্মকর্তাটি এসে বঙ্গবন্ধুকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'স্যার আপনি হাঁটতে গেলে মেসের পাশের ওই দেয়ালের বাইরে যাবেন না, খারাপ খবর আছে।' পরদিন দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপত্তা কর্মীরা বঙ্গবন্ধুকে অন্যদিনের মতো হাঁটার জন্য নিতে এলে তিনি কৌশলে এড়িয়ে যান। ওরা বিশেষভাবে অনুরোধ জানালে বঙ্গবন্ধু তাদের বললেন, 'দেখো, ওইদিক দিয়ে এখন সিভিলিয়ানরাও যাওয়া আসা করছে। ওরা আমাকে চিনে ফেলবে এবং কথা বলতে চাইবে। কাজেই ভেতরেই হাঁটাহাঁটি করি।'
সতর্ককারী তরুণ নিরাপত্তা কর্মকর্তাটি বঙ্গবন্ধুকে খুবই ভালবেসে ফেলেছিলেন এবং সম্মান করতেন। তিনি শহরের দিকে গেলে আমাদের জন্য মাঝে মাঝে পাউরুটি-কাবাব নিয়ে আসতেন। বঙ্গবন্ধুকে সতর্ক করার দুএকদিন পর এসে তিনি বিদায় জানিয়ে বললেন, ছুটিতে যাচ্ছেন। পরে খবর এল লোকটি মারা গেছেন। আমরা অবাক হলাম। নতুন নিযুক্ত এক নিরাপত্তা কর্মী জানায়, রাইফেল থেকে মিস ফায়ারে ওই অফিসারটি মারা গেছেন। তবে আমাদের ধারণা, চক্রান্তকারীরা হয়তো বুঝতে পেরেছিল, উনিই বঙ্গবন্ধুকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাই কৌশলে তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে।"

মুক্তির সুসংবাদ

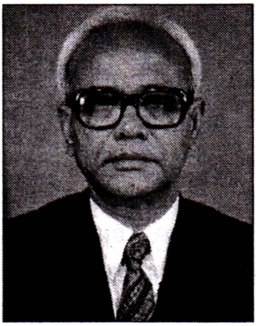
কর্নেল (অব.) শামসুল আলমের কাছ থেকে জানা যায়, মামলা প্রত্যাহার এবং ২২ ফেব্রুয়ারি যে সবাই মুক্তি পাচ্ছেন সে কথা বঙ্গবন্ধু ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে জানতে পারেন। ওইদিন কয়েকজন কর্মকর্তা এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলেন। পরে তিনি তাঁদের সঙ্গে বের হয়ে যান। যাওয়ার সময় শামসুল আলমকে বলে যান, 'আমি একটা মিটিংয়ে যাচ্ছি। সম্ভবত মামলা উঠে যাবে। তুই আমার জামাটা স্ত্রী করে রাখিস।' কয়েক ঘণ্টা পর রাতেই তিনি ফিরে এসে বহু প্রতিক্ষীত মুক্তির সুসংবাদটা দেন শামসুল আলমকে।
সেই আনন্দঘন সময়টার স্মৃতি হাতরে শামসুল আলম বললেন, "বঙ্গবন্ধু যাওয়ার পর মনটা অস্থির হয়ে উঠছিল। কিন্তু রাতেই ফিরে আসায় উৎকণ্ঠা কেটে যায়। এসেই তিনি বললেন, 'সব ঠিক হয়ে গেছে। মামলা উঠে যাবে। আমাকে খুব সকালেই নিয়ে যাবে এখান থেকে। কারণ বাইরে ব্যাপক লোকসমাগম হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। তাই সবাইকে আমি বলতে পারব না। তুই সকালে সবাইকে বলে দিস।' বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আসা সেনা কৌসুলি এবং আমাকে তিনি অভিনন্দিত করলেন। খুব সকালেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর কথামতো আমি অন্যদের মুক্তির সুসংবাদটা জানিয়ে দিই। মুক্তির ব্যাপারে আইনি প্রক্রিয়াগুলো সারতে একটু সময় লাগে। অবশেষে ওইদিন অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি দুপুরে ১৩-১৪ মাসের বন্দি জীবনের অবসান ঘটলে সংশ্লিষ্ট সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।"

বিশ্বাসের প্রতিফলন একাত্তরে

শামসুল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নেন সক্রিয়ভাবে। বললেন, 'আমাদের বিশ্বাস ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই দেশ স্বাধীন হবে। শেষ পর্যন্ত একাত্তরে এসে তাই হয়েছে। সেই যুদ্ধেও নিজেকে যুক্ত রাখতে পেরেছি এটাও একটা সান্ত্বনা।' এভাবেই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা শামসুল আলম জানান, মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে নির্মমভাবে হত্যা করে পাকিস্তানি সেনারা। তাঁর বড় ভাই চট্টগ্রাম টিঅ্যান্ডটির কর্মকর্তা শামসুজ্জামানকে এপ্রিলেই একটি সভায় যোগ দিতে নেওয়ার কথা বলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। স্ত্রীর বড় বোনের স্বামী চট্টগ্রাম বন্দরের একজন কর্মকর্তা কাজী গোলাম আনসারী সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের বিরোধিতা করছিলেন বলে তাঁকে হত্যা করে পাকসেনারা। খালাতো বোনের স্বামী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক মুকতাদিরকে অন্তঃসত্তা স্ত্রীর সামনে গুলি করে মেরে চারতলা থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়। এসব বেদনাদায়ক ঘটনায় শামসুল আলমের মা-সহ সবাই ছিলেন দিশেহারা অবস্থায়। সবকিছু সামলে যুদ্ধে যেতে তাঁর কিছুটা দেরি হয়ে যায়। আগস্ট মাসে তিনি ২নং সেক্টরে গিয়ে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে শরিক হন। সেখান থেকে তাঁকে পাঠানো হয় আগরতলা। সেখানে মেডিকেল সার্ভিস বিভাগের সহকারী পরিচালক হিসেবে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ শরণার্থীদের চিকিৎসা সেবায় দায়িত্ব পালন করেন। পরে কলকাতা সদর দপ্তরে বদলি হন। স্বাধীনতার পর তাঁকে '৬৯ থেকে মুক্তিযুদ্ধ সময়কালের আর্থিক সুবিধা বাদ দিয়ে সিনিয়রিটি বজায় রেখে সেনাবাহিনীর চাকরিতে বহাল রাখা হয়। পরে কর্নেল পদে পদোন্নতি পান। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর থেকে সেনাবাহিনীতে অস্থির পরিবেশ দেখা দেয়। এতে এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে '৭৬ এর এপ্রিলে অবসর নেন শামসুল আলম।

সিদ্ধান্ত ছিল সব কিছুই গোপন থাকবে

কর্নেল (অব.) শওকত আলী



আগরতলা মামলার ২৬ নং আসামি বিপ্লবী দলের অন্যতম সদস্য কর্নেল (অব.) শওকত আলী মিয়া ১৯৫৮ সালে বি কম পরীক্ষা দিয়েই পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ৫৯ সালের ২৪ জানুয়ারি কমিশন পান এবং সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হন। চাকরি জীবনের প্রথম ও শেষ দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সেনানিবাসে এবং ৬৩ সাল থেকে ৬৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) বিভিন্ন সেনানিবাসে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার গোপন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হন এবং ১৯৬৮ সালের ১০ জানুয়ারি করাচিতে গ্রেপ্তার হন। সে সময় তিনি করাচির কাছে মালির সেনানিবাস এলাকায় ক্যাপ্টেন পদমর্যাদায় অর্ডিন্যান্স স্কুলের প্রশিক্ষক ছিলেন। এর দু-এক মাসের মধ্যে তাঁর মেজর হিসেবে পদোন্নতির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ৬৯ এর জুনে স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত অন্যদের সঙ্গে তাঁকেও অবসর দেওয়া হয়।

শওকত আলীর জন্ম ১৯৩৭ সালের ২৭ জানুয়ারি শরীয়তপুর জেলাধীন নড়িয়া উপজেলার লোনসিং গ্রামে। বাবা মুন্সি মোবারক আলী ছিলেন ব্যবসায়ী। গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ১৯৫৩ সালে লোনসিং কেপুপাড়া ইংরেজি উচ্চবিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন শওকত আলী। পরে তিনি ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় নিজ এলাকায় মিছিল সংগঠিত করেন। পরে ঢাকায় এসে কায়েদে আজম (পরবর্তীতে সোহরাওয়ার্দী) কলেজের ছাত্র থাকাকালে ওই কলেজে ছাত্রলীগের আহ্বায়ক হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিকম ও এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। আগরতলা মামলা থেকে মুক্তির পর তিনি যশোরের রাজাঘাট এলাকায় একটি কার্পেটিং জুট মিলে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে চাকরি করেন। তিনি ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর পরামর্শে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে থেকে যান এবং পর্যায়ক্রমে কর্নেল হন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর অক্টোবরেই তাঁকে অকাল অবসর দেওয়া হয়। কর্নেল শওকত ১৯৭৭ আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং পর পর পাঁচবার (১৯৭৭,

১৯৯৯, ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০৮ সালে) জাতীয় সংসদের সদস্য এবং ২০০৯ সালের ২৫ জানুয়ারি ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার জন্য গোপন বিপ্লবী কর্মকান্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। ২০০৭ সালের ১০ মার্চ ঢাকার উত্তরার তিন নম্বর সেক্টরে তাঁর বাসভবন 'পালাশী অ্যাপার্টমেন্ট' এ বসে এ লেখককে সাক্ষাৎকার দেন তিনি। কর্নেল (অব.) শওকত আলী পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের সঙ্গে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ, নিজেদের মধ্যে ক্ষোভ, স্বাধীনতার জন্য গোপন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর জানামতে নানান তথ্য দেন এই লেখককে।

বিপ্লবী সংগঠনে যোগদান

গোপন বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়ার পটভূমি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ছাত্রজীবন থেকে আমি তরুণ শেখ মুজিবের নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। তখন থেকেই আমার সব সময় মনে হয়েছে তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সব দিক দিয়ে বিরাট এক বৈষম্য বিরাজ করছে। আমরা যেখানে চাকরি করতাম, সেখানে বাঙালিদের সংখ্যা এত কম ছিল যে, তা ক্ষেত্রবিশেষে চার থেকে ছয় জনের বেশি ছিল না। পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশ বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের এত কম প্রতিনিধিত্ব দেখে আমার মনে নানা প্রশ্ন জাগে। এক জায়গায় বাঙালি-অবাঙালি চাকরি করতে গিয়ে ওদের (পশ্চিমাদের) আচার আচরণে মনে হলো যে, আমরা মাইনরিটি (সংখ্যালঘু) আর ওরা মেজরিটি (সংখ্যাগুরু)। বাংলাভাষার জায়গায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পাঁয়তারা, অর্থনৈতিক শোষণসহ বাঙালিদের দাবিয়ে রাখার নানান অপচেষ্টা আমার মনে রেখাপাত করে। আমার মনে হলো এভাবে পাকিস্তান নামক এক দেশে বাঙালিরা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারবে না। কাজেই দেশকে স্বাধীন করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এরই মধ্যে দেশে বাঙালিদের অধিকার আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলনের নানা পর্যায় আমাকে আরও উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৬৬ সালে তিনি বাঙালির মুক্তি সনদ ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করেন। অন্যদিকে আমরা বাঙালি যাঁরা সশস্ত্র বাহিনীতে ছিলাম তাঁদের অনেকেই ছয় দফার কথা জানতে পেরে এ নিয়ে আলোচনা করি এবং ছয় দফাকে সমর্থন করি। আমাদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক শোষণহীন বাংলাদেশ পাওয়ার সংকল্প দৃঢ় হয়। ইতিমধ্যে স্বাধীনতার যে চেতনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে আমার মনে হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশকে স্বাধীন করা সম্ভব।

এরই মধ্যে অর্থাৎ ১৯৬৬ সালেই আমি জানতে পারি যে, পাকিস্তান নৌবাহিনীতে একটা সংগঠন গড়ে উঠেছে যাঁরা সশস্ত্র উপায়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে কাজ করছেন। ওই সময় আমি কুমিল্লা সেনানিবাসে ক্যাপ্টেন পদে চাকরিতে নিয়োজিত। সেখানে মেজর ডা. শামসুল আলম (মামলার ২০ নং আসামি) নামে আমার এক বন্ধুই (পরবর্তীতে

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্ণেল) মূলত আমাকে ওই বিপ্লবী সংস্থার কথা জানিয়ে বলেন যে, তিনিও ওই সংগঠনের সদস্য হয়েছেন। কালবিলম্ব না করে আমিও তাঁদের সঙ্গে যুক্তি হই এবং কুমিল্লা সেনানিবাসে চাকরিরত অন্য বাঙালি সহকর্মীদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ শুরু করি। ধীরে ধীরে আমাদের সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। তৎকালীন লে. মাহবুবুর রহমান ও (পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লে. জেনারেল ও সেনাবাহিনী প্রধান, আমাদের সদস্য হয়েছিলেন। যদিও তিনি সাক্ষী প্রমাণের অভাবে গ্রেপ্তার বা আসামি হননি।'

কর্ণেল (অব.) শওকত আলী জানান, তাঁর জানামতে বিপ্লবী সংগঠনের সামরিক দিক থেকে মূল সমন্বয়ক ছিলেন লে.কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। রাজনৈতিক নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। কাজের এক পর্যায়ে কমান্ডার মোয়াজ্জেম, স্টুয়ার্ড, মুজিব, সুলতান উদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুল, কমান্ডার রউফ, লে. মতিউর রহমান প্রমুখের সঙ্গে জনাব শওকতের যোগাযোগ ঘটে।

জানতো না বঙ্গবন্ধুর দলও

বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁদের সরাসরি যোগাযোগের সময়কাল সম্পর্কে জনাব শওকত আলী বলেন' 'জানতে পেরেছিলাম ৬৪ সাল থেকে আমাদের নৌবাহিনীর সহকর্মীরাও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি যখন করাচিতে রাজনৈতিক সফরে যেতেন তাঁরা বৈঠক করতেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়েই তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন। তবে বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয় হওয়ায় সবাই কখন, কোথায় কী হচ্ছে সবকিছু জানতেন না। জানার সুযোগও ছিল না। আমাদের মধ্যে যে বৈঠক হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল স্বাধীনতার যে পরিকল্পনা তা বঙ্গবন্ধুর সম্মতিতেই করা হয়েছে এবং যা কিছু হবে বঙ্গবন্ধুর নামে হবে। দেশ স্বাধীন হবে তাঁর নামে। তবে এসব কিছুই গোপন থাকবে। কারণ এটা এমন একটা ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার যা গোপন রাখাটা ছিল জরুরি। আমাদের তৎপরতার বিষয় জানাজানি হলে পরিকল্পনা নিয়ে এগোনোই যেত না। তাই এমনকি বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগকেও তখন বিষয়টি না জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু হয়তো ভাবছিলেন এ নিয়ে দলের ভেতর আলোচনা করলেও তখনকার পরিস্থিতিতে তা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকার আশঙ্কা ছিল। এত গোপনীয়তার মাঝেও আমরা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছি। সমস্ত ঘটনা ফাঁস হয়ে গেল।'

কর্নেল শওকতের মতে, 'যে কোনো বিপ্লবী কর্মকান্ডের চূড়ান্ত সফলতা না আসা পর্যন্ত কৌশলগত কারণে তা গোপন রাখতে হয়। একই কারণে বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণায় 'স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস' বা 'বিপ্লবী পরিষদ' ইত্যাদি নামে পৃথক সংগঠন তৈরি হয়েছিল যা আমরা আগে জানতাম না। এমনকি বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন অধিকাংশ রাজনৈতিক সহকর্মীও জানতেন না তিনি কখন, কোথায় যাচ্ছেন, কী করছেন। আসলে আমি যেটা বুঝেছি, বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা, আর এ জন্য তিনি এক একটা গ্রুপ কিংবা এক একটা সংগঠনকে এক একভাবে সংগঠিত ও উজ্জীবিত করেছিলেন।'

ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ প্রসঙ্গে

ভারতের সঙ্গে আগরতলা ষড়যন্ত্র খ্যাত আসামিদের যোগাযোগ প্রসঙ্গে কর্নেল (অব.) শওকত জানান, 'ভারতের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা ও সূত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছিলেন। সেটা আইউব খানের সামরিক শাসনের প্রথম দিককার ঘটনা। বঙ্গবন্ধু নিজেই আমাদের বলেছিলেন যে, তিনি আগরতলা গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ভারতের ভেতর দিয়ে লাহোর গিয়েছিলেন। তাঁর সেই আগরতলা বা ভারতে যাওয়ার বিষয়টি আমাদের আলোচ্য আগরতলা মামলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। তবে আমাদের বিপ্লবী সংগঠনের পক্ষ থেকে দুজন লোক (আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিব) আগরতলা যান অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য। বঙ্গবন্ধু তখন জেলে। আগরতলা মামলার অভিযোগপত্রের মধ্যেও বিষয়গুলো এসেছে। তবে পরবর্তী সময়ের নানা ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভারতের একটা যোগাযোগ অবশ্যই ছিল, যাতে প্রয়োজনের সময় ভারত আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।'

মুক্তিযুদ্ধে কর্নেল শওকত

কর্নেল (অব.) শওকত আলী মিয়া ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত তিনি যশোরের রাজঘাট এলাকায় ইসলামিয়া সম্প্রদায়ের আগাখানীদের একটি কার্পেটিং জুট মিলে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে চাকরি করতেন। ৬৯ সালে সেনাবাহিনী থেকে চাকরি চলে যাবার পর তিনি ওই জুট মিলে চাকরি নেন এবং পরিবার নিয়ে মিল কম্পাউন্ডে থাকতেন। তিনি জানান, মুক্তিযুদ্ধের জন্য তিনি আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সম্ভাবনা দেখে ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর কাছে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা চান তিনি। বঙ্গবন্ধুর পরামর্শে কর্নেল এমএজি ওসমানীর সঙ্গে দেখা করলে ওসমানী জানান, 'রাজনৈতিকভাবে একটা সমাধান হয়ে যেতে পারে। যুদ্ধের প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না। তবে দরকার হলে খবর দেওয়া হবে।' পরে আগরতলা মামলার অন্য দুই আসামি ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান (পরে ব্রিগেডিয়ার ও রক্ষীবাহিনী প্রধান) এবং ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদার সঙ্গে (পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্নেল ও '৭৫ এর নভেম্বরে নিহত) আলাপ করলে তাঁরাও স্বচ্ছ কোনো ধারণা দিতে পারেন নি। বললেন, 'প্রয়োজনে খবর দেওয়া হবে।' শেষে অনেকটা হতাশ হয়েই তিনি যশোর ফিরে আসেন এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে পাকিস্তানিদের সম্ভাব্য আক্রমণ-হামলা প্রতিরোধের ব্যাপারে প্রাথমিক পরিকল্পনা নেন।

কর্নেল শওকত বলেন, 'আমার নিজস্ব একটা চিন্তা ছিল যুদ্ধ শুরু হলে কি অবস্থায় কী করতে হবে। এ নিয়ে স্থানীয় এমপি শাহ হাদিউজ্জামানসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে একাধিকবার কথাও বলি। আমাদের কাছেই ছিল যশোর সেনানিবাস এবং খুলনায় ছিল পাকিস্তানিদের একটি ব্যাটেলিয়ান। তাও যশোরের

কাছাকাছি। ধারণা ছিল, যশোরের সঙ্গে খুলনার রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া গেলে পাকিস্তানিরা বেকায়দায় পড়বে। সে অনুযায়ী ২৬ মার্চই আমরা জনগণের সহযোগিতায় যশোর ও খুলনার মধ্যকার সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিই। কিন্তু যশোর সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের একদল রেললাইন ও আর একদল সড়ক পথ মেরামত করতে করতে ২৭ মার্চই রাজঘাট এলাকায় চলে আসে। এসেই তারা আমাদের জুটমিল ঘেরাও করে।

এটা ছিল ইসমাইলীয়া সম্প্রদায়ের আগাখানীদের জুট মিল। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন না দেওয়ায় এবং অন্যদিকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার খবরে আমাদের ওপর শ্রমিকদের প্রচণ্ড চাপ ছিল পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি এবং অন্য এক ব্রিটিশ নাগরিক মহাব্যবস্থাপক ২৬ মার্চ দিনভর তদবির করে টাকা যোগাড় করে ২৭ মার্চ শ্রমিকদের পাওনা মেটানোর ব্যবস্থা করি। দুপুরে বাসায় খেতে এসে পাকিস্তানিদের ঘেরাওয়ের খবর পেয়ে আমার স্ত্রীর পরামর্শে সবাইকে ঘরে রেখে আমি কৌশলে চলে যাই কাছে অবস্থিত ভৈরব নদীতে। সেখানে আমাদের জুটমিলের একটি নৌকা বাধা ছিল। ২৬ মার্চই সেটি ঠিক করে রেখেছিলাম অবস্থা বেগতিক দেখলে মাদারীপুরে নিজ এলাকায় চলে যাবার জন্য। তখনও প্রাথমিক ধারণা ছিল-ভারতে গিয়ে নয় বরং দেশের ভেতরে থেকে গেরিলা যুদ্ধ চলবে। নৌকায় উঠে দেখি সেখানেও দুদিক থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা এসে গেছে। পরিবার থাকলে হয়তো ধরা পড়ে যেতাম। কোনো রকমে তাদের নজর এড়িয়ে নৌকায় করে অপর পাড়ে চলে আসি। পরে ওপাড় থেকে আসা অন্য লোকদের মাধ্যমে সৈন্যরা ঘুরে ফিরে চলে গেছে বলে জানতে পেরে আবার আর একটি ছোট নৌকা সংগ্রহ করে বাসায় আসি এবং একই নৌকায় করে স্ত্রী ও ছেলেদের নিয়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। এর আগে বাসায় গিয়ে জানতে পারি, পাকিস্তানি সৈন্যরা আমার খোঁজে বাসায় এসে সবাইকে গালিগালাজ করে এবং ভয়ভীতি দেখায়। তারা ছেলেদের দিয়ে বাসায় লাগানো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা, দেওয়ালে সাঁটা কালো পতাকা ইত্যাদি নামায়। দোতলায় একজন সহকারী ব্যবস্থাপক থাকতেন তাঁকেও মারধর করেছে তারা। যাওয়ার সময় শ্বাসিয়ে যায় বাসা ছেড়ে যেন কেউ না যায়। যা হোক, ওরা চলে যাবার খবর জেনে আমি স্ত্রী-ছেলেদের নিয়ে ভৈরব নদীর অপর পাড়ে আসি। সেখান থেকে আর একটি বড় নৌকা নিয়ে তিনদিন পর শ্বশুর বাড়ি নড়িয়া পৌঁছি। সেখানে স্ত্রী-সন্তানদের রেখে চলে আসি মহকুমা সদর মাদারিপুর। স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ নেতা ও মন্ত্রী) প্রয়াত আবদুর রাজ্জাকসহ স্থানীয় কয়েকজন নেতা-কর্মীর সঙ্গে দেখা হয় সেখানে। আমাকে পেয়ে তাঁরা সবাই খুশি। তাঁরা আমাকে মাদারীপুর মহকুমার কমান্ডার নিয়োগ করেন। আমি মাদারিপুর কলেজে মুক্তিবাহিনীর স্থানীয় সদর দপ্তর স্থাপন করি। সেখানে থেকে অস্ত্র সংগ্রহ, ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, মুক্তিবাহিনীর জন্য সদস্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে। মাদারীপুরের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক (পরবর্তীতে সচিব) সৈয়দ রেজাউল হায়াতসহ পুলিশ ও স্থানীয় জনগণ আমাকে সার্বিক সহযোগিতা দেন। এক পর্যায়ে চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ,

রায়পুর, লক্ষ্মীপুর, বেগমগঞ্জ ফেনী, পরশুরাম হয়ে বেলোনিয়া সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে পৌঁছি। বিএসএফ আমাদের কোনো বাধা দেয়নি। যাওয়ার পথে যেদিন চাঁদপুর পৌঁছি সেদিন পাকিস্তান বিমানবাহিনী চাঁদপুর আক্রমণ করে। সীমান্ত পার হওয়ার পর 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' নামে একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাদের (স্টুয়ার্ড মুজিবসহ) 'জয় বাংলার লোক' সম্বোধন করে অভ্যর্থনা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। সেখান থেকে জিপে করে আগরতলা যাই এবং খোঁজ খবর নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্নেল এমএজি ওসমানীর সঙ্গে দেখা করে সার্বিক পরিস্থিতি এবং করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করি। তিনি আমাকে কুমিল্লা সীমান্তে অবস্থানরত চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক এবং সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্বে নিয়োজিত ক্যাপ্টেন খালেদ মোশাররফের সঙ্গে দেখা করে মাদারীপুর এলাকায় কাজ করার জন্য তাঁর সহযোগিতা নিতে বলেন। আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন আগরতলা মামলার ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান। খালেদ মোশাররফের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি আমাকে কিছু দিক নির্দেশনা ও সঙ্গে কিছু গোলাবারুদ ও অস্ত্র দিয়ে মাদারীপুর পাঠিয়ে দেন এবং প্রশিক্ষণের জন্য ৫০ জন করে এক একটি ব্যাচ তাঁর দপ্তরে পাঠাতে বলেন।

আমি এবং স্টুয়ার্ড মুজিব দুটি বস্তায় এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ মাথায় নিয়ে ৯ এপ্রিল রওনা দিয়ে অনেক অজানা-অচেনা পথ পাড়ি দিয়ে বহু কষ্টে সম্ভবত ১২ এপ্রিল মাদারীপুর পৌঁছি। সেখানে (প্রয়াত) ফণীভূষণ মজুমদার এমপি (পরে মন্ত্রী), আওয়ামী লীগ নেতা আসমত আলী খান এমপি, এমএ মান্নান (টুনু মান্নান)সহ স্থানীয় অনেকের সহযোগিতায় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কার্যক্রম শুরু করি।'

কর্নেল শওকতের দেওয়া তথ্য মতে, কয়েকদিনের মধ্যে ফরিদপুর শহর পাকিস্তানিদের দখলে আসে এবং মাদারীপুরও পতন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তিনি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ করে মে মাসের মাঝামাঝি আবার ২নং সেক্টরের সদর দপ্তরে চলে যান। সেখানে মাদারীপুর এলাকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের দেশে পাঠানো এবং ২নং সেক্টরে যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে তিনি কোলকাতা ৮নং থিয়েটার সড়কে কর্নেল ওসমানীর সদর দপ্তরে স্টাফ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ক্ষোভ ও অনাস্থার কারণ বৈষম্য

ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুল জলিল



নরসিংদীর খাদ্যশষ্য ও পাট ব্যবসায়ী আবদুল কাদেরের পুত্র আবদুল জলিল বিপ্লবী দলের অন্যতম সদস্য এবং আগরতলা মামলার ২৯ নং আসামি। জন্ম ১৯৩৫ সালের ২০ মার্চ নরসিংদী জেলার সররাবাদ হাজি বাড়িতে। বর্তমানে থাকেন ঢাকার ১২, সিদ্ধেশ্বরী লেনের একটি ফ্লাটে। বেলাবোর সররাবাদ দক্ষিণ পাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা ও নারায়নপুর শরাফত উল্লাহ্ উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা নিলেও ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৫১ সালে বাগেরহাট মুসলিম হাই স্কুলে থেকে। তাঁর চাচা বাগেরহাট পিসি কলেজের অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাকের তত্ত্বাবধানে আইএ ক্লাসে ভর্তি হন ওই কলেজে। ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়ে নেতৃত্ব দেন বাগেরহাট অঞ্চলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে। আর পড়ালেখা চলাকালেই যোগ দেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে। ৫২ সালে করাচি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রাইভেটে এইচএসসি পাশ করে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তি হন। ওই অবস্থায় ১৯৬০ সালে যান আমেরিকায় প্রশিক্ষণের জন্য। সেখানে গান্টার এয়ার ইউনিভার্সিটি থেকে প্রাইভেটে সম্পন্ন করেন এক বছরের 'রেডিও টক অ্যাডভান্স ইলেকট্রনিক্স এ ডিপ্লোমা কোর্স। ১৯৬১ সালে দেশে (করাচি) ফিরে এসে কর্মস্থলেপাকিস্তানিদের বৈষম্যের শিকার হয়ে এক পর্যায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন জলিল। জড়িয়ে পড়েন সশস্ত্র বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের গোপন বিপ্লবী তৎপরতায়। আগরতলা মামলার আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার হয়ে ভোগ করেন চরম নির্যাতন। ৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মামলা প্রত্যাহারের পর অন্য আসামিদের মতো মুক্তি পান তিনিও। ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন ৬ নং সেক্টরে এয়ার কমোডর এম কে বাশারের অধীনে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর পরামর্শে তিনি তেজগাঁওয়ে সরকারি মোটর ভেহেইক্যাল ওয়ার্কশপে ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগ দেন এবং ৭৫ এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ওই পদে নিয়োজিত ছিলেন।

আবদুল জলিল ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতি সচেতন আত্মীয় পরিমন্ডল এবং শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে নিজেও হয়ে ওঠেন রাজনীতি সচেতন। ২০০৭ সালের ১২ মার্চ অপরাহ্নে

তাঁর রামকৃষ্ণ মিশন সড়কের ব্যবসায়িক সংগঠনের কার্যালয়ে এ লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য জানান তিনি। প্রশ্নোত্তরে বেরিয়ে এসেছে গোপন আন্দোলনে তাঁর জড়িত হওয়া, তাঁর জানামতে অন্য সঙ্গীদের কার্যক্রম, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের যোগসূত্র, কারাগারে নির্যাতনের কাহিনী। প্রকাশ পেয়েছে স্বাধীনতার এত বছর পরও কোনো সরকারের পক্ষ থেকে কোনো রকম স্বীকৃতি না পাওয় বা মূল্যায়ন না হওয়ায় ক্ষোভের কথাও।

'পাকিস্তান ২০ বছরের বেশি টিকবে না'

শৈশব থেকে নিজের মধ্যে রাজনীতির ধারা প্রবাহ এবং পাকিস্তানিদের প্রতি ক্ষোভ-বিদ্রোহের উৎপত্তি সম্পর্কে আবদুল জলিল বলেন, 'আমার এলাকা তখন একটি অজ পাড়াগাঁ হলেও ১৯৪০-৪১ সাল থেকেই আমাদের বাড়িতে বয়ে যেত রাজনৈতিক আলোচনার ঝড়। আমার আপন জেঠা পন্ডিত আবদুস সোবহান এবং এলাকারই একজন শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ আবদুল হামিদ, (উভয় প্রয়াত) এ দুজনই বিভিন্ন পত্র পত্রিকা সংগ্রহ করতেন, পড়তেন এবং রাজনৈতিক আলোচনায় মজে থাকতেন। তাঁদের সেই আলোচনা শুনতে আসতেন আশেপাশের উৎসাহী অন্য কয়েকজনও। আবদুল হামিদ এক সময় গণমুক্তি পার্টি করতেন এবং ওই পার্টির সভাপতি ছিলেন। আলোচনাস্থল বাংলোঘরটি একই সাথে ছিল আমার পড়ার ঘরও। তাঁদের সেই আলোচনা সমালোচনা শুনতে শুনতে এক পর্যায়ে আমিও রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। পাকিস্তান আন্দোলন তুঙ্গে থাকার সময় ৪৬ সালের নির্বাচনে এলাকার মুসলিম লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন অধ্যক্ষ আবদুল হামিদ। ওই সময় এক ঘরোয়া আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, 'পাকিস্তান (প্রস্তাবিত) একটি অবাস্তব কল্পনা। এটি জম্মগ্রহণ করলেও বিশ বছরের বেশি ঠিকবে না। তাঁর এই কথাটা তখনই আমার মনে দাগ কাটে।'

আবদুল জলিল জানান, তিনি বাগেরহাট থাকার সময় ৫১ সালের ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন। আন্দোলনে তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন লাল, লালের বড় ভাই বামপন্থী 'গোরাইদা' সহ অনেকে। ৫২ সালে ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে বাগেরহাটে তাঁরা মিছিলের আয়োজন করেন। স্মৃতিচারণ করে জনাব জলিল বলেন, "আমাদের মিছিলের শুরুতে বক্তব্য দেন ইতিহাসের অধ্যাপক জেবি বিষ্ণু। তিনি পাকিস্তানিদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, 'অত্যাচারী তার অত্যাচারের মাত্রা যতই বাড়াবে, মুক্তি তত দ্রুত ধেয়ে আসবে।' তাঁর এই কথাগুলোও আমার মনে রেখাপাত করে। অনেক তালবাহানার পর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান একটি রচিত হয়ে গেলে আমার মনে প্রশ্ন জাগে অধ্যক্ষ হামিদ সাহেব যে বলেছিলেন, পাকিস্তান টিকবে না, তা কি মিথ্যা হয়ে গেল? ওই বছর একদিন ছুটিতে এসে অধ্যক্ষ হামিদকে বললাম, 'আপনি তো বলেছিলেন পাকিস্তান টিকবে না। এখনতো সংবিধান রচিত হয়ে গেছে। এতে তো মনে হয় পাকিস্তান টিকে গেছে।' তিনি তখন বলেছিলেন, 'দেখো জলিল,

প্রোগ্রেসকে আমি এক্সিসটেন্স বলি না, পাকিস্তান উইল ব্রেক ইনটু টুয়েন্টি ইয়ারস।' ১৯৬৪ সালে আইউব খানের আমলে যে নির্বাচন হয় এতে অধ্যক্ষ আবদুল হামিদ এমপি নির্যাচিত হন। এরপর করাচিতে শপথ নেওয়ার সময়ও তাঁর সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি শপথ শুরু করেন বাংলায়, শেষ করেন ইংরেজিতে। এ নিয়ে আলোচনাও হয় বেশ। এরপর আর একবার ছুটিতে এলে এ ব্যাপারে তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'দেখ, আমি বাংলায় শুরু করেছিলাম পাকিস্তানের ঐক্য ও ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য। সেই ঐক্যতো শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারবো না। আর বিধাতা যদি তখন শপথ ভঙ্গের প্রশ্ন তোলেন সঠিক জবাবও দিতে পারবো না, তাই ইংরেজি অংশ থেকে বলেছি 'উই উইল প্রিজার্ভ দি ইনটিগ্রিটি অব পাকিস্তান।' 'প্রিজার্ভ, 'ইন্টিগ্রেশন, শব্দগুলোর নানা অর্থ আছে। প্রশ্ন উঠলে সেভাবে জবাব দেবো।' অধ্যক্ষ হামিদের এরকম দূরদর্শিতা, পাকিস্তানের প্রতি এরকম অনাস্থা-এসবও আমাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি গভীর আন্তরিক হতে উদ্বুদ্ধ করে।"

বিমান বাহিনীতে স্বাধীনতা পন্থী গ্রুপ

চাকরিস্থলে ক্ষোভের কারণ এবং বিমান বাহিনীতে স্বাধীনতাপন্থী গ্রুপ তৈরির পটভূমি বর্ণনা করে আবদুল জলিল জানান, ১৯৫২ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগ দিয়ে করাচিতে গিয়ে তিনি দেখেন বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিরা বৈষ্যমূলক আচরণ করছে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং বেসামরিক পর্যায়ে পদোন্নতিতে করা হচ্ছে বিমাতাসূলভ আচরণ। এমনকি পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে বাঙালি কোটা থেকে। বাঙালি কর্মকর্তা পর্যায়ে পদোন্নতি পাচ্ছেন খুবই কম, হাতে গোনা কয়েকজন। বাঙালিদের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে বলা হলে পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে প্রায়ই বলা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী হলেই পূর্ব পাকিস্তানও রক্ষা পাবে।

ঈদসহ বিভিন্ন উপলক্ষে ছুটির দিনে পশ্চিমারা চলে যেতো ছুটি কাটাতে, আর বাঙালিদের বাধ্য করা হতো কাজ করতে। বাধ্য করা হতো ভাতের বদলে রুটি খেতে। এসব নির্যাতন-বৈষম্যের চিত্র দেখে তাঁর অধ্যক্ষ আবদুল হামিদ ও অধ্যাপক জেবি বিষ্ণুর কথাগুলো বারবার মনে পড়ছিল। আর তখন থেকে অখন্ড পাকিস্তানের প্রতি তাঁর ক্ষোভ ও অনাস্থা আরো বেড়ে যায়। এপর্যায়ে তিনিসহ অন্যান্য সহকর্মীদের মাথায় ঢুকে স্বাধীনতার চিন্তা এবং সৃষ্টি হয় একটি স্বতন্ত্র গ্রুপ। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাক সার্জেন্ট জলিলের ভাষায়, 'আমি লক্ষ্য করি যে, পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে সমসাময়িক বেশ কজন বাঙালি সহকর্মীর মাঝে ক্ষোভ ও অনাস্থাভাব বিস্তৃত হয়েছে। আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা একমত হই যে, পাকিস্তানিদের সঙ্গে এক সাথে বসবাস করা হয়তো আর সম্ভব হবে না। ভাবতে থাকি কীভাবে দেশকে স্বাধীন করা যায়। এ বিষয়ে সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা ও সমর্থক বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়াত ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ ও আমিসহ

আরো কয়েকজন মিলে ১৯৬০-৬১ সালে বিমান বাহিনীর ভেতর একটি গ্রুপ তৈরি করি। গুপ্তচরদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য আমরা আলোচনার জন্য চলে যেতাম কোথাও কোনো পিকনিক স্পটে। বাঙালি সৈনিকদের মাঝে এরকম আরও গ্রুপ আছে কিংবা কথিত আগরতলা মামলায় শেখ সাহেবসহ অন্য যাঁরা আসামি হয়েছেন তাঁরাও যে গোপনে একই রকম উদ্দেশ্য ও চিন্তা ভাবনা নিয়ে তৎপরতা চালাচ্ছেন তা তখনো আমার জানা ছিল না।'

শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ ৫৭ থেকে

তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ প্রসঙ্গে সার্জেন্ট জলিল বলেন, "৬২-৬৩ সালের দিকে মফিজউল্লাহ (আগরতলা মামলার ৭নং আসামি) এক পর্যায়ে জানান যে, 'আমরা যে রকম চিন্তা-ভাবনা করছি, তেমন চিন্তার লোক নৌ ও সেনাবাহিনীতেও অনেক আছে। তাঁরাও এ রকম একটা কিছুর জন্য অগ্রসর হচ্ছেন। চলুন আমরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একত্রে কিছু করার চেষ্টা করি।' ১৯৬৪ সালের দিকে তিনি আবার জানালেন যে, 'নৌ-বাহিনীর যে গ্রুপটা কাজ করছে, তাঁদের সঙ্গে শেখ সাহেবও যুক্ত আছেন। তাঁদের কার্যক্রমে তাঁর (শেখ মুজিবের) সম্মতি আছে।'

এ পর্যায়ে মফিজউল্লাহর কথাবার্তায় বুঝতে পারি যে, নৌবাহিনীর ওই দলটির সঙ্গে তাঁর অনেক আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। কিন্তু আমাকে বলা যাবে কি না এটা পর্যবেক্ষণের জন্যই এতদিন সরাসরি মুখ খুলতে চাচ্ছিলেন না।

আমাদের এই গোপন তৎপরতার আগেও ৫৬-৫৭ সালের দিকে একজন সাহসী বাঙালি রাজনৈতিক নেতা হিসেবে কথা বলার জন্য শেখ সাহেবের সঙ্গে আমাদের অনেকে দেখা করেছেন। করাচিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মেয়ের বাসা লাকামা হাউস থেকে আমার বাসার দূরত্ব তেমন বেশি ছিল না। হেঁটে যাওয়া যেতো। আমরা জানতাম, তিনি করাচি এলে লাকামা হাউসে উঠতেন। আর তখনই আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে দেশের ভালমন্দ নানা দিক, আমাদের সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতাম।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারের দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী থাকাকালে একদিন আমরা, বিহারীরা আমাদের ওপরে যে অবিচার ও অসৌজন্যমূলক আচার-আচরণ করছে যে সম্পর্কে তাঁর কাছে অভিযোগ জানাই। তিনি আমাদের কথা শুনে বললেন, 'ঠিক আছে চল দেখি কোথায় কী হচ্ছে।' কোনো প্রটোকল ছাড়াই তিনি আমাদের সঙ্গে ওই এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি বিহারীদের সরাসরি কিছু না বললেও তাঁর যাওয়ার পর দেখি বিহারীরা চুপ হয়ে গেছে। এভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা বা উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় নিয়ে সরাসরি কোনো কথা তখনো বলা হয়নি। তবে বাঙালির স্বার্থ সংরক্ষণ কীভাবে করা যায়, করাচিতে এ নিয়ে বাঙালিদের মধ্যে কী ধরনের কথাবার্তা হয় কিংবা বাঙালিদের স্বার্থ নিয়ে বাঙালি সৈনিকদের ভেতরের মনোভাব ইত্যাদি তিনি জানতে চাইতেন। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি আমাদের ক্ষোভের কথা বুঝতেন, এসব নিয়ে ভাবতেন। স্বাধীনতার জন্য গোপন সাংগঠনিক ও অন্যান্য পরিকল্পনা তৈরির প্রয়োজন

দেখা দিলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা হয় যে, যেহেতু আমরা সৈনিক, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, সংগঠন নেই। এ অবস্থায় চাইলেও তা টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে। দেশ পরিচালনার মতো শক্তি সামর্থ্য আমাদের নেই। এ জন্য আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশেষ বিশেষ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। কিন্তু কেউ এ ব্যাপারে সাহস করে এগিয়ে আসেননি। বঙ্গবন্ধুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমাদের কথায় একমত হয়ে সাহস দিয়েছিলেন। আন্দোলনের স্বার্থে বহু টাকা পয়সাও সাহায্য করেছেন। আমাদের মধ্যে কথা হয়-সব প্রস্তুতি শেষে একটি দিন ঠিক করে আচমকা হানা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সবগুলি অস্ত্রাগার দখল করে নেব। পশ্চিমা সৈন্যদের বন্দি করে দেশকে স্বাধীন ঘোষণা করব। শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট হবেন এবং আওয়ামী লীগের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হবে।"

সার্জেন্ট জলিলের বর্ণনা অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাঁরা লে. মতিউর রহমানের মাধ্যমে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমের দলের সঙ্গে যুক্ত হন। জলিল তখনো মোয়াজ্জেম সাহেবকে সরাসরি দেখেননি। লে. মতিউর রহমান ও মফিজ উল্লাহ বলেছিলেন নিরাপত্তার স্বার্থে মোয়াজ্জেমের পরিচয় গোপন রাখা হয়। কারণ যে কেউ গুপ্তচর হয়ে দলের ভেতর ঢুকে চরম ক্ষতি করতে পারে। মোয়াজ্জেমকে সার্জেন্ট জলিল প্রথম দেখেন মামলা চলাকালে আদালতে।

মফিজউল্লাহ-জলিলরা দায়িত্ব নিয়ে সাংগঠনিক তৎপরতা চালাতে গিয়ে এ প্রক্রিয়ায় শেখ মুজিবের জড়িত থাকার ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য পান। জানা যাক সে কথা জলিলের কাছ থেকে:

'মফিজউল্লাহ এবং আমিসহ কয়েকজন সাংগঠনিক কাজ করতে গিয়ে ৬৪ সালের প্রথম দিকে এক বৈঠক জানতে পারি যে, ইতিমধ্যে মোয়াজ্জেম সাহেবদের সঙ্গে শেখ সাহেবের দুটি বৈঠক করাচির পার্ক সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া এই প্রক্রিয়া যাঁরা শুরু করেন তাঁদের মধ্যে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম, স্টুয়ার্ড মুজিব, ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন এবং নূর মোহাম্মদ বাবুলের (বিপ্লবী কাউন্সিলের একমাত্র জীবিত সদস্য) সঙ্গে অনেক আগে থেকেই সরাসরি যোগাযোগ ছিল বঙ্গবন্ধুর।'

জলিলের বাসায় প্রশিক্ষণ

সার্জেন্ট জলিলের বাসা ছিল শহরের মধ্যে জাহাঙ্গীর সড়ক (পূর্ব) ও মার্টিন সড়কের মধ্যবর্তী এলাকায় ক্লেটন কোয়ার্টারে। সেখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কবর। জলিলের বাসা 'পাবলিক এরিয়া' হওয়ায় সেখানে গুপ্তচর বৃত্তির সম্ভাবনা ছিল কম। সব দিক বিবেচনায় তাঁর বাসাকেই আলোচনা ও প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়।

সার্জেন্ট জহুর ও দলের অন্য সদস্যেরা প্রতি রোববার ছুটির দিন জলিলের বাসায় আসতেন। অস্ত্রপ্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হতো নিজেদের মধ্যে। যাঁরা নতুন যুক্ত হতেন তাঁদের গ্রেনেড, পিস্তলসহ অন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিতেন সার্জেন্ট জহুর। পরবর্তী সময়ে জলিলকে গ্রেপ্তারের পর তাঁর বাসা তল্লাশী করে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত একটি নমুনা গ্রেনেড উদ্ধার করা হয় এবং মামলার আলামত হিসেবে সেটি আদালতে দাখিল করা

হয়। এটি বর্তমানে ক্যান্টেনমেন্টের ভেতর মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর ‘বিজয় কেতনে’ সংরক্ষিত আছে।

স্বাধীনতার ব্যাপারে গণভোটের প্রস্তাব

বাঙালিরা যে স্বাধীনতা চান, পশ্চিমাদের সঙ্গে থাকতে চান না তা প্রমাণের জন্য গণভোট দেওয়ার প্রস্তাব তোলা হয় ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি নরসিংদীর নারায়নপুর গ্রামের এক সভা থেকে।

২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অভিযোগ থেকে ছাড়া পেয়ে সরাসরি গ্রামে চলে যান সার্জেন্ট আবদুল জলিল। ওই দিন (শেখ মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি দেওয়ার আগের দিন) নরসিংদীর নারায়নপুর গ্রামে পূর্ব নির্ধারিত এক সভায় জলিলকে নিয়ে যান অধ্যক্ষ আবদুল হামিদ। ওই সভা থেকেই প্রস্তাব তোলা হয় ‘বাঙালিরা স্বাধীনতা চায় কি না তা গণভোটের মাধ্যমে যাচাই করা হোক’। সার্জেন্ট জলিল বলেন, ‘ওই সভায় অধ্যক্ষ হামিদ তাঁর ‘জাতীয় ভূ খন্ড’ নামে একটি বই থেকে কিছু অংশ জনগনের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনান। এর মূল বক্তব্য ছিল ‘শুধু ধর্মের ভিত্তিতে কোনো রাষ্ট্র হতে পারে না। একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য যেসব শর্তের প্রয়োজন তার মধ্যে আমরা পড়ি না। যদি কেবল ধর্মের ভিত্তিতে একটা রাষ্ট্র হতো তাহলে এক ধর্ম, এক ভাষার লোকদের এতগুলো রাষ্ট্র হতো না।’ সভায় বলা হয়, পাকিস্তান সরকার আগরতলা মামলার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করার ষড়যন্ত্রের অজুহাতে অভিযোগপত্র দিয়ে ভেবেছিল, বাঙালিরা অভিযুক্তদের ফাঁসি চেয়ে রাজপথে মিছিল করবে। কিন্তু বাস্তবে তারা আন্দোলনের মাধ্যমে অভিযুক্তদের মুক্ত করে এনেছে এবং বীরের মর্যাদা দিয়েছে। কাজেই বাঙালিরা স্বাধীনতা চায় কি না-তা গণভোটের মাধ্যমে যাচাই করা হোক। ভৈরব টেলিগ্রাফ অফিস থেকে এই প্রস্তাব প্রতিটি পত্রিকা অফিস, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ অন্যান্য শীর্ষ নেতা এবং প্রেসিডেন্ট আইউব খানের কাছে পাঠানো হয়।’

মুক্তিযুদ্ধে জলিল

ষাটের দশকের শুরুতে স্বাধীনতার যে চেতনা বুকে ধারণ করেছিলেন সেই চেতনার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেও সক্রিয়ভাবে অংশ নেন অবসরপ্রাপ্ত ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুল জলিল। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার আগে তিনি একটি ব্রিটিশ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। ২৬ মার্চ ছিলেন কিশোরগঞ্জের গ্রামের বাড়ি। যুদ্ধ শুরুর খবর পেয়ে সকালেই তাঁর এক মামাতো ভাই মো. আতিককে নিয়ে মোটর সাইকেলে করে কিশোরগঞ্জ শহরে পৌঁছেন। তাঁর সেই মামাতো ভাই আতিক পরে মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়ে ভৈরবেই শহীদ হন। কিশোরগঞ্জে আওয়ামী লীগসহ স্থানীয় অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার নানাদিক দিয়ে আলোচনা করেন এবং স্থানীয়ভাবে লোকজনদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ওই সময় তিনি প্রথম জিয়াউর রহমান নামে একজন বাঙালি সামরিক কর্মকর্তার নাম শুনতে পান। বললেন, ‘ওই সময়ের

সঠিক তারিখ আমার মনে নেই, শুনেছি মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বেতারে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এবং বঙ্গবন্ধু তাঁদের সঙ্গে আছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এদিকে আমি এলাকায় কিছু লোককে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলাম, এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি সেনারা কিশোরগঞ্জ শহরে প্রবেশ করলে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতে চলে যাই। পরে কোলকাতায় গিয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনছুর আলী প্রমুখের সঙ্গে দেখা করি। তাঁরা আলোচনা করে আমাকে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে ৬নং সেক্টরে কাজ করার জন্য বলেন। এর আগেই আমি তাঁদের কাছে অনুরোধ করেছিলাম আমাকে যেন আমার নিজ এলাকার দায়িত্ব না দেন। কারণ ওই সময় এলাকায় হতাহতের ঘটনা ঘটলে স্বাধীনতা অর্জনের পর এলাকাবাসীর সঙ্গে পরস্পর শত্রু হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। আমাকে তখন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল নরসিংদীর রায়পুর এলাকায়। দেশ শত্রুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ওই এলাকায় প্রতিরোধ আন্দোলনে নিয়োজিত ছিলাম।'

‘এবার আলাদা হওয়ার পরিকল্পনা নেব’

মুহাম্মদ মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী



আগরতলা মামলার ৩০ নং আসামি মুহাম্মদ মাহবুব উদ্দিন চৌধুরীর গ্রামের বাড়ি হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানার পিয়ান গ্রামে। বাবার নাম আজিজ উদ্দিন চৌধুরী। পিয়ান পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা ও বাহুবল থানার দীননাথ ইনস্টিটিউটশন থেকে ১৯৫৩ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে নন কমিশন অর্ডিনারি রিক্রুট হিসেবে যোগ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটা যান প্রশিক্ষণের জন্য। নন কমিশনে টেলি কমিউনিকেশনে দক্ষ মেকানিক এবং সবচেয়ে ভাল প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে বেশিদিন চাকরি করতে পারেননি। ঘাত-প্রতিঘাত ও বাদ-প্রতিবাদের এক পর্যায়ে চলে যান করাচিতে। করাচি ইসলামিয়া কলেজ থেকে ’৬১ সালে উচ্চমাধ্যমিক এবং ৬৩ সালে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ইতিমধ্যে জীবনের পদে পদে প্রতিবাদী ভূমিকা রাখাতে গিয়ে এক পর্যায়ে ১৯৬৬ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা গোপন বিপ্লবী কর্মপ্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত হন। মাহবুব উদ্দিন ৫৭ সালেই পাকিস্তানিদের অন্যায় আচরণের কথা জানাতে গিয়ে শেখ মুজিবের কণ্ঠ থেকে শুনেছেন ‘এদের সঙ্গে আর থাকা চলবে না। ঢাকায় গিয়ে আলাদা হওয়ার পরিকল্পনা নেব।’

বিস্তারিত জানার জন্য ২০০৭ সালের ১৫ মার্চ মাহবুব উদ্দিনের ঢাকায় শ্যামলীর ২নং সড়কের বাড়িতে (নং ১৩/১১ গ) গিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। এতে উঠে আসে বাঙালি সামরিক-বেসামরিক লোকদের মধ্যে ক্ষোভের নানা কারণ এবং আগরতলা মামলার উদ্ভবসহ প্রাসঙ্গিক নানা কাহিনী।

মাহবুব উদ্দিন জানান, পাকিস্তানে চাকরি করতে গিয়ে এক বছরের মাথায় প্রথম ধাক্কা খান তিনি। ৫৬ সালের নভেম্বরের কোনো একদিন তাঁদের পুরো ব্যাটেলিয়ান জড়ো করে বলা হয় যে, ‘গাড়ি চালক ও এমপি (মিলিটারি পুলিশ) ছাড়া অন্য কোনো পদ খালি নেই। কেউ ইচ্ছে করলে এসব পদে যোগ দিতে পার নইলে চলে যেতে পার।’ কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ স্বরূপ মাহবুব উদ্দিন ব্যাটেলিয়ানের সেই বৈঠক থেকে ওয়াক আউট

করেন এবং বলেন, 'পদ খালি নেই, এজন্য তো আমরা দায়ী নই।' কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অপরাধ হিসেবে নেন। কারণ নিয়ম ছিল কোনো বিষয়ে বলার থাকলে সামনাসামনি গিয়ে বলতে হবে। দ্বিতীয়ত সেনাবাহিনীতে 'আমরা' বলা সাংঘাতিক অপরাধ। নিজে শুধু নিজের কথাটাই বলতে পারবে। দলবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করা যাবে না। 'আমরা' শব্দটা দলবদ্ধতার প্রকাশ ঘটায়। মাহবুব উদ্দিন বলেন, "তখনকার ক্যাপ্টেন সেলিম আহমদ আনসারী আমার প্যারেড, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদির জন্য আমাকে খুবই পছন্দ করতেন। কিন্তু সেদিন তিনি ব্যাটেলিয়ানের সামনেই আমাকে ভীষণভাবে অপমানিত করেন। এতে আমি ক্ষুব্ধ হয়ে পাল্টা জবাব দিতে উদ্যত হলে, তখনই আমাকে সেখানে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বেল্ট কেড়ে নেওয়া হয়। বেল্ট খুলে ফেলাটাই একটা শাস্তি। কিছুক্ষণ পর আমাকে কার্যালয়ে নেওয়া হয়। সেখানে দেখি লেফটেন্যান্ট এয়াকুব খান মালিক। ইতিপূর্বে আমি কমিশনের জন্য আবেদন করেছিলাম এবং তিনি (মালিক) আমাকে প্রাথমিকভাবে মনোনীত করেন। তিনি আমার অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি হয়েছে মাহবুব।' সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন আনসারী বললেন, 'সে ছেলেদেরকে ওখানে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছিল।' এরপর তাঁরা দুজন আর একটি কক্ষে গিয়ে শলাপরামর্শ করে এসে আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কেন প্রতিবাদ করলাম। আমি বললাম, 'স্যার, এটা একটা সম্প্রসারণশীল সেনাবাহিনী। আজ আমাদের উদ্বৃত্ত মনে হলেও ভবিষ্যতে দরকার হতে পারে। তাই প্রশিক্ষণ দিয়ে রিজার্ভে রেখে দিলেই হয়।' এটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে ওনারা 'ঠিক আছে' বলে আমাকে লাইনে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সংবাদটা পাঠিয়ে দেন সদর দপ্তরে। দুতিন দিন পরই সদর দপ্তর থেকে চিঠি এল-যে যেই ট্রেডে আছে সে সেই ট্রেডেই থাকতে পারবে। যাঁরা এভাবে থাকতে চাইবে না, তাঁরা চাকরি ছেড়ে চলে যেতে পারে।

তখনকার দিনে সেনাবাহিনীর চাকরিতে ঢোকা ছিল সহজ। বের হওয়া ছিল কঠিন। আমার কথার পর যাঁরা এখানকার কড়া শাসন সহ্য করতে না পেরে বের হয়ে যেতে চেয়েছিলেন তাঁদের কাছে আমি হিরো বনে গেলাম। তবে আমার কাছে অপশন ছিল (বিকল্প প্রস্তাব)। লে. এয়াকুব খান মালিক বললেন, 'একজন ভাল ছেলে মনে করে তোমাকে আমি পাকিস্তান আর্মিতে পেতে চেয়েছিলাম। এখনো চাই। এখন তুমি ভেবে দেখো কি করবে।'

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, 'মুখ থেকে থুথু একবার মাটিতে পড়ে গেলে তা আর উঠানো যায় না। আমি দেশের মাটিতে গিয়ে অন্য পেশায় থেকে ব্যবসা বা অন্য কোনো উপায়ে দেশের সেবা করবো। এ কথা বলে আমি বিদায় নিই সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে।"

৫৭তে মুজিব: 'এবার আলাদা হওয়ার পরিকল্পনা নেব'

সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী কোয়েটা থেকে চলে যান করাচির ফেডারেল এরিয়ায়। আত্মীয়-পরিচয়হীন অবস্থা। নগদ টাকা-পয়সাও প্রায় শেষ। সেখানে তিনি

জানতে পারেন সিলেটের কোনো লোক ওই এলাকায় থাকেন। একদিন ফেডারেল এরিয়ায় হাঁটাহাঁটির সময় দেখা ও পরিচয় হয় সিলেটের বাসিন্দা বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি সৈয়দ আবদুল নবীর সঙ্গে। তিনি সিলেটের অপর বাসিন্দা পিডাব্লিউর নির্বাহী প্রকৌশলী সোলায়মান খানকে বলে মাহবুব উদ্দিনের জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেন অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক হিসেবে। এটি ছিল ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। এভাবে জীবন গড়ার পথে একটুখানি আশার আলো দেখতে না দেখতে মাত্র চার মাসের মাথায় আর এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হন তিনি। পাকিস্তানিদের বৈষম্য ও পরশ্রীকাতরতামূলক আচরণের শিকার হন তিনিসহ অনেক বাঙালি। আবারো পাকিস্তানের প্রতি চরম অসন্তোষ নিয়ে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন সংশ্লিষ্টরা।

মাহবুব অন্যদের সঙ্গে নিয়ে করাচির এমপি হোস্টেল সামাকো হাউসে দেখা করেন শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে। সেখানেই প্রথম তাঁরা শেখ মুজিবের মুখ থেকে শুনতে পান বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার দুঃসাহসিক পরিকল্পনার কথা।

এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করে মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী বলেন, "১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চাকরিতে নিয়োগ পাওয়ার মাত্র চার মাস পর জুলাই মাসেই হঠাৎ নিয়োগ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয়, যাতে দেখা যায় নোটিশ প্রাপ্তদের শতকরা ৮০ জনই বাঙালি। আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বাঙালিদের মধ্য থেকে নিয়োগের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এটা পাকিস্তানি আমলারা পছন্দ করেননি। তারা কায়দা করে এমনভাবে নিয়োগ প্রত্যাহার করেন যাতে বাঙালিরা চাকরি থেকে বাদ পড়েন। এ ঘটনায় আমরা হতাশ হলেও প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত নিই। এ পর্যায়ে আমি সঙ্গীদের নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের এমপিদের হোস্টেল সামাকো হাউসে যাই। সেখানে বাঙালি এমপি যাঁদের পেয়েছি তাঁদের কাছে আমাদের অভিযোগের বিবরণ তুলে ধরে একটি করে কপি দিই। সেখানে পেলাম শেখ সাহেবকেও। আমাদের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রথম মন্তব্য ছিল, 'এদের সঙ্গে আর থাকা চলবে না। ঢাকায় গিয়ে আলাদা হওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে নেব।'

শেখ সাহেব ইতিমধ্যে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন। যতদূর মনে পড়ে সেদিন এমপি হোস্টেলে অনেকের মধ্যে ফরিদ আহমদ, কুমিল্লার রমিজ উদ্দিন আহমেদ, ময়মনসিংহের সৈয়দ মেজবাহ উদ্দিন হোসেন, ইউসুফ আলী প্রমুখ ছিলেন। আমাদের কথায় তাঁরা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি। সেদিনের প্রতিবাদের ফলাফল অবশ্য বাঙালি-পাকিস্তানি যাঁরা সেখানে চাকরি করতে গিয়েছিলেন তাঁরা পেয়েছেন, যাঁরা পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তাঁরাও খুশি হন।"

শেষ পর্যন্ত মাহবুব উদ্দিনসহ অনেকের চাকরি টিকে রইল। এরই মধ্যে তিনি করাচি ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সপ্তাহে একদিন রোববার ক্লাস করলেই হতো। সবাই জানতেন এবং বুঝতেন যে, সেখানে যাঁরা চাকরিতে থেকে কলেজে ভর্তি হয়েছেন তাঁরা মূলত সনদপত্রের জন্যই ভর্তি হয়েছেন। করাচিতে অবস্থানরত বাঙালি ছাত্ররা 'পূর্ব পাকিস্ত

ান স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন' করাচি শাখা গঠন করেছিলেন। এর নির্বাহী সদস্য হন মাহবুব চৌধুরী। পরে তাঁকে যুগ্ম সম্পাদক করার প্রস্তাব দেওয়া হলেও চাকরি থেকে সরকার বিরোধী বক্তব্য দেওয়া সম্ভব হবে না বলে তিনি রাজি হননি।

পরে (১৯৫৭-৫৮-৫৯ সালের জন্য) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন যুগ্মসচিব সলিমুল্লাহর ছেলে অলি উল্লাহকে। তাঁদের মূল বাড়ি ছিল পশ্চিম বাংলার মাটিয়াপুর। এর আগে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, কবি সাহিত্যিক অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের ভাগিনা এইচ ফজলে রাব্বি।

ইতিমধ্যে দেশে আইউব খানের সামরিক শাসন জারি হয়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য মাহবুব চৌধুরী ৫৯ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ৬১ সালে আবার করাচি ফিরে গিয়ে চাকরি নেন 'জে অ্যান্ড পি কোর্স' নামে এক ব্রিটিশ কোম্পানির নির্বাহী হিসেবে। কোম্পানির পক্ষ থেকে তিনি হল্যান্ড এবং বেলজিয়ামে প্রশিক্ষণ নেন। পরে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যবস্থাপক হন।

আইউবের পক্ষে ভাসানী

১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সামরিক শাসক আইউব খানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন পাকিস্তানের জনক ও প্রথম বড়লাট মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন মিসেস ফাতেমা জিন্নাহ। বাংলাদেশের (পূর্ব বাংলায়) গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো বিশেষ করে শেখ মুজিবের অনুসারী ও সমমনারা জোর প্রচারণা চালান ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে। মাহবুব উদ্দিন জানান, অনেকের মতো পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত সচেতন ও স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ বাঙালিরাও ধারণা করেছিলেন নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ জয়লাভ করবেন। কিন্তু ফলাফল উল্টো দেখে সংশ্লিষ্ট সবার মনে বাঙালি নেতৃত্বের প্রতি চাপা ক্ষোভ দেখা দেয়। কেউ কেউ নানা কৌশলে এর প্রতিবাদ জানায়। এ সময় শেখ মুজিবের নেতৃত্বের নানা দিক পর্যবেক্ষণ করছিলেন মাহবুব উদ্দীন চৌধুরী ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী। এই নির্বাচনের ফলাফলের পর মাওলানা ভাসানীসহ ন্যাপের প্রতিও বিরূপ ধারণার জন্ম নেয় অনেকের মধ্যে। মাহবুব উদ্দিন পরে জানতে পারেন ন্যাপ নেতা মশিউর রহমান যাদু মিয়ার (পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সরকারের সহযোগী) কারসাজিতে মাওলানা ভাসানী নির্বাচনে আইউব খানের পক্ষেই কাজ করছিলেন।

এ প্রসঙ্গে মাহবুব উদ্দিন বললেন, 'নির্বাচনের পর সার্জেন্ট জলিল ও বিমান বাহিনীর অপর এক লোক আমার বন্ধু, করপোরাল সিরাজ ছুটিতে আসছিলেন বাংলাদেশে। তখন আমরা কয়েকজন প্রবাসী বাঙালি সিরাজের হাতে দু প্যাকেট কালো চুড়ি প্রতিবাদ স্বরূপ উপহারের মতো করে দিয়েছিলাম এক প্যাকেট শেখ সাহেব এবং আর এক প্যাকেট তৎকালীন ছাত্রনেতাদের উদ্দেশ্যে। সিরাজ সেই কালো চুড়ির প্যাকেট শেখ সাহেবের হাতে না দিলেও বলেছিলেন, আমাদের প্রতিক্রিয়ার কথা তাঁকে জানিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, পূর্ব বাংলায় ফাতেমা জিন্নাহ কেন কম ভোট পেলেন! তখন শেখ সাহেব দুঃখ করে বলেছিলেন,

'দিনের বেলায় যাঁরা আমাদের সঙ্গে কাজ করেছে ফাতেমা জিন্নাহর জন্য, রাতে তাঁরা কাজ করেছে আইউব খানের জন্য। মাওলানা ভাসানীকে উদ্দেশ্য করেই কথাগুলো তিনি বলেছিলেন।'

ইতিমধ্যে মাহবুব জানতে পারেন, শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান গেলে সোহরাওয়ার্দীর মেয়ে আখতার সোলায়মানের বাসা লাকামা হাউসে উঠতেন। এটি ছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্যে বরাদ্দ বাসা। মাহবুব চৌধুরী বলেন, 'অনেকে বলেন শেখ সাহেব আদৌ স্বাধীনতা চাননি। বিভিন্ন সময় তাঁর কথাবার্তা প্রমাণ করে এসব মন্তব্য ঠিক নয়।' এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "১৯৬৪ সালেই একদিন শেখ সাহেব লাকামা হাউসে যাওয়ার খবর পেয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই সিরাজকে সঙ্গে নিয়ে। সেখানে গিয়ে দেখি তিনি করাচি আওয়ামী লীগের সভাপতি সৈয়দ মনজুরুল হকের সঙ্গে কথা বলছেন। আমরা গিয়েই শুনতে পেলাম শেখ সাহেবের কণ্ঠ। তিনি মনজুরুল হককে বলছিলেন, 'মনজুরুল, আইউব খান তো তোমাদের আরব সাগর দেখিয়ে দিয়েছেন, আমার জায়গা ছোট হলেও তোমাদের সেখানে আমি জায়গা দেব।' মনজুরুল হক ছিলেন শরণার্থীদের নেতা। তাঁরা নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে কাজ করছিলেন। তাই আইউব খান রেগে গিয়ে তাঁদের উদ্দেশে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, 'রিফিউজিদের আরব সাগরে নিক্ষেপ করা হবে।' শেখ সাহেব ৫৭ তে বললেন, এবার ঢাকায় গিয়ে সেপারেশনের পরিকল্পনা নেব, আর ৬৪ তে এসে শুনলাম, মনজুরুল হককে বলতে যে, 'আমার জায়গা ছোট হলেও তোমাদেরকে জায়গা দেব।' এসব কথা প্রমাণ করে তিনি স্বাধীনতার লক্ষ্যে কিছু একটা করতে যাচ্ছেন। সেদিন তিনি আমাদের কুশল জিজ্ঞেস করেন এবং চা পানে আপ্যায়িত করেন। এভাবে শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের প্রতি অন্য অনেকের মতো আমারও আকর্ষণ জন্মে।"

বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যোগদান ও গ্রেপ্তার

মাহবুব চৌধুরী স্বাধীনতা সংগ্রামের গোপন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি জড়িত হন ১৯৬৬ সালে। এর পটভূমি জানাচ্ছেন তিনি এভাবেঃ "১৯৬৬ সালে বিমান বাহিনীর করপোরাল আমির হোসেনের সঙ্গে আমার পরিচয়। ওই বছর তিনি করাচি থেকে এমএ পাশ করার পর বিমান বাহিনী থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে পরিসংখ্যান ব্যুরোতে যোগ দেন। তিনিই একদিন আমাকে বললেন যে, 'দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে আমরা কিছু একটা করার চেষ্টা করছি। আপনিও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হোন।' কিন্তু তাঁর যে ব্যক্তিত্ব, তাতে তাঁর ওপর আমি আস্থা স্থাপন করতে পারছিলাম না। তাই তাঁর কথায় তেমন সাড়া দিইনি। এর কদিন পর করপোরাল সিরাজও প্রায় একই কথা বলে আমাকে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। করপোরাল সিরাজ ইতিমধ্যে আমার ভাল বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর আমি ওই প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ি। আমরা সার্জেন্ট জলিল সাহেবের বাসায় (ক্লেটন কোয়ার্টার) এবং আমার বাসায় (মার্টিন কোয়ার্টার) বিভিন্ন সময় বৈঠক করেছি।

আমার বাসায় বৈঠকে লে. মতিউর রহমান, কমান্ডার আবদুর রউফসহ আরও কয়েকজন এসেছিলেন। সবার নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তবে আমার প্রসঙ্গে মামলার চার্জশিটে যাঁদের নাম ছিল তাঁরা সবাই এসেছিলেন। চার্জশিটে আমাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে দেওয়া অন্যান্য বর্ণনাগুলোও সঠিক ছিল। তবে তথ্যের মধ্যে কিছুটা ভুল বা ঘাটতি ছিল। এসব ভুল ছিল আমাদের পক্ষে ভাল। যেমন আমার বাসার নম্বর ছিল ৮/৩। চার্জশিটে বলা হয়েছে ১৪/১৬।”

ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে অন্যদের মতো মাহবুবও গ্রেপ্তার হন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, ‘১৯৬৬ সালের শেষের দিকে আমাদের মধ্যে কথা হয় যে, আমরা যার যার চাকরি কিংবা ব্যবসার আড়ালে আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যা যা করার করব। বিশেষভাবে দলের সদস্য বৃদ্ধির বিষয়টি তখন প্রধান বিবেচ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে আমি, কমান্ডার রউফ, করপোরাল সিরাজ ছুটিতে আসি ঢাকায়। সে সময় বার্ষিক জমা ছুটি থেকে ছুটি নিয়ে দেশে আসা যেত।

৬৭ সালের ২৫ ডিসেম্বরই আবার করাচি ফিরে যাই। একদিন খবর পেলাম কমান্ডার রউফ গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর স্ত্রী সন্তানদের খোঁজ খবর নিই। তখন আমার ভেতরও সন্দেহ জাগে কিছু একটা কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে। এর এক মাস পর অর্থাৎ ৬৮ সালের ২৫ জানুয়ারি আমি গ্রেপ্তার হই। ২৮ জানুয়ারিই আমাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়।’

শেখ মুজিব প্রসঙ্গ

স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার গোপন আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা সম্পর্কে মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী জানান, শেখ মুজিব বরাবরই একজন স্বাধীনচেতা, দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন নেতা ছিলেন। স্বাধীনতার জন্য বাঙালি সৈনিকদের প্রস্তুতিমূলক কাজে তাঁর সম্মতি ছিল এবং তিনি সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বলে তিনি শুনেছেন। তবে এ ব্যাপারে শেখ মুজিবের সঙ্গে আগে কখনো তাঁর সরাসরি কথা হয়নি। তিনি শুনেছেন কমান্ডার রউফ, সার্জেন্ট জহুরুল হক, লে. মতিউর রহমান, করপোরাল সিরাজ প্রমুখের কাছ থেকে। তাঁরাই জানিয়েছেন, শেখ সাহেবের সঙ্গে কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, কামাল উদ্দিন, সুলতান উদ্দিনদের একটা বোঝাপড়া আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনা বিষয়ে। তৎকালীন শীর্ষ পর্যায়ের সরকারি আমলা আহমদ ফজলুর রহমান, রুহুল কুদ্দুসসহ আরো কিছু লোকের সঙ্গেও শেখ মুজিবের যোগাযোগ থাকার কথা মাহবুব উদ্দিন জানতেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের আন্দোলন সংগঠনের প্রধান নেতা ছিলেন শেখ মুজিব। নেতৃত্বের দিক থেকেও তিনি ছিলেন প্রধান। সৈনিকদের মধ্য থেকে নেতৃত্বে ছিলেন কমান্ডার মোয়াজ্জেম।’ তাঁর (মাহবুব) কাছ থেকে আরও জানা যায়, ১৯৬৬ সালের দিকে কুমিল্লার একটি দলের বৈঠকে সেনাবাহিনীর তৎকালীন ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান) উপস্থিত ছিলেন।

মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‘পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণে

অতীষ্ঠ বাঙালি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল ৫৬-৫৭ সাল থেকেই। প্রথম দিকে সংশ্লিষ্টরা চিন্তা ভাবনা করছিলেন কী করা যায়। পরে ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বিচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ স্তরে আলাপ আলোচনা করেন দেশকে স্বাধীন করার বিষয়টি নিয়ে। সমমনা গ্রুপগুলোর মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির এক পর্যায়ে তাঁরা শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনিও উৎসাহ উদ্দীপনা ও সহযোগিতা দিয়ে সংশ্লিষ্টদের মাঝে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেন যাতে তাঁদেরকে সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ও বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছানো সহজ হয়। আমাদের এই কাজের মধ্যে চট্টগ্রামের মানিক চৌধুরী প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। তিনি টাকা-পয়সা দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন বলে শুনেছি।'

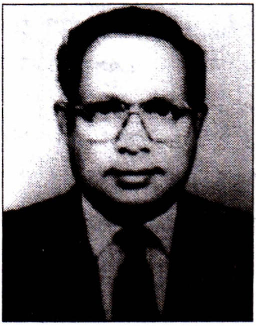
ওপরে মুসলিম লীগ ভেতরে শেখ মুজিব

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক কৌশলের একটি উদাহরণ দিয়ে মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী বলেন, তাঁর এক আত্মীয় ব্যবসায়ী মোয়াজ্জেম মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল শেখ মুজিবের। এ সম্পর্ক এত গভীর ছিল যে, মোয়াজ্জেমের মাকে শেখ মুজিবও আম্মা সম্বোধন করতেন। শেখ মুজিব তাঁকে (মোয়াজ্জেমকে) আইউব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগ দিতে বলেন, যাতে মুসলিম লীগের কর্মপরিকল্পনা জেনে তা শেখ মুজিবকে জানানো যায়। সে অনুযায়ী মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং এমএনও নির্বাচিত হন। ভেতরে ভেতরে যোগাযোগ রাখতেন শেখ মুজিবের সঙ্গে। এভাবে তিনি সরকার পক্ষের নানান খবরাখবর রাখতেন নিজস্ব লোক দিয়ে। আগরতলা মামলার পর মোয়াজ্জেম রাজনীতি ছেড়ে দেন। তবে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে গিয়ে যুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন।

নিজেদের দায়িত্ব প্রসঙ্গে মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'আমাদের কাজ ছিল যত বেশি সংখ্যায় পারা যায় লোকজনকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় সঙ্গে যুক্ত করা। তবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। বিভিন্ন স্তরে বাঙালিদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা পর্যায়ক্রমে এমনভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল যে, এই মামলায় (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা) ইচ্ছে করলে হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার দেখানো যেত। তবে মামলা টেকানো ও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য বেছে বেছে কিছু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়, তাও হাজারের ওপরে হবে।

এখন কিছু বলার সময় নয়

আলী রেজা



আলী রেজার গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ায় কোতোয়ালী থানার লাহিনী গ্রামে। বাবা মৌলভি জহুর আলী আহমদ। তিনি ১৯৪৯ সালে ঢাকা ও কলকাতা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ম্যাট্রিক, পরে বাগেরহাট পিসি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক (ইন্টারমিডিয়েট), ৫৬ সালে সেন্ট গ্রেগরি (নটরডেম) কলেজ থেকে ডিগ্রি এবং ৫৮ সালে লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টারস ডিগ্রি লাভ করেন।

স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠনে জড়িত বেসামরিক পদস্থ ব্যক্তিদের একজন মো. আলী রেজা। ভারতের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি স্টুয়ার্ড মুজিবকে নিয়ে আগড়তলা যান বলে ফেনী সীমান্ত পর্যন্ত তাঁদের সফরসঙ্গী করপোরাল এবিএম সামাদ জানিয়েছেন। সরকারি কর্মকর্তা এবং ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন তিনি। মামলায় তাঁকে ৩৩নং আসামি করা হয়।

আলী রেজার ভাই আলী নওয়াজের দেওয়া তথ্যমতে, আলী রেজা ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতি সচেতন ছিলেন এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের ভিপি নির্বাচিত হন। তিনি পরে সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনাল পাকিস্তানের সহসভাপতি ও সভাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন অবিবাহিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সময়কার গোপন প্রক্রিয়ায় কখন থেকে যুক্ত হন আলী রেজা এই প্রসঙ্গে তাঁর ছোট ভাই আলী নওয়াজ বলেন, 'তিনি কখন থেকে এতে যুক্ত হন তা আমি জানতাম না। যদিও ৬৬ সাল পর্যন্ত আমরা একই বাসায় থাকতাম। আমাদের বাসা ছিল তখন ঢাকার ১৮১ ল্যাবরেটরি রোডে।

তিনি অবিবাহিত থাকায় অনেক সময় ঘরে আসতেন না। ভাবতাম নিজস্ব কোনো কাজে নানা জায়গায় ঘুরছেন। ৬৬ সালের কোনো একদিন ভোরে দেখি ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুর রাজ্জাক (১৬ নং আসামি) আমাদের বাসায় কলিং বেল টিপেন। আমি দরজা খুলে দিলে তিনি জানতে চান এটা আলী রেজার বাসা কী না। পরে ভাই এলে উভয়ে ড্রইংরুমে বসে

কথাবার্তা বলেন। সেই সময় আমি প্রথম জানতে পারি ভাই এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। অথচ আমাকে কোনোদিন এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। সার্জেন্ট আবদুর রাজ্জাক চলে যাওয়ার পর ভাইয়ের মনটা গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবলাম কোনো একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তাই বড় ভাইকে বললাম, তোমার তো পরিবার নেই, আমার পরিবার আছে, কৌশলগত কারণে বাসাটি বদলে ফেলা দরকার। পরে তিনি ধানমণ্ডি ১৯ নম্বরে চলে যান। আমি পরিবার নিয়ে চলে যাই মনিপুরী পাড়ায়। এ পর্যায়ে আমি ধীরে ধীরে জানতে পারি শেখ মুজিবের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে।

তিনি অস্ত্র সংক্রান্ত আলোচনার জন্য স্টুয়ার্ড মুজিবসহ আগরতলাও গিয়েছিলেন।

৬৯ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু যখন প্রথম ফরিদপুর যান আলী রেজাও তাঁর সঙ্গে যান। সেখান থেকে যান ঝিনাইদহে। এ পর্যায়ে তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু বেশিদিন থাকেননি। কারণ সত্তরের নির্বাচনে মনোনয়ন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য দেখা দেয়।

স্বাধীনতার পর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠিত হলে তাতে যোগ দেন আলী রেজা। ৭৫ পরবর্তী সময়ে জেনারেল এম এ জি ওসমানীর জাতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। ১৯৮৮ সালের ২২ মার্চ তিনি মারা যান।

ওসমানী বললেন, প্রস্তুতি যথেষ্ট নয়

ব্রিগেডিয়ার (অব.) খুরশিদ উদ্দিন



ষাটের দশকের শুরুতে নৌবাহিনীতে সূচিত বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় যুক্তদের অন্যতম সদস্য আগরতলা মামলার ৩৪ নং আসামি তৎকালীন ক্যাপ্টেন ডা. খুরশিদ উদ্দিন আহমদের (স্বাধীনতার পর ব্রিগেডিয়ার) জন্ম ১৯৩৩ সালের ১ জুন ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানায় বানশিয়া গ্রামে। বাবার নাম আবদুল কাদের। ডা. খুরশিদ ১৯৪৮ সালে লৌহজং হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ৫০ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। ডা. খুরশিদ ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়ালেখার সময় ৫২ র মহান ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহতদের লাশ পাহারা দেওয়া ও যতদূর সম্ভব আহতদের শুশ্রূষা করেছেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনার বানানোর কাজে সহযোগিতা করেন নিজ হাতে ইট বহন করে। ১৯৬০ সালে তিনি নৌবাহিনীতে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদায় মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগ দেন নৌজাহাজ (ডেস্ট্রয়ার) পি এন এস জাহাঙ্গীরে। কথিত আগরতলা মামলার ২ নং আসামি লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে একই জায়গায় থেকে কাজ করেছেন ১৯৬০ সাল থেকে। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি করাচি থেকে গ্রেপ্তার হন। শিকার হন অমানবিক নির্যাতনের। ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং পরে স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ৯০ সালে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হন এবং ওই বছরই চাকরি থেকে অবসর নেন।

গোপন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সেনা সদস্যদের সামরিক নেতা লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে একই জায়গায় চাকরি ও একই কক্ষে দীর্ঘদিন থাকার সুবাদে গোপন বিপ্লবী তৎপরতা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার কথা ব্রিগেডিয়ার (অব.) খুরশিদের। তাই তাঁর সাক্ষাতকার গ্রহণ করি ২০০৭ সালের ১৮ মার্চ দুপুরে, তাঁর ধানমন্ডি ১৫ নং (নতুন) সড়কের ২৫/৪ নং বাড়িতে গিয়ে। সাক্ষাতকারে প্রকাশ পেয়েছে ষাটের দশকের গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমি, এতে তাঁর নিজের, বঙ্গবন্ধু ও লে. মোয়াজ্জেম হোসেনের

ভূমিকা ওবন্দি অবস্থায় শারীরিক নির্যাতনের চাঞ্চল্যকর তথ্য।

স্বাধীনতার স্বপ্নজাল

ডা. খুরশিদ জানান, নৌবাহিনীর জাহাজে তিনি যেদিন যোগ দেন তার সাত দিন পর একই জাহাজে নিয়োগ পেয়ে আসেন লে. মোয়াজ্জেম হোসেন। এর আগে প্রায় ১০ বছরের চাকরিকালের প্রায় নয় বছরই তিনি (মোয়াজ্জেম) কাজ করেছেন ইংল্যান্ডে। পিএনএস জাহাঙ্গীরে যোগ দেওয়ার পর থেকে দু জনই একই কক্ষে থাকতে গিয়ে খুরশিদ মোয়াজ্জেমকে দেখেন একজন চিন্তাশীল, বুদ্ধিমান কর্মকর্তা হিসেবে। উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠে আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। ডা. খুরশিদ জানান, তিনি করাচিতে যাওয়ার পর থেকে লক্ষ্য করেন, ৬০ সালের আগে থেকেই বাংলাদেশকে স্বাধীন করা নিয়ে বিভিন্ন জনের মধ্যে কানাঘুষা চলছিল। ৪৭ এর পর থেকেই মূলত ক্ষোভটা শুরু। সবার মধ্যে আলোচনা হতো যে, বিশেষ করে নৌবাহিনীর মধ্যে স্টুয়ার্ড ও সুইপার ছাড়া কর্মকর্তা পদে বাঙালিদের যোগ্য পদে চাকরি দেওয়া হতো না বললেই চলে। যাঁরা চাকরি পেতেন তাঁদের ওপরও চলতো নিত্য অবহেলা ও দুর্ব্যবহার। এসব নিয়ে বাঙালিদের মধ্যে ক্ষোভ ও বিদ্রোহের আগুন দানা বাঁধছিল তখন থেকে। ডা. খুরশিদ-মোয়াজ্জেমের ভেতরেও পাকিস্তানিদের প্রতি ক্ষোভ ও তাদের বিরুদ্ধে কিছু একটা করার মনোভাব উপলব্ধি করেন তাঁর নানা প্রশ্নবোধক কথা বার্তায়। ডা. খুরশিদ বলেন, 'একদিন মোয়াজ্জেম আমাকে প্রশ্ন করেন, 'দেখ ডক. (ডাক্তার খুরশিদ উদ্দিনকে তখন 'ডক' বলেই ডাকতেন মোয়াজ্জেমসহ কেউ কেউ) মনে কর আমাদের এই জাহাজটা কোনো জায়গায় আটকা পড়ে এটি একটি স্বাধীন দেশ হয়ে গেল, তাহলে কি করবে? বলেছিলাম, 'আমরা এই জাহাজেই থাকব। এখানে, যে কজন সিপাই থাকবে তাঁদের নিয়ে আমরা স্বাধীনভাবে চলবো।'

মোয়াজ্জেমের আর একদিনের প্রশ্ন ছিল, 'ডক, কেউ যদি আমাদের সেন্ট মার্টিন দ্বীপটি দিয়ে দেয়, তাহলে কি হবে বা করবে।' আমার জবাব ছিল, 'এটা স্বাধীন দেশ হয়ে যাবে, একটা নতুন পতাকা বানিয়ে আমরা এটাকে স্বাধীনভাবে চালাবো।'

এর প্রায় দু'সপ্তাহ পর মোয়াজ্জেমের তৃতীয় প্রশ্ন, 'দেখ, যদি কেউ পূর্ব পাকিস্তানকে আমাদের হাতে দিয়ে দেয় তখন তুমি কি করবে?' আমি বললাম 'পূর্ব পাকিস্তানকে তো কেউ দেবে না, এটা পাকিস্তানদের হাত থেকে আলাদা করে নিতে হবে।' তখন মোয়াজ্জেম বলেছিলেন, 'তাহলে দেশটা কি রকম হবে? এর শাসনতন্ত্র কি রকম হবে এসব নিয়ে একটা আর্টিকেল লেখ।''

ব্রিগেডিয়ার (অব.) খুরশিদের মতে, এভাবে তরুণ সেনা কর্মকর্তাদের মনে বাংলার স্বাধীনতার স্বপ্ন ডানা মেলতে থাকে এবং তাঁরা পরস্পর আলোচনার ভিত্তিতে খুঁজতে থাকেন তাঁদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক কান্ডারি। কারণ জনগণের মনোভাব বুঝতে পারেন এবং সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন এমন কান্ডারি ছাড়া স্বাধীনতার স্বপ্ন এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে কে হতে পারেন সে রকম নেতা–ভাবছিলেন ডা. খুরশিদ আর সেই নেতার কথা তিনি জানতে পারেন ১৯৬২ সালে।

যে কারণে শেখ মুজিব

ব্রিগেডিয়ার (অব.) খুরশিদ বলেছেন, "সেই নেতার সন্ধান পাওয়া যায় কিছুদিনের মধ্যে। আর তিনি হলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬২ সালে একদিন লে. মোয়াজ্জেম আমাকে বললো, ডক. শেখ সাহেব করাচিতে আসছেন একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছে বা পরিকল্পনার কথা জানাতে চাই। কারণ হিসেবে সে বললো, 'দেখ, পূর্ব বাংলায় অনেক নেতা আছে ঠিকই। কিন্তু শেখ সাহেবই একমাত্র নেতা যাঁর সঙ্গে স্বাধীনতার ব্যাপারে কথা বলা যায়, কারণ সোহরাওয়ার্দী সাহেব পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হোক তা চান না। একে ফজলুল হকও চাইবেন না। মাওলানা ভাসানীও কখনো এদিক, কখনো ওদিক কথা বলবেন। বলবেন এক রকম, করবেন আর এক রকম। কিন্তু আমাদের বেলায় এ রকম হলে চলবে না। আমাদের এমন একজনকে প্রয়োজন, যিনি সত্যিকার অর্থে বাঙালি জাতীয়তাবাদী মানসিকতা সম্পন্ন হবেন এবং সত্যিকার অর্থেই স্বাধীনতা চাইবেন। সেই চেতনা শেখ মুজিবেরই আছে। আর এজন্যই আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।

মুজিব বললেন, 'তোরা ভাবিস না'

এ পর্যায়ে শেখ সাহেবের সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন হয় করাচিতে চ্যাট্যারিং অফিসার লে. মোজাম্মেল হোসেনের (রাজসাক্ষী) বাসায়। সেখানে মোয়াজ্জেম আমাদের মনোভাব শেখ সাহেবকে বুঝিয়ে বললে শেখ সাহেবও খুশি হয়ে বলে উঠলেন, "আমিও তো এ ব্যাপারে বহুদিন ধরে ভাবছি। আমার মনেরও একটাই চিন্তা কীভাবে দেশকে স্বাধীন করা যায়। তোরা কি পারবি কাজ করতে?' আমরা বললাম, 'আমরা পারবো স্যার। কারণ যে করেই হোক, দেশ স্বাধীন করতে হবে।' তিনি জানতে চান, 'তোরা আমার কাছে কি চাস?' আমরা বললাম, 'যেদিন আমাদের কাজ অর্থাৎ বিদ্রোহের দিন ঠিক হবে, সেদিন পাবলিক (জনবল) দিয়ে সাহায্য করতে হবে।' এ ছাড়া আনুষঙ্গিক অন্যান্য কিছু বিষয়েও আলোচনা হলো। শেখ সাহেব বললেন, 'তোরা ভাবিস না, ওইদিন ঢাকার রাস্তায় এক লাখ লোক নামিয়ে দেব আমি।

টাকা পয়সার ব্যাপারে যা যা লাগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে বলবি। সিএসপি, রুহুল কুদ্দুস, আহমদ ফজলুর রহমান- তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখবি, তাঁরাও সাহায্য করবেন।' সেই বৈঠকের পরে তিনি চলে গেলেন। তিনি রাজনীতিক হিসেবে খুবই ব্যস্ত থাকতেন নানা কাজে। তাই আমরা সরাসরি যোগাযোগ রাখতে পারতাম না। তবে মোয়াজ্জেম সব ব্যবস্থা করতো। সে খুব গোপনীয়ভাবে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ রাখতো। তবে কার কার সঙ্গে, কখন কি হচ্ছে তা কাউকে বলতো না।"

মোয়াজ্জেমের নানা তৎপরতা

শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাঁর কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেয়ে মোয়াজ্জেমের মধ্যে স্বাধীনতার লক্ষ্যে কাজ করার স্পৃহা বহুগুণ বেড়ে যায়। এদিকে ১৯৬৩ সালে মোয়াজ্জেম হোসেনকে সাব মেরিনে বদলি করে আমেরিকা যাওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়। সে সময় এটাকে খুবই সম্মানের মনে করা হতো। কিন্তু মোয়াজ্জেম সেখানে যেতে রাজি ছিলেন না, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দিতে পারে এই আশঙ্কায়। ওই নিয়োগ ছিল তিন বছরের জন্য। তাঁর মনে হলো, তিন বছর অনুপস্থিতিতে তাঁদের কাজ অনেকটা পিছিয়ে যাবে। খুরশিদ উদ্দিনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এর আগে থেকেই মোয়াজ্জেমের একটি চোখ ছিল নষ্ট। বিভাগের চিকিৎসক হিসেবে সেটা জানতেন ডা. খুরিশদ। তিনি তা গোপন রেখে মোয়াজ্জেমকে মেডিকেল ফিটনেসে 'ই' ক্যাটাগরিতে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তাব এলে মোয়াজ্জেম ডা. খুরশিদকে অনুরোধ করেন তাঁর চোখের সমস্যাটা প্রকাশ করে তাঁকে যেন সাব মেরিনের জন্য আনফিট দেখান হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক হিসেবে খুরশিদ উদ্দিন মোয়াজ্জেমকে 'ডাউন ক্যাটাগরিতে' ফেলেন। ফলে তাঁকে আমেরিকা পাঠানোর প্রস্তাব বাতিল করে করাচিতে 'পিএনএস কারসায নামে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সংস্থাপন বিভাগে বদলি করা হয়। এতে বরং তাঁর বিভিন্ন জনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও সংগঠিত করার বাড়তি সুযোগ সৃষ্টি হয়।

লে. মোয়াজ্জেমসহ তাঁদের দলের সদস্যরা কর্মস্থল ত্যাগ করে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোথাও গেলে ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। গন্তব্যস্থলে রওনা দেওয়ার আগ মূহূর্ত পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও জানাতেন না কোথায় যাবেন বা যাচ্ছেন। এ রকম গোপনীতার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ব্রিগেডিয়ার (অব.) খুরশিদ জানান '১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের কয়েকদিন আগের ঘটনা। রাত ১১ টার পর মোয়াজ্জেম আমাকে টেলিফোন করে বললো, 'খুরশিদ তোমার মোটর সাইকেলটা নিয়ে এখনই আমার বাসায় চলে আস।' আমি রাত প্রায় ১২ টায় তাঁর বাসায় পৌঁছি। নিজেদের নানা বিষয়ে আলাপের পর রাত প্রায় তিনটার দিকে সে আমাকে বললো, তাঁকে করাচি বিমান বন্দর নিয়ে যেতে হবে। সে কে এম কোরেশী নামে অর্থাৎ ভুয়া নামে একটা টিকেট নিয়ে ঢাকায় রওনা দেয় ৬৫ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। ৫ সেপ্টেম্বর রাতেই সে ঢাকা থেকে করাচি ফিরে যায়। এরপরে আমার কাছে খুলে বলে ঢাকায় কেন এসেছে কার সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং কী কথা হয়েছে। জানিয়েছিল ঢাকায় ৫ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয়ে সিএসপি রুহুল কুদ্দুস ও আহমদ ফজলুর রহমানের সঙ্গে সে সাক্ষাৎ করে এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য তাঁর নিজস্ব কিছু প্রস্তাব গঠনতন্ত্র আকারে তুলে ধরেছে। প্রস্তাবের মধ্যে ছিল সামরিক বাহিনীতে সিপাহী ও জেনারেলের মধ্যে বেতনের দিক থেকে খুব বেশি তারতম্য থাকবে না। সবাই বিনামূল্যে খাদ্য পাবে, দেশের পতাকা হবে চার রঙের এবং দেশটা হবে অনেকটা সমাজতান্ত্রিক

প্রকৃতির। তার এরকম প্রস্তাব পাওয়ার পর তাঁরা (রুহুল কুদ্দুস ও আহমদ ফজলুর রহমান) খুশি হন এবং এ ব্যাপারে আরো কি কি প্রয়োজন জানতে চান। মোয়াজ্জেম তখন টাকা পয়সা ও অস্ত্রের যোগানের কথা বলেন। তাঁরা এসব ব্যাপারেও কোনো সমস্যা হবে না বলে আশ্বাস দেন। এদিকে মোয়াজ্জেম ঢাকা থেকে করাচি ফেরার কয়েক ঘন্টা পরই ৬ সেপ্টেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ বেঁধে যায়। সে যদি পাঁচ তারিখ না ফিরে ছয় তারিখও ফিরতো তাহলে তখনই ধরা পড়তে পারতো এবং অঙ্কুরেই সব শেষ হয়ে যেত।'

৬৫ সালের যুদ্ধের পর শেখ মুজিবের পরামর্শে সংশ্লিষ্টরা কিছুদিন চুপ থেকে ধীরে ধীরে আবারো তাঁদের তৎপরতা শুরু করে। এরপর মোয়াজ্জেমসহ অন্যরা চেষ্টা তদবির করতে থাকেন যাতে ঢাকায় বদলি হয়ে এসে এখানে তাঁদের সমর্থক-সদস্য সংখ্যা বাড়ানো যায়। ১৯৬৬ সালে মোয়াজ্জেম বাংলাদেশে এসে নৌ বাহিনীর জাহাজ পিএনএস বখতেয়ার যোগ দেন।

ছিলেন এমএইচ খান-মাহবুবুর রহমানও

নৌ ঘাঁটিতে বেশ কিছু 'এমপিবিএস ট্যাংক ছিল যা ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় চীন উপহার হিসেবে দিয়েছিল পাকিস্তানকে। এসব ট্যাংকের দায়িত্বে ছিলেন একজন বাঙালি রিসালদার একেএম শামসুল হক। (২০ নং আসামি) তিনি বলেছিলেন, 'কার্যক্রম শুরু হলে (বিদ্রোহ) এই ট্যাংকগুলো নিয়ে ঢাকায় এগিয়ে যাওয়া আমার জন্য কোনো ব্যাপার নয়।' কারণ পূর্ব পাকিস্তানে নিজস্ব কোনো ট্যাংক ছিল না। কমান্ডার মোয়াজ্জেম বদলি হওয়ার সময় খুরশিদ উদ্দিনকে বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানে কিছু সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর চেনা পরিচয় ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। খুরশিদ সাহেব যেন তাঁর পরিচিত লোক মেজর শামসুল আলমকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেন মোয়াজ্জেম গেলে তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। খুরশিদ চিঠি লিখে দেন মেজর শামসুল আলমের উদ্দেশে। তবে চিঠিতে গোপন তৎপরতা সম্পর্কে সরাসরি কোনো ধারণা দেওয়া হয়নি। শামসুল আলম ছিলেন চিকিৎসা কোরের লোক। মোয়াজ্জেম মেজর শামসুল আলমের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের লক্ষ্য এবং এ নিয়ে চলমান তৎপরতার বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতা চান। পরে খুরশিদ জানতে পারেন, যে সময় ক্যাপ্টেন শওকত (পরবর্তী কর্নেল) লে. মাহবুবুর রহমান ও লে. নাজমুল হুদাসহ আরো কতিপয় কর্মকর্তা তাঁদের পরিকল্পনার সঙ্গে একমত হয়ে গোপন আন্দোলনে জড়িত হন। খুরশিদ উদ্দিনের মতে, শামসুল আলমের মাধ্যমে ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান বিষয়টি জেনেছিলেন। ৬০ সালের দিকে এম এইচ খানও (পরবর্তীতে অ্যাডমিরাল) কোনো না কোনভাবে জড়িত ছিলেন এ রকম কর্মকাণ্ডে। হয়তো কারো মুখ থেকে বেরোয়নি বলে তাঁদের কথা জানাজানি হয়নি। ধরাও পড়েননি।

জিয়া বললেন, 'তোমরা গাদ্দার'

খুরশিদ উদ্দিনের চাকরি পশ্চিম পাকিস্তানে থেকে গেলেও ছুটি নিয়ে মাঝে মধ্যে আসতেন বাংলাদেশে এবং সুযোগ মতো দেখা করতেন সতীর্থদের সঙ্গে। যেমনটি তিনি জানান, "১৯৬৬ সালে আমি একবার ঢাকায় এলে চট্টগ্রামে বেড়াতে যাই এবং মোয়াজ্জেমের

বাসায় উঠি। ৬৭ সালেও একবার চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম। তখন মোয়াজ্জেম ছাড়াও আরো অনেক কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা হয় সেখানে। তাঁদের সঙ্গে আমাদের লক্ষ্যের কথা খুলে বলে আমাদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে কেউ কেউ রাজি হয়েছেন, আবার কেউ কেউ এসব কাজ ঝুঁকিপূর্ণ বলে জড়িত হতে রাজি হননি। কেউ কেউ বললেন, 'এখন কিছু বলব না, যখন আসল কাজ শুরু হবে এবং যখন দরকার হবে তখন প্রয়োজনে গোটা ইউনিট নিয়ে নেমে পড়ব।' তবে এমনও কেউ কেউ ছিলেন, আমাদের প্রস্তাব শুনে আমাদেরকে 'গাদ্দার' বলে গালি দিয়েছিলেন, যেমন জিয়াউর রহমান। ১৯৬৬ সালের দিকে জিয়াউর রহমান (পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) ছিলেন যশোরে। আমাদের আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা। তাঁকে (পরবর্তীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্ণেল' ১৯৭৫ এর ৭ নভেম্বর নিহত) পাঠিয়েছিলেন মোয়াজ্জেম। জিয়া তখন যশোর রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড। ক্যাপ্টেন হুদা জিয়াকে আমাদের চিন্তাভাবনার বিষয়টি জানিয়ে বলেছিলেন, 'স্যার আপনি যদি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন তাহলে খুবই খুশি হবো আমরা। জিয়াউর রহমান নাকি তখন অত্যন্ত রেগে গিয়ে ক্যাপ্টেন হুদাকে বলেছিলেন, 'তোমরা বড়ই গাদ্দার। এই কদিন আগে পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য (৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধে) ফার্স্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আমরা এতগুলো মেডেল পেয়েছি। আর তোমরা সেই দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাও? বিপ্লব করতে চাও—ভারতের সাহায্যে?"

খুরশিদ উদ্দিন বলেন, "কোনো বিষয়ে নেওয়া সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানানো হতো সংক্ষিপ্ত সময়ে। যেমন- ১৯৬৭ সালে একদিন মোয়াজ্জেম টেলিগ্রাম করে আমাকে বলে, 'মা গুরুতর অসুস্থ। দ্রুত চলে এসো।' আমি ছুটি নিয়ে আসতে ৪৮ ঘন্টা সময় লেগে যায়। ঢাকা এসে শুনি আমাকে নিয়ে ভারতের আগরতলা যাওয়ার জন্য একটি দল অপেক্ষা করছিল সেখানে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কথা বলার জন্য। কিন্তু আমার দেরি হওয়ায় আমাকে ছাড়াই দলটি চলে যায়। আমি তখন সিনিয়র ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার কর্মকর্তা।"

একাত্তরে ওসমানী: 'প্রস্তুতি যথেষ্ট নয়'

আগরতলা মামলার প্রায় আসামিই কখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবে এই আশায় উম্মুখ ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এবং যাঁর যাঁর অবস্থান থেকে যতটুকু সম্ভব অবদান রেখেছেন।

'৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাস। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানিদের তালবাহানার প্রেক্ষাপটে সারাদেশে টালমাটাল অবস্থা। চারদিকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ, মিছিল সমাবেশ। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মে যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ হয়তো শিগগিরই শুরু হয়ে যাবে। অনেকের মধ্যে এমন ভাবনাও আসে যে যুদ্ধ শুরু হলে নিশ্চয়ই কোনো একটি দেশ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এমন পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার জন্য প্রতীক্ষারত আগরতলা মামলার আসামিদের কয়েকজন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আবারও জানান যুদ্ধে যাবার জন্য তাঁদের আগ্রহের কথা। বঙ্গবন্ধু তাঁদের সেদিন সরাসরি কোনো নির্দেশ না দিয়ে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করার জন্য বলেন।

এ ব্যাপারে ডা. খুরশিদ উদ্দিনের স্মৃতিচারণ: "আমরা এমনিতেই বিভিন্ন সময় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। এরকম '৭১ এর ১১ ফেব্রুয়ারি সাক্ষাতের সময় সেখানে আমি ছাড়াও ছিলেন মেজর ডা. শামসুল আলম (পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্নেল (অব.), ক্যাপ্টেন এম শওকত আলী মিয়া (পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্নেল (অব.), জাতীয় সংসদ সদস্য ও ডেপুটি স্পিকার), ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা ও ক্যাপ্টেন এএনএম নুরুজ্জমান (পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ও রাষ্ট্রদূত)।

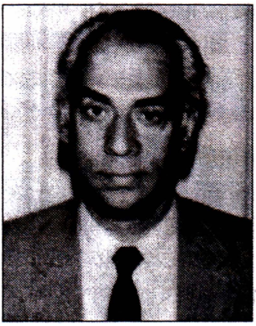
বঙ্গবন্ধু আমাদের সেদিন প্রশ্ন করেন, 'তোমাদের ড্রেস তো তৈরি আছে– পুরোনো সেই ইউনিফরমগুলো?' সিনিয়র মোস্ট হিসেবে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, স্যার, সে রকম যদি কিছু হয় এবং দিনক্ষণ ঠিক হয়, আমি– আমরা যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত।' 'বঙ্গবন্ধু তখন আমাদের বললেন, 'তোমরা যাও, ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করো।' আমরা তখন ভেবে নিলাম একটা সশস্ত্র বিপ্লব হয়তো শুরু হতে যাচ্ছে যাতে আমাদের দেশটা এবার স্বাধীন হবে। কারণ নির্বাচনে আমরা জিতলেও রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা তেমন দেখা যাচ্ছিল না। আর এজন্যই হয়তো বঙ্গবন্ধু প্রয়োজন দেখা দিলে যার যাঁর পোশাক নিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার কথা বলেছেন এভাবে। কিন্তু আমরা জনাব ওসমানীর সঙ্গে দেখা করলেও তাঁর কথায় বুঝতে পারি আমাদের যে প্রস্তুতি তা একটি নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি বললেন, 'সেপাই ছরুমিয়া তো এখনো হামাগুড়ি দিচ্ছে।' এ ব্যাপারে তাঁর (ওসমানীর) ব্যাখ্যা ছিল, 'পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ বা যুদ্ধ করতে হলে আমাদের ১১টা রেজিমেন্ট তৈরি হতে হবে এবং সবগুলো রেজিমেন্ট নিয়েই বিদ্রোহ করতে হবে। কিন্তু আমাদের তখনো রেজিমেন্ট ছিল আটটি। এরমধ্যে ৫টি ছিল বাংলাদেশে আর তিনটি ছিল পাকিস্তানে।'

অপরদিকে বাঙালিদের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব দেখে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ইভাকশন শুরু করেছে। অর্থাৎ এক একটা রেজিমেন্টের মধ্যে যদি চারটি কোম্পানি থাকে তার দুটো কোম্পানিতে থাকবে বাঙালি সিপাই, একটায় থাকবে পাঞ্জাবি সিপাই এবং আর একটাতে থাকবে পাঠান সিপাই, যাতে কোনো বাঙালি রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করতে না পারে। এ ছাড়া সে সময় ইপিআরের মধ্যেও বহু পাকিস্তানি চাকরি করতো, পুলিশেও ছিল তারা, আজাদ কাশ্মীর থেকে আনা লোকও ছিল তাদের মধ্যে। যুদ্ধ বা বিদ্রোহের আগে এসব বিষয় বিবেচনার প্রয়োজন।"

মুক্তিযুদ্ধে খুরশিদ যে পরিস্থিতিতেই হোক ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে এতে আগরতলা মামলায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত প্রায় সবাই অংশ নেন। অংশ নেন ডা. খুরশিদ উদ্দিনও। প্রথমদিকে কেরানীগঞ্জ থানার মধ্য রোহিতপুর গ্রামের আগলা নামক স্থান থেকে বেসামরিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সঙ্গে থেকে কাজ করেন। মে মাসে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ১ নম্বর সেক্টরে যোগ দেন প্রথমে মেজর জিয়াউর রহমান ও পরে মেজর রফিকুল ইসলামের অধীনে। তাঁকে তখন মেজর পদে উন্নীত করা হয়। তবে থাকতেন প্রায় সময় বেসামরিক পোশাকে। তাঁর মূল দায়িত্ব ছিল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের চিকিৎসা দেওয়া ও তদারকি করা। যুদ্ধের শেষ দিকে ডা. খুরশিদ আগরতলায় সহকারী মেডিকেল পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৬ পুলিশ সুপার ও ১৩ জেলা প্রশাসকের সমর্থন ছিল

কমান্ডার (অব.) আব্দুর রউফ



ছাত্রাবস্থা থেকেই স্বাধীনতাপ্রিয় ও প্রতিবাদী চরিত্রের অধিকারী অবসরপ্রাপ্ত নৌবাহিনীর কমাণ্ডার আবদুর রউফের জন্ম ১৯৩৩ সালের ১১ নভেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব পৌর এলাকায়। তাঁর বাবা আলহাজ আবদুল লতিফ ছিলেন স্থানীয় পৌরসভার চেয়ারম্যান। আবদুর রউফ ভৈরব কেবি উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালে ম্যাট্রিক, ৫৩ সালে ঢাকা সরকারি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক ও ৫৫ সালে ঢাকা সরকারি কলেজ থেকে স্নাতক পাস করেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ এবং ৬১ সালে ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণালয় থেকে বিএড পাস করে উপাধ্যক্ষ পদে ঢাকার শাহীন স্কুলে যোগ দেন। মূলত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে মাথায় রেখেই ১৯৬২ সালে শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে তিনি যোগ দেন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে। নৌবাহিনীতে থাকা অবস্থায় তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার গোপন আন্দোলনে যুক্ত হন এবং ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি (ঈদের পরদিন) করাচির বাসা থেকে গ্রেপ্তার হন। তিনি ছিলেন আগরতলা মামলার ৩৫ নম্বর আসামি। দীর্ঘ প্রায় ১৪ মাস কারাবাস ও বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ভোগ করার পর উনসত্তরের ২২ ফেব্রুয়ারি অন্য বন্দিদের সঙ্গে মুক্তি পান। পরবর্তী সময়ে (স্বাধীনতার আগে) তিনি নরসিংদী কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৭২ সালের আগস্টে স্বাধীন বাংলাদেশের নৌবাহিনীতে যোগ দিয়ে নৌবাহিনী পুনর্গঠনে অবদান রাখেন এবং ৭৩ সালে কমাণ্ডার পদে উন্নীত হন। ৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি আবার গ্রেপ্তার হন। ৭৬ সালে মুক্তি পেয়ে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দিয়ে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব আবদুর রউফ ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন 'গণফোরাম' গঠনে ভূমিকা পালন করেন এবং দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য হন। ঘাত-প্রতিঘাতময় নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ কমাণ্ডার রউফের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি ২০09 সালের ৩ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটায়, ঢাকার উত্তরায় তাঁর ১৩ নম্বর সেক্টরের বাড়ি 'আনন্দ ভৈরব'এ বসে।

যে কারণে নৌবাহিনীতে যোগ দেন

উচ্চশিক্ষা নিয়ে শিক্ষকতার মতো মহান পেশা ছেড়ে নৌবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পটভূমি ব্যাখ্যা করে কমাণ্ডার (অব.) আবদুর রউফ জানান, ছাত্রাবস্থায় তিনি তাঁর এক চাচা জিন্নাত আলী (পরবর্তীতে যুগ্ম সচিব) সহ তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত প্রগতিশীল ছাত্রদের সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের কয়েকজন কর্মীর সংস্পর্শে আসেন। অন্যদিকে তাঁর (রউফের) বাবা ছিলেন মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বাবা-চাচাসহ স্থানীয় কিছু রাজনীতি সচেতন ব্যক্তির মধ্যে অবিভক্ত ভারতে স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব গ্রহণ না করা যে যুক্তিযুক্ত হয়নি, এ নিয়ে অনুষ্ঠিত যুক্তিতর্ক তিনি মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করতেন। কিশোর বয়সে পাঠ্যবইয়ে শিবাজীর স্বাধীনতা যুদ্ধ, খণ্ড খণ্ড স্বাধীনতা যুদ্ধ ও অন্যান্য ছোটখাটো আন্দোলনের কথা পড়ে নিজের মধ্যেও দেশের জন্য কিছু একটা করার প্রত্যয় জাগে তাঁর। উচ্চমাধ্যমিকে পড়ার সময় ঢাকা কলেজ ছাত্রসংসদের ক্রীড়া সম্পাদক এবং বিএ পড়ার সময় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হন। ভৈরব অঞ্চলে আওয়ামী লীগের গোড়াপত্তনের পর আবদুর রউফের এক বন্ধু জহিরুল হক নবগঠিত আওয়ামী লীগের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল আওয়ামী লীগই বাঙালি জাতিকে মুক্তির পথ দেখাতে পারবে। তাঁর সঙ্গে সে সময় একমত পোষণ করেন কিশোর আবদুর রউফ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের প্রতি আবদুর রউফের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় ১৯৫০ সালে। বললেন, “১৯৫০ সাল। আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। ভৈরবে আওয়ামী লীগের জনসভায় মাওলানা ভাসানীসহ কেন্দ্রীয় নেতারা আসবেন। তাই আমরা সবাই দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে প্রস্তুতিমূলক কাজ করছি। আমাদের কাজের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলেজ হোস্টেল। পোস্টার লেখা, প্ল্যাকার্ড বানানোসহ প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের আলোচনার মুহূর্তে কক্ষে ঢুকলেন এক দীর্ঘদেহী সুদর্শন যুবক। পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। প্রথম দর্শনেই তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অল্পক্ষণের মধ্যে এই আগন্তুকের সঙ্গে আমাদের সবারই আলাপ হয়ে গেল। সভার স্থান, স্টেজের অবস্থা, মাইক, পোস্টার ফেস্টুন, নেতাদের অভ্যর্থনাসহ কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং টাকা পয়সা কী রকম যোগাড় হয়েছে ইত্যাদি আলাপের মধ্য দিয়ে আমাদের একজনে পরিণত হন তিনি। তরুণ নেতা মুজিব ভাইকে কাছে পেয়ে আমাদের কাজের উৎসাহ কয়েকগুণ বেড়ে গেল। এক পর্যায়ে তিনি কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ছাত্রকর্মী হায়দারের হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, ‘তোরা কিছু খেয়ে নিস।’ ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীত্ব লাভ, পরে আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ ইত্যাদি ঘটনা আমি সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান এবডোর (Elective Bodies Disqualification Order EBDO) মাধ্যমে যখন প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতার মাথা নিচু করে ফেলেছিলেন,

তখন অধিকারহারাদের পক্ষে আইউবের অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শেখ মুজিবই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এবডো বিরোধী মামলা করে তিনি জয়ী হন। তখন থেকে আমার মনে স্পষ্ট ধারণা জন্মে, এই আপসহীন নেতাই একদিন বাঙালির মুক্তির লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসবেন। ৫৭-৬১ সালের দিকে রেজা আলী, কম্যুনিস্ট পার্টির মর্তুজা খান প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় আমি একাধিকবার বলেছি 'দেখো ইস্ট পাকিস্তান একদিন স্বাধীন হবে। আর এর নেতৃত্ব দেবেন শেখ মুজিব।'

কিশোর বয়সেই আমার মনে হয়েছিল বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়াই হবে উৎকৃষ্ট কাজ। এ ভাবনা থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পরই আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য পরীক্ষা দিই। কিন্তু অকৃতকার্য হই। পরে শিক্ষকতা পেশায় গিয়ে পরিতৃপ্ত হতে না পেরে আবারও নৌ-বাহিনীর এডুকেশন কোরে যোগ দিই।"

প্রতিবাদী রউফ

আবদুর রউফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নৌবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পরপর তাঁকে করাচিতে নৌবাহিনীর সদর দপ্তরে পাঠানো হয় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য। করাচির মনোরা দ্বীপে পিএনএস হিমালয়াতে শুরু হয় তাঁর নাবিক জীবন। সেখানে কাজ করতে গিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি অন্যান্য বাঙালিদের মতোই শিকার হন নানা অপ্রীতিকর আচরণের। অভ্যাসমতো ভাতের ব্যবস্থা না হওয়ায় প্রথম দিকেই চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললে, শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ভাতের ব্যবস্থা করেন। হিমালয়ার পর বিএনএস কারসাযে প্রশিক্ষণ চলাকালে বাঙালিদের উদ্দেশে এক পশ্চিমা কর্মকর্তার বিদ্রুপাত্মক মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অবসরপ্রাপ্ত কমাণ্ডার রউফ বলেন, "পিএনএস কারসায মূলত টেকনিক্যাল অফিসারদের ট্রেনিং স্টাবলিশমেন্ট। সেখানে ট্রেনিং কমাণ্ডারের নেতৃত্বে প্রতি বৃহস্পতিবার এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হতো। এরকম একটি আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল 'পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা।' ওই দিনের মূখ্য আলোচক ছিলেন একজন বাঙালি লেফ্টেন্যান্ট জোহা। ট্রেনিং ইউনিটের কমাণ্ডার, অন্যসব ইউনিটের বড় কর্তা ও নাবিকসহ প্রায় চার শ ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

লে. জোহার প্রাথমিক আলোচনার পর প্রশ্নোত্তর পর্বে পশ্চিমা কর্মকর্তারা পূর্ব পাকিস্তানের ভেড়ামারা মালটিপারপাজ প্রজেক্টের ওপর কিছু প্রশ্ন করলে লে. জোহা তার সঠিক উত্তর দিতে পারছিলেন না। এতে পশ্চিমাদের মধ্যে হাসাহাসি ও কানাঘুষা শুরু হয়। অন্যদিকে আমরা প্রশিক্ষণাধীন কর্মকর্তাদের প্রতি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল 'keep your Eyes, ears open and Bloody mouth shut'. জোহা সাহেবের অপারগতায় লজ্জা ও রাগে আমার মন খুব খারাপ হয়ে ওঠে। আমি তাঁর হয়ে কিছু বলার অনুমতি চাইলে কমাণ্ডার আশরাফ অনুমতি দেন। ভেড়ামারা হাইড্রোইলেকট্রিক প্রকল্প এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার হারসহ টুকিটাকি আমার জানা ছিল এবং এ সম্পর্কে প্রশ্নের সহজেই উত্তর দিই। এমন

সময় এক দাঁড়িঅলা লে. কমাণ্ডার প্রশ্ন করেন 'In East Pakistan which port is most interesting from a sailors point of vew, who is coming ashore after months of sea voyage?' অর্থাৎ মাসের পর মাস সমুদ্র যাত্রা করে তটে আসার পর একজন নাবিকের দৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের কোন বন্দর সবচেয়ে আকর্ষণীয়। তাঁর প্রশ্নে কিছু শ্লেষ ও অশালীন ইঙ্গিত আছে বলে আমার মনে হওয়ায় আমি ক্ষিপ্ত হয়ে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করি 'Gay girl? you mean woman?' একটু সময় নিয়ে গম্ভীরভাবে বললাম, 'East Pakistan is a place where you cannot parchase women like here' আমার কথা শুনে উপস্থিত অনেকে ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে আমার দিকে চোখ বড় করে তাকায়। এ সময় আমি চাকরির কথা ভুলে গিয়ে নাবিকদের সামনেই বলে ফেলি 'পূর্ব-পাকিস্তান জাতিগতভাবে শোষিত হচ্ছে, আর শোষণ চালাচ্ছে পাঞ্জাবিরা। শুধু পূর্ব পাকিস্তানই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু অঞ্চলকেও এরা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে। অথচ এই পাঞ্জাবিরা বৃটিশ আমলে নিষ্ঠার সঙ্গে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর গোলামি করেছে।' আমি একটু থামতেই একজন প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি মনে করেন এ ধরনের ক্ষোভ আর হতাশার কারণে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে?' 'আমি বললাম, 'না, সেটা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ বেশ ধর্মভীরু। তবে বর্তমানে আপনারা যেভাবে চালাচ্ছেন এরকম চলতে থাকলে পাকিস্তান শিগগিরই বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়বে এটা নিশ্চিত।'
সেদিন আমার বক্তব্য শুনে বাঙালি শুভাকাঙ্ক্ষী কয়েকজন অফিসার ও নাবিক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন আমার কোর্ট মার্শালে শাস্তি অথবা চাকরি চলে যাবার আশঙ্কায়। বাঙালি অফিসার লে. কর্নেল ফারুক আমাকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন 'এত রূঢ় সত্য কথা সব সময় বলা যায় না।' আলোচনার অল্পক্ষণ পর এডুকেশন ব্রাঞ্চের কমাণ্ডার শুকুরুদ্দিনের কক্ষে আমাকে ডেকে নিয়ে কমাণ্ডার ডা. পল নানা প্রশ্ন ও বকাঝকা করেন।"

কমাণ্ডার আবদুর রউফ জানান, তিনি করাচিতে অবস্থানকালে আরও বহু ঘটনার কথা জানেন, যাতে বলা যায়, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বাঙালিদের ওপর যে জাতিগত নিপীড়ন চালানো হচ্ছিল তা প্রকট আকারে দেখা গিয়েছিল সশস্ত্র বাহিনীতেও। সঙ্গত কারণেই বৈষম্যের শিকার বাঙালি নাবিকেরা প্রতিবাদের ভাষা খুঁজতো। রউফের প্রতিবাদী কণ্ঠ সেদিন অনেকের কাছে তাই প্রশংসিত হয়েছিল।

পশ্চিমাদের নিপীড়ন

প্রশিক্ষণ শেষে কমাণ্ডার রউফ নিয়োগ পান মনোরা দ্বীপেরই আরেকটি নৌ-ঘাঁটি পিএনএস বাহাদুরে। সেখানে অনেকের মধ্যে বাঙালি অফিসার ছিলেন মাত্র চারজন। সংখ্যায় কম হওয়ায় নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা জমছিল বেশ। দিনের দায়িত্ব পালন শেষে অবসরে তাঁরা পাকিস্তানিদের নানা অন্যায় আচরণ এবং এ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা করতেন। লে. মতিউর রহমান ও আবদুর রউফ একই কক্ষে পাশাপাশি কাজ করার সুবাদে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হতো সবচেয়ে বেশি।

৬৪ সালে কমাণ্ডার রউফের বাবা মারা যাওয়ার পর ছোট ভাই বোনদের কথা চিন্তা করে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে বদলি চেয়ে আবেদন করেন এবং মার্চেই করাচি থেকে এসে চট্টগ্রামের পিএনএস বখতিয়ার ঘাঁটিতে ট্রেনিং ইন্সট্রাক্টর হিসেবে যোগ দেন। যদিও এখানে ট্রেনিং দেওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই তিনি ঘাঁটিতে থাকা গ্রন্থাগারটি মানসম্মত বইয়ে সমৃদ্ধ করার দিকে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু এখানেও কিছুদিনের মধ্যে দেখেন বাঙালি নাবিকদের ওপর অত্যাচারের নানা চিত্র। সে সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়োগ পাওয়া নাবিকদের কিছুদিন চট্টগ্রামে রেখে পরে জাহাজে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হতো। ওইসব তরুণ নাবিকদের দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল রউফের ওপর।

কমাণ্ডার রউফ তরুণ নাবিকদের ওপর পশ্চিমাদের অন্যায় নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে বলেন, "ওদের সুবিধা অসুবিধা দেখতে গিয়ে আমি দেখি বাঙালি নাবিকদের ওপর অমানবিক এবং অযৌক্তিক উৎপীড়ন চালাতো নৌবাহিনীর উর্ধ্বতন পশ্চিমা কর্মকর্তারা। তাঁদের (নাবিকদের) যা কাজ নয় তা তাঁদেরকে দিয়ে করানো হতো। কারণে-অকারণে অকথ্য ভাষায় গালাগাল ও অহেতুক শাস্তি দেওয়া হতো। অনেক সময় তাদের আচরণ এমন অমানবিক হতো যে ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। তখন আমার কান্না পেত। একদিন আমি এসব সহ্য করতে না পেরে নির্বাহী কর্মকর্তা লে. কমাণ্ডার সাইদের কাছে বিষয়টি জানালে তিনি তা সুরাহার ব্যবস্থা তো করলেন না, উল্টো আমার সাথেও দুর্ব্যবহার শুরু করেন। এরপর আমি বাঙালি নাবিকদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম, 'তোমরা নিজেরা নিজেদের দাবি বা অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারা কেউ কিছু করে দিতে পারবে না। দৃঢ় মনোবল নিয়ে আমাদের অবশ্যই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।' একদিন লে. কমাণ্ডার সাইদ আমার পোশাকের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে আমি তাঁর পোশাকের চাইতে আমার পোশাক অধিক পরিষ্কার বলে মন্তব্য করি। এতে শাস্তি হিসেবে আমাকে তিনদিন ঘাঁটির বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি। চাকরিতে দুবছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় আমি নিশ্চিত হলাম পশ্চিমাদের সঙ্গে কোনোক্রমে বেশিদিন থাকা যাবে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর বিকল্প নেই।"

ছয় দফায় আলোকিত

১৯৬৫ সালের মার্চ থেকে ৬৬ সালের জুন পর্যন্ত কমাণ্ডার রউফ ঢাকায় নেভাল রিক্রুটিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় তিনি দেখেছেন কিভাবে অবাঙালি ডাক্তারেরা বাঙালিদের শারীরিকভাবে অযোগ্য ঘোষণা করে সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান থেকে বিরত রাখতেন। এ সময় ঢাকায় থাকার সুবাদে তিনি নৌবাহিনীর বাইরের জগতের ঘনিষ্ঠ কিছু লোকের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পেতেন। বিভিন্ন জনের কাছে এমনকি মুসলিম লীগ ঘরানার কোনো কোনো নেতৃস্থানীয় লোকজনের কাছেও তিনি প্রশ্নের সুরে শুনতে পান, 'পূর্ব পাকিস্তান নাকি পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাবে।'

কমাণ্ডার রউফ বলেন, '১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার অরক্ষিত অবস্থার কথা ভেবে অন্য অনেকের মতো আমিও শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, অর্থনৈতিক

উন্নয়ন আর নিরাপত্তার স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা অবস্থান নিতে হবে। ৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের লাহোরে ঘোষিত ছয় দফা বাঙালিদের প্রাণের দাবি বলে বিবেচিত হয় এবং আমাকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে। এতদিন ধরে এগিয়ে চলার মতো, কিংবা দেশ সঠিকপথে চলতে পারে তেমন কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। মওলানা ভাসানীর পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতি বহুল আলোচিত 'আসসালামু আলাইকুম' আমার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। এতে ভাসানী কতটা স্বায়ত্বশাসন বা স্বাধীনতা বুঝিয়েছেন স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু শেখ মুজিবের ছয় দফাকে পূর্ব বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার এবং পশ্চিমাদের শাসন শোষণ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় বলে আমার মনে হয়েছে। শেখ মুজিবের মধ্যে জন্মভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠার আলোকবর্তিকা বহনকারীর নিশানা আমি দেখতে পাই। এ পর্যায়ে রিক্রুটিং অফিসার হিসেবে বাঙালি তরুণদের আমি বোঝাতাম বাঙালি হিসেবে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু করতে চাইলে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিয়ে সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। সম্ভবত এসব কথা কোনো না কোনোভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কানে গিয়ে থাকবে।

এক দফার জন্য তৎপরতা

৬৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমাকে ঢাকার সেনা ও নৌবাহিনীর রিক্রুটিং অফিস থেকে করাচির কারসাযে বদলি করা হয়। সপরিবারে উঠার মতো জায়গা না থাকায় বন্ধুবর লে. মতিউর রহমান তাঁর বাসার অর্ধেক আমাকে ছেড়ে দেন। তিন মাস তাঁর সঙ্গে থাকি। লে. মতিউর রহমান আর আমি একই অফিসে বসতাম। সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। তবে এক পর্যায়ে তাকে প্রায় সময় আনমনা, চিন্তামগ্ন, কখনো কখনো বিষণ্ন মনে হতো। কৌতুহল দমন করতে না পেরে একদিন কি হয়েছে জানতে চাইলে বললেন, 'পেটে কথা রাখতে পারলে বলবো।' তবে কয়েকদিন চেপে গেলেন। শেষে আমার চাপাচাপিতে বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গুরুতর। এক দফার দাবি উঠেছে। অনেকে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা করতে চায়। করাচিতেও এর সপক্ষে কাজ চলছে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কিছু সামরিক-বেসামরিক লোক ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। এই মুহূর্তে নাম বলবো না, তবে আমিও এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি।' তাঁর এসব কথা শুনে আমি আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়ি। সশস্ত্র বাহিনীতে এমন এক ঘটনা চলছে, আমি জানি না। অথচ এ সবই আমারও প্রাণের কথা। আমার নীরবতা দেখে লে. রহমান নীরবতার কারণ জানতে চান। বললাম, 'কথাগুলো তো শুনলাম, একটু ভেবে নিই।' এর কিছুদিনের মধ্যে আমিও তাঁর সঙ্গে মিলে আসল কাজ তথা এক দফার কাজে তৎপর হই।'

কমাণ্ডার (অব.) আবদুর রউফ জানান, ৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি লে. মতিউর রহমানের সঙ্গে করাচির মার্টিন কোয়ার্টার্স-এ গিয়ে এক গোপন বৈঠকে যোগ দেন। সেখানে বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর দশ-বারো জন লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন একটি টেক্সটাইল মিলের প্রোডাকশন ম্যানেজার মাহবুবউদ্দিন চৌধুরী, লিডিং সী-ম্যান

সুলতান, বিমান বাহিনীর করপোরাল সিরাজ ও ফ্লাইট সার্জেন্ট জলিল। আলোচনার মূল বিষয় ছিল পশ্চিমাদের শাসন শোষণ থেকে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করা। তাঁদের কারো কারো বক্তব্য ছিল জ্বালাময়ী, যেন পারলে তাঁরা দেশটা মুহূর্তের মধ্যে স্বাধীন করে ফেলবেন। ওই বৈঠকে করপোরাল সিরাজ বলেছিলেন, 'এই আন্দোলনের সবচেয়ে কঠিন কাজটা যেন তাঁকে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত সিরাজ আগরতলা মামলায় সরকারি পক্ষে সাক্ষী হয়েছিলেন। কমাণ্ডার রউফের মতে, বৈঠকে উপস্থিত সবার মধ্যে দেশের জন্য মহৎ কিছু করার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলেও অনেককেই আবেগতাড়িত ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যহীন মনে হয়েছে। রাজনীতি সম্পর্কেও তাঁদের তেমন ধারণা ছিল না। পরিণতি সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন নন। এ ধরনের সভায় নতুন আগন্তুক হিসেবে নিজে সব কিছু বোঝার চেষ্টা করছেন। এক পর্যায়ে তিনি এ ঘটনা কর্তৃপক্ষ জানলে, চাকরি যাওয়াসহ পরিবারের ক্ষতি হতে পারে এমন কথা বললে, সবাই ক্ষেপে যান। সংশ্লিষ্টদের আবেগের কথা ভেবে তিনি সেখানে আর কোনো বক্তব্য রাখেননি। তবে পরে আজ হোক কাল হোক ধরা যে পড়তে হবে সে কথাটি লে. রহমানকে স্মরণ করিয়ে বলেছিলেন, 'একজন অফিসার হিসেবে আমার দায়িত্ব–এ সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা। কিন্তু আমি যেহেতু স্বাধীন বাংলা আন্দোলনকে সমর্থন করি এবং এর পেছনের কারণগুলোও যথার্থ মনে করি তাই সেটা আমি করবো না।' কমাণ্ডার রউফ বললেন, 'এ পর্যায়ে লে. রহমান কী করা যায় জানতে চাইলে, আমি তাঁকে বলি যে, সূর্যসেনের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধানতা আসেনি। তবে এ ঘটনা যেভাবে সকলকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল, জনমনে সচেতনতা এসেছিল, আমাদের আন্দোলনের ফলেও তাই হবে। আমি তাঁর কাছ থেকে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পরিচয় জেনে নিয়ে সংশ্লিষ্ট অনেক কর্মীর সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মনোভাব জেনে নিই। লে. রহমানের কাছেই জেনেছিলাম, করাচির মনোরা দ্বীপের হিমালয়াতে বাঙালি নাবিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে ৬২ সালের দিকে গঠিত একটি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের মাধ্যমে সেখানে স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের স্বপ্ন সঞ্চারিত হয়। সেই সংগঠনের সদস্যেরা যাকে আপনজন ভেবেছে তাঁকে সদস্য করে নিয়েছে। ক্ষুব্ধ সদস্যদের মধ্যে প্রথম দিকে ছিলেন, লিডিং সী-ম্যান সুলতান, স্টুয়ার্ড মুজিব, নূর মোহাম্মদ প্রমুখ। বাঙালি-অবাঙালি বিভাজনের বিষয়টি সামনে আসায় এতে একাত্ম হন এবং নেতৃত্ব পর্যায়ে আসেন, লে. মোয়াজ্জেম, লে. মোজাম্মেল প্রমুখ। পরে করাচিতে পিএনএস কারসাযে কর্মরত থাকার সময় লে. রহমান মোয়াজ্জেমের সঙ্গে পরিচিত হন এবং এ সংগঠনে যুক্ত হন। এক পর্যায়ে তাঁরা পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শেখ সাহেব তাঁদেরকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য বলেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি তাঁদেরকে স্বাধীনতার আন্দোলন সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে পূর্ব বাংলায় গিয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন। নাবিকদের স্বার্থে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনের সদস্যেরা পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলন তথা ছয় দফার সাথে একাত্ম হয়ে পড়েন। বিভিন্ন

সূত্রে যেটুকু জানতে পেরেছি তাতে মনে হয়েছে, নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট, সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন এবং নিচের দিকে সেপাই হাবিলদার পর্যন্ত লোকজন এ আন্দোলনের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। অন্যদিকে প্রবীণ, সিনিয়র, পরিপক্ক কর্মকর্তারা তেমন উৎসাহ দেখাননি সঙ্গত কারণে। বয়স ও অভিজ্ঞতায় নবীন হওয়ায় সম্ভবত স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের চিন্তা-চেতনা ও পরিকল্পনায় অপরিপক্কতা ও অপরিণামদর্শিতার ছাপ দেখা গেছে। অন্যদিকে করাচির নেভাল একাডেমিতে চাকরির সময় নিজেও পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ভর্ৎসনার শিকার হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে এসে অপমানকর পরিবেশ থেকে বাঁচা ও আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি। এ কাজ নির্বিঘ্নে করার সুবিধার জন্য চাকরি থেকে অব্যাহতি চাই। তবে আবেদনে উল্লেখ করি পারিবারিক সমস্যার কথা। কর্তৃপক্ষ আমাকে চাকরি না ছেড়ে ছুটি নিয়ে এসে পারিবারিক সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেন। ছুটি দেওয়ার সময় আমার কমাণ্ডার আমাকে ইঙ্গিত করে বললেন, আমি সর্বনাশের দিকে যাচ্ছি।

৬৭ সালের ডিসেম্বরে দশ দিনের ছুটি নিয়ে ঢাকায় আসি মূলত আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন বিভাগে কর্মরত লে. কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম ও অন্য কয়েকজন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক মহলের মনোভাব জানার উদ্দেশ্যে। ঢাকায় এসে বুঝতে পারি ঘটনা ওপেন সিক্রেট। অর্থাৎ বাংলাদেশকে স্বাধীন করার একটা প্রক্রিয়া যে চলছে তা অনেকের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। শুনেছি ১৭ জেলার মধ্যে ১৬ জন পুলিশ সুপার ও ১৩ জন জেলা প্রশাসক এ আন্দোলনকে গোপনে সমর্থন দিচ্ছেন। মামলার অভিযুক্ত লিডিং সী-ম্যান সুলতান উদ্দিনের ভগ্নিপতি কামাল উদ্দিনের (বৈরি সাক্ষী) বাসায় মোয়াজ্জেম সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার চেষ্টা করি। কিন্তু যে লোকটিকে ঘিরে পশ্চিম পাকিস্তানে বাঙালি সৈনিকদের মাঝে এত উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেছে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমি তেমন স্বস্থি পেলাম না। এরপর কয়েকদিনে কয়েকজন সহপার্টি বন্ধু রাজনৈতিক নেতা ও দুএকজন আমলার সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য কিছু একটা শুরু করলে সমর্থন দেওয়ার মতো লোকের অভাব হবে না। তবে নিরীহ, শান্তিপ্রিয় আওয়ামী লীগ নেতা জিল্লুর রহমানের কাছে গিয়ে মনে হলো তিনি এসব কথা শুনে সমূহ বিপদের আশঙ্কায় ভয় পেয়েছিলেন। এভাবে নানা তৎপরতার মধ্য দিয়ে আমি স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি এবং শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ি।'

মুক্তিযুদ্ধে কমান্ডার রউফ

একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র প্রস্তুতি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হলেও পরবর্তীতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন কমাণ্ডার (অব.) আবদুর রউফ। সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বল হলেও তিনি আওয়ামী লীগ করতেন না। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আগে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সংগঠনের কাজ করেন। ৬৯ সালের শেষ দিকে নংসিংদী কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত

হন। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ছয় দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ নিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি নিশ্চিত ছিল না। লে. কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন জনাব রউফকে বলেছিলেন, আওয়ামী লীগের বিজয় দেখে আমরা যাতে মনে না করি পাকিস্তানিরা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে। বরং পাঞ্জাবিরা পূর্ব বাংলায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দারা ইতিমধ্যে বাঙালিদের হত্যার জন্য তালিকাও তৈরি করেছে। তিনি চোখ-কান খোলা রেখে সাবধানে থাকতে রউফকে সতর্ক করে দেন। ফেব্রুয়ারি-মার্চে দেশের উত্তাল দিনগুলোতে যখন 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' ইত্যাদি স্লোগানে চারদিক মুখরিত তখনই রউফ আসন্ন আর একটি মুক্তিযুদ্ধের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেন। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের একাংশের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণে কিছুটা বিরক্তও হয়েছিলেন। দেশে গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভৈরবে থেকে তরুণদের মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য সংগঠিত করা ও জনমত গঠনের মাধ্যমে প্রতিরোধ আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। ভৈরবের পতনের পর কিছুদিন গ্রামাঞ্চলে কাটিয়ে পরে আগরতলা যান। সেখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়া তরুণদের আশ্রয় ও যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের নিয়ে গঠিত গেরিলা দল পরিচালনার কাজ করেন মোহাম্মদ ফরহাদ ও চৌধুরী হারুন অর রশিদের সঙ্গে। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে চৌধুরী হারুণ অর রশিদের সঙ্গে একটি গেরিলা দল নিয়ে তিনি বিলোনিয়া সীমান্ত দিয়ে দেশে (চৌদ্দগ্রাম) ঢোকার সময় তাঁদের দলটি পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর ভৈরবের পৈত্রিক বাড়ি হানাদার বাহিনী পুড়িয়ে দেয়।

স্বাধীন দেশের নৌ-কমাণ্ডার

স্বাধীনতার পর কমাণ্ডার (অব.) আবদুর রউফ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় হন। ৭২ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সম্পাদক হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু কয়েকমাস পর তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ৭২ সালের আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের নৌবাহিনীতে যোগ দেন এবং অল্প কয়েক মাসের মধ্যে চট্টগ্রাম নৌঘাঁটিতে অধিনায়কের দায়িত্ব পান। একটি সদ্য অগোছালো, স্বল্প সংখ্যক নাবিক ও নৌযান নিয়ে গঠিত নৌবাহিনীকে পুনর্গঠনে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন এবং কমাণ্ডার হিসেবে পদোন্নতি পান। তিনি দুঃখের সঙ্গে জানান, ৭৩ সালে পাকিস্তান থেকে বাঙালি সৈন্যদের প্রত্যাবর্তনের পর মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররা নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হন। ৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর সেই ষড়যন্ত্র আরও গভীর হয়। নভেম্বরে নৌবাহিনীতে সংঘটিত এক বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে প্রথমে

তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। নিরাপোষ স্বাধীনতাকামী এই মুক্তিযোদ্ধাকে স্বাধীন দেশেই প্রায় তিন মাস কারাবন্দি রাখার পর ৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অকালে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়।

শেখ মুজিবের নির্দেশ 'তোরা গান গা'

বন্দী জীবনের কিছু সুখকর স্মৃতির কথাও সাক্ষাৎকারে জানালেন অবসরপ্রাপ্ত কমাণ্ডার আবদুর রউফ। অভিযুক্তদের অনেককে এক সঙ্গে কাছাকাছি পেয়ে সবার মধ্যে কিছুটা প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছিল। বিশেষ করে বিচারকাজ শুরুর প্রাক্কালে বন্দীদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ, কথা বলা, পত্র-পত্রিকা পাঠ, বিকেলে আধঘণ্টার জন্য একসঙ্গে হাঁটাহাঁটি ইত্যাদির সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯ জুন সেনানিবাসের স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে প্রথমবারের মতো বন্দীদের নেওয়ার সময়ের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে রউফ বলেন, 'ওই দিন সকালে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা কয়েদী ভ্যানে আমাদের তোলা হয় ট্রাইব্যুনালে হাজির করার জন্য। অনেকদিন পর এই প্রথমবার সব আসামি একত্রিত হয়ে জানলাম এ মামলায় আরও কে কে আসামি হয়েছি। একে অপরকে পেয়ে হাসি কান্না মিশিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছি। বাস ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে বঙ্গবন্ধুও এসে বাসের পেছনের দরজার পাশে বসেন। বাস সামনের দিকে এগুতেই আমরা গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠি 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটি। বাসের সবাই একসাথে কণ্ঠ মেলান তাতে। এমন সময় সশস্ত্র সেন্ট্রি বাসে গান গাওয়া নিষেধ বলে গান থামাতে বলে। আমরাও গান গাওয়া বন্ধ করে দিই। গান বন্ধ হয়ে গেছে দেখে বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন 'গান থামিয়েছিস কেন?' আমরা বললাম, 'সেন্ট্রি গানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।' শুনে বঙ্গবন্ধু উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন 'আমি শেখ মুজিব নির্দেশ দিচ্ছি, তোরা গান গা।' এরপর আমরা আবার গান গাওয়া শুরু করলে সেন্ট্রি চুপ হয়ে যায়।

ওইদিন থেকে মেস ক্যাম্পাসে সবাই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে থাকি। স্ত্রী বোনসহ আত্মীয় স্বজনদের আমাদের সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়। আমার ধূমপানের অভ্যাস ছিল। আমার বোন ধুমপানের খরচ কমানোর জন্য একটি হুকা দিয়েছিলেন। হুকা খাওয়ার জন্য অনেকে আমাদের কক্ষে আসতেন। বঙ্গবন্ধুও আসতেন মাঝে মাঝে। আহমদ ফজলুর রহমানের হাতের রান্না আর আমার হুকা খেয়ে তিনি বেশ তৃপ্তি পেতেন। কক্ষে এসেই দরাজ কণ্ঠে বলতেন, 'এই রউফ, হুকা সাজা।'

ভেতরে যা বলেন বাইরেও তাই হয়

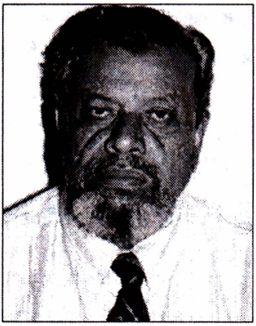
ট্রাইবুনালে মামলার শুনানি চলাকালে বন্দীরা এক পর্যায়ে জানতে পারেন, বাইরে ছাত্রসমাজ ও রাজনৈতিক দলের আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এ আন্দোলনের দাবিগুলোর অন্যতম ছিল তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। অন্যদিকে অফিসার্স মেসের বন্দীরা মাঝে মাঝে বৈকালিক আড্ডায় বসতেন মেসের সামনে সবুজ ঘাসের ওপর বসে। মাঝে মাঝে সেখানে যোগ দিতেন বঙ্গবন্ধু। কিভাবে

এগোলে আন্দোলন আরও জোরদার হতে পারে তাও স্থান পেত আলোচনায়। আর সংশ্লিষ্টরা অনেক সময় আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছেন আন্দোলনে করণীয় সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু যে রকম বক্তব্য দিতেন বাইরের আন্দোলনকারীরা ঠিক সেভাবেই কাজ করতেন। এ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে কমাণ্ডার রউফ বলেন, 'আমাদের মধ্যে যে বৈকালিক আড্ডা হতো সেখানে, বাইরের অবস্থা সম্পর্কে যেসব খবরাখবর পেতাম সেগুলো পর্যালোচনা করতাম। ভবিষ্যতে কি হতে পারে, কি করা উচিৎ এসব নিয়ে আলোচনাকালে লক্ষ্য করতাম, বঙ্গবন্ধু আন্দোলনের জন্য এরপর কি করা উচিৎ এ নিয়ে কোনো বক্তব্য রাখলেন। আজ বিকেলে হয়তো বললেন, অমুক কাজটা করলেই ভালো হয়। পরে দেখা গেল বাইরের আন্দোলনকারীরা ঠিক সে কাজটিই করছেন। এরকম কয়েকটি ঘটনা থেকে বোঝা যায় বঙ্গবন্ধু বন্দী হলেও তাঁর সাথে চলমান আন্দোলনের একটা যোগসূত্র আছে। তাঁর আইনজীবী এবং স্ত্রী-আত্মীয় কেউ হয়তো এতে ভূমিকা রাখতে পারেন।

অবশেষে আন্দোলনের ঢেউ এত বেশি তীব্র হয় যে, প্রেসিডেন্ট আইউব খান ৬৯ এর ২১ ফেব্রুয়ারি কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্রমামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন এবং আমরা সবাই এক অনিশ্চিত অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ-পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তি পাই।'

নানা কৌশলের মধ্যে এটিও একটি

ডা. ছৈয়দুর রহমান (রাজসাক্ষী)



চট্টগ্রামের যে তিন ব্যক্তিকে বঙ্গবন্ধু ও সৈনিকদের মাঝে যোগাযোগের মাধ্যম এবং বেসামরিক পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁদের একজন ডা. ছৈয়দুর রহমান চৌধুরী (তৎকালীন চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তীতে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি)।

গোপন সশস্ত্র তৎপরতার খবর ফাঁস হওয়ার পর অন্যদের মতো ডা. ছৈয়দুর রহমান চৌধুরীকেও গ্রেপ্তার করা হয় এবং ঘটনার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ১৮ দিন ধরে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতনের এক পর্যায়ে ডা. সৈয়দুর রহমান রাজসাক্ষী হন। সেই নির্যাতনের স্মৃতি এখনো তাড়িয়ে বেড়ায় তাঁকে। এখনো মাঝে মধ্যে হাত-পা কোমরের যন্ত্রণা বেড়ে উঠলে হাঁটতে পারেন না স্বাভাবিকভাবে। মন বসে না কোনো কাজে।

সে সময়ে বঙ্গবন্ধুর আন্দোলনের সহকর্মী হিসেবে আগরতলা মামলার নানা দিক জানার জন্য তাঁর চট্টগ্রামের এনায়েত বাজারের বাসায় গিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি ২০০৬ সালের নভেম্বরে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতির কথা স্বীকার করে জনাব চৌধুরী বলেন, 'আমাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নানা কৌশলের মধ্যে এটিও একটি কৌশল হিসেবে আমরা গণ্য করতাম।'

ডা. ছৈয়দুর রহমান জানান, তিনি ১৯৪৮-৫৯ সালে আইএসসি পাশ করে চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম জীবনে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৫০-৫১ সালে চট্টগ্রাম শহর ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। তখনকার দিনে আন্ডারগ্রাউন্ড কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। বিশেষ করে দেবেন সিকদারের সঙ্গে তাঁর একটা আস্থার সম্পর্ক স্থাপিত হয় সে সময়েই। দেবেন সিকদারকে তিনি নানা বলেই ডাকতেন। কমিউনিস্ট পার্টির যেসব কাজ ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে

করতে হতো সেগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর।

বেগম মুজিব সব জানতেন

ডা. সৈয়দুর রহমান বলেন, 'আওয়ামী লীগ সৃষ্টি হওয়ার পর ১৯৪৯-৫০ সালে পার্টি থেকে (কমিউনিস্ট পার্টি) সিদ্ধান্ত হলো আমি যাতে আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত হই। সে অনুযায়ী আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ শুরু করি। এরপর ধীরে ধীরে মনেপ্রাণে আওয়ামী লীগার হয়ে যাই। তখন থেকে আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর স্নেহ-ভালবাসায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর একান্ত আপনজনে পরিণত হই। তিনি রাজনৈতিকভাবে আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছেন। তার কথাবার্তায় স্বচ্ছতা, ভঙ্গিমা, চালচলন সবকিছুই আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। তাঁর সব কাজ আমি মনোযোগ দিয়ে দেখতাম এবং অন্তরে গেঁথে রাখতাম। তিনি যেভাবে যা বলতেন সেভাবে কাজ করার চেষ্টা করতাম।

তখনকার দিনে পাকিস্তানিদের আচার-আচরণে বঙ্গবন্ধু মনে করতেন এখানে স্বায়ত্ত্বশাসনের প্রয়োজন আছে। আমরাও মনে করতাম এত দূরত্বের মধ্যে একটি দেশ স্বায়ত্ত্বশাসন ছাড়া একত্রে থাকতে পারে না। তাই সেই সময় আওয়ামী লীগ স্বায়ত্ত্বশাসনের লক্ষ্য নিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করে। আমরাও স্বায়ত্ত্বশাসনের চিন্তা মাথায় রেখে কাজ করতাম।

সশস্ত্র প্রস্তুতি কিংবা বাঙালি সৈনিকদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি আরও পরের ঘটনা। ৬০ সালের দিকে আমরা বঙ্গবন্ধুর একটা চিন্তাধারার কথা জানতে পারলাম। সেটা হলো, তিনি ভাবলেন, এদেশে এমনি এমনি স্বায়ত্ত্বশাসন আসবে না। আমরা দুশ বছর শোষিত হয়েছি, ব্রিটিশরা গেছে। এখন তারা (পাকিস্তানিরা) এখান থেকে যা পাবে সব লুটপাট করে নিয়ে যাবে। কাজেই এদেশ স্বাধীনই করতে হবে। তার বিভিন্ন কথা ও কাজে আমি সেটা অনুভব করতাম এবং একমত পোষণ করতাম। তবে এ পর্যায়ে বাঙালি সৈনিকদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর প্রথম দিকের যোগাযোগ সম্পর্কে আমি জানতাম না। পরে ধীরে ধীরে বিষয়টি জানতে পারি যখন সশস্ত্র বাহিনীর কিছু লোক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। তাঁদের একজন দল প্রধান লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমই নিয়মিত যোগাযোগটা রাখতেন। আমার বাড়ির কাছেই যে নেভাল কোয়ার্টার আছে সেখানেই তিনি থাকতেন। তাঁর কথায় বুঝতে পারলাম যে, তাঁরাও এদেশের স্বাধীনতা চান। এটাও জানতে পারলাম যে, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখান থেকে প্রক্রিয়াটি আস্তে আস্তে এখানে আসে। পরবর্তীতে রিভ্যুলেশনারি কাউন্সিলের মতো একটা কিছু হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু আমাদের নির্দেশনা দিয়েছিলেন আমি এবং মানিক চৌধুরী (ভূপতিভূষণ চৌধুরী) যেন এই কাউন্সিলে থাকি। আমাদের চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত এসব সৈনিকের প্রায় ধীরে ধীরে পোস্টিং হচ্ছিলেন চট্টগ্রামে। তাই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁদের সবসময় প্রয়োজনীয় যোগাযোগ সম্ভব হতো না। তিনি তাঁদের বলে দিয়েছিলেন এখানে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। তিনি আমাদেরকে এ কাজের জন্য সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য মনে

করেছিলেন। আওয়ামী লীগের আর কারা এতে যুক্ত ছিলেন জানতে চাইলে ডা. ছৈয়দুর রহমান বলেন, 'আসলে এটি ছিল একটি গোপনীয় বিষয়। তাই কে কোথায় কিভাবে যুক্ত ছিলেন কিংবা ছিলেন না তা খুব একটা আলোচনা হতো না এবং সেভাবে জানা যেত না। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাজউদ্দিন সাহেব এবং বেগম মুজিব ছাড়া আওয়ামী লীগের আর কেউ জড়িত ছিল কিনা আমি জানি না। তবে পরবর্তীতে রিভ্যুলেশনারি কাউন্সিল যেটা হয়েছিল তাতে আর্মির (বাঙালি সৈনিক) ৫-৬ জন ছাড়াও আরও কয়েকজন লোক ছিলেন– এতদিন পর তাঁদের নাম স্মরণ করতে পারছি না। তবে প্রথম দিকে সেখানে আমি এবং মানিক চৌধুরী ছাড়া আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের কোনো লোক ছিল না। পরবর্তীতে মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে বিধান কৃষ্ণ সেনও এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন। বেগম মুজিব সবকিছু জানতেন এবং বিপ্লবী কাউন্সিলের জন্য যে অর্থ ব্যয় হতো সেগুলো মূলত তাঁর মাধ্যমেই পাওয়া যেত।

যে কারণে আওয়ামী লীগ নেতারা জানতেন না

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এতবড় একটা ঘটনা ঘটছে অথচ আওয়ামী লীগের নেতারা তা জানেন না এমন কেন হলো এ প্রশ্নে ডা. ছৈয়দুর রহমান বলেন, 'আগেই বলেছি বিষয়টি ছিল গোপন এবং স্পর্শকাতর। বঙ্গবন্ধু ভাবতেন আওয়ামী লীগের তখনকার বয়স্ক নেতা-কর্মীদের অনেকেই হয়তো এরকম একটা প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করবেন। তরুণরাও আবেগের বশে এ নিয়ে বেশি মাতামাতি করতো। তখন বিষয়টি কোনোভাবে ফাঁস হয়ে গেলে বড় ধরনের বিপদ দেখা দিত। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে এরকম বিপদে আমরা অবশ্য পড়েছিলামও।

আমাদেরকে বলা হয়েছিল স্বায়ত্বশাসনের পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জনগণকে বিভিন্ন উপায়ে উদ্বুদ্ধ এবং বিপ্লবী গ্রুপ তৈরি করার জন্য। ছাত্রদের মধ্য থেকে বাছাই করা নেতাদের নিয়ে কমিটিও করা হয় (যেটা নিউক্লিয়াস বডি হিসেবে পরিচিতি পায়)। ক্রমে এ রকম কাজ এমনভাবে বিস্তৃত হয় যে, বঙ্গবন্ধু যে স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবির পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তা অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সবাই এটাকে সমর্থনও করতে থাকে। তবে বিপ্লবী পরিষদের সাংগঠনিক বিষয়গুলো সম্পূর্ণ গোপন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে থাকায় আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ বা অন্যান্য দলের মধ্যে এরকম উদ্যোগ সম্পর্কে অজ্ঞতা-অস্পষ্টতা থেকে যায়।

তবে পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতার ধারণাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় এর প্রকাশ্য বিরোধিতা দেখা যায়নি। এ ছাড়া পাকিস্তানিরা গোপন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নাম জড়ানোতে এটিকে একটি ষড়যন্ত্রমূলক মামলা হিসেবেই সবাই বিবেচনা করে এবং এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার স্বপ্নকেই বেশি করে জাগিয়ে দিয়েছিল।

স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর দুই রকম চিন্তা

দেশকে স্বাধীন করার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা সম্পর্কে ডা. ছৈয়দ বলেন, আমার জানামতে বঙ্গবন্ধু দু রকম উপায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি চিন্তা করতেন। প্রথমটা হলো– একটা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে নির্বাচনের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসন অর্জন। পরে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুতির মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন। দ্বিতীয়টা হলো– বাধা আসলে সৈনিক জনতার সমন্বয়ে বিপ্লবী গ্রুপের সহায়তায় স্বাধীনতা অর্জন। সেই সময়ে তিনি ভাবতেন কেবল অন্দোলন কিংবা পুরোপুরি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করা সম্ভব হবে না। আন্দোলন প্রক্রিয়াকে সহায়তা কিংবা তেমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সহায়ক শক্তি হিসেবে একটি বিপ্লবী গ্রুপ তৈরি করার প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। অর্থাৎ দেশকে স্বাধীন করার জন্য যা যা কৌশল নেওয়া প্রয়োজন সে রকম কৌশলগত সব প্রস্তুতি নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে তিনি এগোচ্ছিলেন। এরমধ্যে সশস্ত্র প্রস্তুতিও একটি। তাঁর একটা মনের জোর ছিল যে, তিনি ডাক দিলে বাঙালিরা সাড়া দেবে। তিনি প্রায় বলতেন, ‘তোমরা চিন্তা করো না, আমি ডাক দেব, সবাই শুনবে। সবাই থাকবে। শেষ পর্যন্ত হয়েছেও তাই।

৬৬ সাল থেকে বিপ্লবী কাউন্সিলের কাজটা ছিল মূলত চিটাগাং বেইজড। যেহেতু বাঙালি সৈনিকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের অবস্থান ছিল চট্টগ্রামে। এর সামরিক দিকটা দেখতেন লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম। আর চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গবন্ধু এবং সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব ছিল আমি এবং আমার বন্ধু মানিক চৌধুরীর ওপর। লে. মোয়াজ্জেম কিংবা বঙ্গবন্ধু এখন আমি যে জায়গায় বসেছি (ডা. ছৈয়দুর রহমানের এনায়েত বাজারের বাড়ি, যেখানে এই সাক্ষাৎকার গ্রহীতার কথা হয়) এখানে বসেই আমাদের কথা হতো। দলীয় অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠক ছাড়া আমাদের বিপ্লবী কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোচনায় আমি এবং মানিক চৌধুরী ছাড়া আর কেউ সঙ্গে থাকতো না। মানিক চৌধুরীর খাতুনগঞ্জ রামজয় মহাজন লেনের বাসায়ও বৈঠক হতো অনেক সময়। এক পর্যায়ে মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে বিধান কৃষ্ণ সেনও এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন। তবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমি ও মানিক চৌধুরী যখন কথা বলতাম কিংবা তাঁর কাছে যেতাম তখন সেখানে বিধান সেন বা অন্য কেউ থাকতেন না। ঢাকায় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি জানতেন তাজউদ্দিন সাহেব এবং বেগম মুজিব।

সাংগঠনিক প্রক্রিয়া সম্প্রসারণের কাজে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আরো অনেকের হয়তো যোগাযোগ ছিল যা পরবর্তীতে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আমরা এখানকার দায়িত্বে ছিলাম। আসলে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সবার কথা ছিল যে, যাকে যেখানে যে কাজ দেওয়া হবে সে সেই কাজই করবে। আমরা সেভাবেই কাজ করার চেষ্টা করেছি। তার বাইরে জানার চেষ্টা করিনি। আমার জানামতে ভারতের সাথেও বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক ছিল। তিনি মনে করতেন পার্শ্ববর্তী অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা যদি ভাল থাকে তাহলে আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলুন কিংবা রিভ্যুলেশনারি কাউন্সিলের কাজ

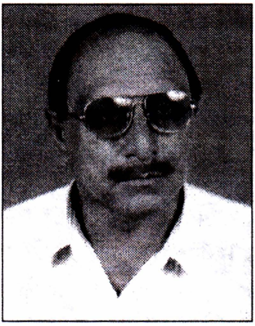
বলুন সব কিছুতে সহযোগিতা পাওয়া যাবে। সেই হিসেবে তিনি সেখানে কারো কারো সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন বলে শুনেছি। একটা সাহায্যকারী গ্রুপ ছিল সেটা সরকারিভাবে স্বীকৃত ছিল কিনা আমি জানতাম না।

অর্থের উৎস সম্পর্কে ডা. ছৈয়দুর রহমান বলেন, 'এ ব্যাপারে শেখ সাহেবই জানতেন। টাকা পয়সার যখন যা দরকার তিনি ব্যবস্থা করতেন। তাঁর অসম্ভব রকম প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। কারো কাছে চাইলেই সাহায্য পেতেন তিনি।'

এটি কোনো ষড়যন্ত্র ছিল না

ডা. ছৈয়দুর রহমানের মতে, 'স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন কোনো ষড়যন্ত্র ছিল না। বাংলাদেশের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন রকমের আন্দোলন প্রস্তুতিরই একটি অংশ ছিল এই সশস্ত্র প্রস্তুতি। আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের প্রস্তুতি আমাদের দৃষ্টিতে ষড়যন্ত্র না হলেও অন্যদের চোখে বিশেষ করে পাকিস্তানিদের চোখে ষড়যন্ত্র বলে বিবেচিত হতে পারে। তাই তখনকার পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামোতে থেকে এ ধরণের কর্মকাণ্ডের কথা স্বীকার করলে বাঙালিদের ভবিষ্যৎ রাজনীতির বিরাট ক্ষতি হয়ে যেত এবং বাঙালি নেতৃত্বের অপমৃত্যু হবার আশঙ্কা ছিল। পাকিস্তানিরা এই ঘটনাকে ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল। তবে অনেক নির্যাতন সইতে না পেরে অবচেতন মনে অনেক কিছু স্বীকার করেছি আমিও। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কি বলতে কি বলেছি, সেটা তখন মনে ছিল না। রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য আমাকে বাধ্য করা হয়েছিল।'

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একাধিকবার ভারতে গিয়েছি
আবুল হোসেন (বৈরী সাক্ষী)



বিলোনিয়া সীমান্ত দিয়ে ১৯৬২-৬৪ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধু একাধিকবার ভারতে গিয়েছিলেন বিলোনিয়া সীমান্ত দিয়ে। তার সাক্ষী মোহাম্মদ আবুল হোসেন। আগরতলা মামলার বৈরী সাক্ষী এবং আসামি-সাক্ষীদের মধ্যে বয়সে তিনি সবার ছোট। বঙ্গবন্ধুর ভারত যাওয়ার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আবুল হোসেন বিস্তারিত জানতেন না। তবে দেশকে যে স্বাধীন করতে হবে সেটা বুঝতেন।

মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার শ্রীনগর উপজেলার কামারগাঁও গ্রামের শেখ জমশেদের ছেলে আবুল হোসেনের জন্ম ১৯৪৪ সালে। ১৯৫৮ সালে শ্রীনগরের ভাইগ্যারকূল হরেন্দ্রলাল উচ্চবিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ছোটকাল থেকে রাজনৈতিক সভা সমাবেশে যোগ দেওয়াসহ দলীয় কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়ার কারণে পড়ালেখা বেশিদুর এগোয়নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আজীবন ভক্ত আবুল হোসেন ষাটের দশকের শুরু থেকে বঙ্গবন্ধুর ছায়াসঙ্গীর মতো লেগে থাকতেন এবং এক পর্যায়ে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি জানান, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার এক পর্যায়ে তাঁকে আগরতলা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর অসম্ভব রকম নির্যাতন করা হয় যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে এক পর্যায়ে তিনি সাক্ষী হতে রাজি হন। পরে আদালতকে জানান, নির্যাতনের মাধ্যমে তাঁকে সাক্ষী হতে বাধ্য করা হয়েছে। আদালত অভিযোগ শুনে এবং শারীরিক অবস্থা দেখে তাঁকে বৈরী সাক্ষী ঘোষণা করেন।

বিস্তারিত জানার জন্য ২০০৯ সালের ৪ জানুয়ারি দুপুরে তাঁর পল্টনের বাসা স্কাইভিউ গ্যালাকসিতে গিয়ে সাক্ষাৎকার নিই। সাক্ষাৎকারে আবুল হোসেন বলেন, '৫৮ সালেই আমি ঢাকায় এসে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি নিই। সেখানে যখনই অবসর পেতাম তখনই কোথাও মিটিং মিছিলের খবর পেলে ছুটে যেতাম। এ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর ছেলে শেখ কামালের সঙ্গে সম্পর্ক হয় এবং তাঁর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বাড়িসহ বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আসা করতে করতে বঙ্গবন্ধুর নজরে পড়ি। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে কাছে ডাকতেন, স্নেহ করতেন। আমি অভিভূত হয়ে যেতাম। বঙ্গবন্ধু আমাকে তার বিভিন্ন

ব্যক্তিগত কাজেও পাঠাতেন। অনেক সময় কোথাও যাওয়ার সময় সঙ্গে নিতেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সময় প্রচার-প্রচারণাসহ নানাভাবে আমি জোরালো ভূমিকা রাখি। এভাবেই বঙ্গবন্ধু ও শেখ কামালের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠি।

মূল কাজ চিঠি চালাচালি

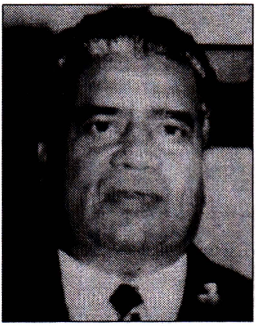
আগরতলা মামলায় জড়ানোর প্রেক্ষাপট তুলে ধরে মো. আবুল হোসেন বলেন, 'আমি ছিলাম আগরতলা মামলায় জড়িত বা আসামিদের মধ্যে বয়সে সবার ছোট। বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হবে সেটা প্রথম থেকে বুঝতাম। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না। কাজ করতে গিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার হয়। ঘটনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিন তারিখ আমার মনে নেই। বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময় আমাকে কয়েকজন লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে রুহুল কুদ্দুস, আহমদ ফজলুর রহমান, স্টুয়ার্ড মুজিব, সুলতান উদ্দিন, বিমানের রমিজ, ব্যবসায়ী মফিজ, চট্টগ্রামের মানিক চৌধুরী ও বিধান সেনের কথা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে। আমি মূলত এদের বিভিন্নজনের কাছে বঙ্গবন্ধুর চিঠি নিয়ে যেতাম আবার তাঁদের দেওয়া চিঠি বঙ্গবন্ধুকে এনে দিতাম। তবে ওসব চিঠিতে কি লেখা থাকতো তা জানতাম না। চট্টগ্রামে মানিক চৌধুরীর বাসায়ও চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। তবে তাঁদের কাছে চিঠি দেওয়া ছাড়া তেমন কথাবার্তাও বলতাম না। ঢাকার একটি হোটেলে মানিক চৌধুরীসহ কয়েকজন বৈঠক করার সময় বিধান সেনকে প্রথম দেখি। তবে দিন-তারিখ মনে নেই। রুহুল কুদ্দুস সাহেবের বাসায় এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু, খান শামসুর রহমান, বিধান সেন ও মহসীন সাহেবসহ কয়েকজনকে নানা কথাবার্তা বলতে শুনেছি। ধানমণ্ডী ১৯ নম্বরে মহসীনের বাসায়ও গিয়েছি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। বৈঠকগুলোতে দেশকে কীভাবে স্বাধীন করা যায়, কীভাবে সংগঠন শক্তিশালী করা যায় এ ব্যাপারে কৌশল নিয়ে আলোচনা হত। তবে তাঁদের আলাপ আলোচনায় আমি নিজে কোনো ভূমিকা রাখতাম না। কারও কথা কাউকে না বলার জন্য বঙ্গবন্ধুর নিষেধ ছিল।'

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভারত গমন

ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ছায়াসঙ্গী আবুল হোসেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে বলেন, '১৯৬২ থেকে ৬৪ সালের দিকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দুই-তিনবার বিলোনিয়া-সীমান্ত দিয়ে ইন্ডিয়া গিয়েছি। একবার স্টুয়ার্ড মুজিবও ছিলেন। সেখানে এক জায়গায় বঙ্গবন্ধু ওদের (ভারতের) কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তবে কী কথা হয়েছে তা আমার জানা নেই। আমি শুধু তাঁর সঙ্গী হিসেবে যেতাম আর আসতাম। একবার বিলোনিয়ার এক জায়গায় ইন্ডিয়ান লোকজন কিছু লোককে প্রশিক্ষণ দিতে দেখেছিলাম। কিন্তু ওদের পরিচয় জানতাম না।'

আমার আর কিছু মনে নেই

কামাল উদ্দিন (বৈরী সাক্ষী)



ষাটের দশকের শুরুতে যে কজন বাঙালি নৌ সেনা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের একজন কামাল উদ্দিন আহমদ। ফেনী জেলার রুথিরা গ্রামের লাল মিয়ার ছেলে কামাল ১৯৪৬ সালে নৌবাহিনীতে যোগ দেন। তাঁর স্ত্রীর বড় ভাই সুলতান উদ্দিন ছিলেন মামলার চার নম্বর আসামি। কামালের করাচিতে অবস্থিত ৪৭/৩ স্কুল টিচার্স কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির বাসায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমসহ সংশ্লিষ্টরা ৬২ সালে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। বিপ্লবী প্রক্রিয়া সম্প্রসারণে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন বলে তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে জানা যায়। প্রচণ্ড রকম নির্যাতনের এক পর্যায়ে তিনি সাক্ষী হতে রাজি হন। পরে মামলা শুরু হলে তিনি আদালতে সমস্ত কিছু অস্বীকার করে বৈরী সাক্ষী ঘোষিত হন।

কামাল উদ্দিন সাক্ষী থেকে বৈরী সাক্ষী হিসেবে যেদিন চিহ্নিত হন সেদিন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন তাঁর শ্যালক (সুলতান উদ্দিনের ভাই) কামাল উদ্দিন। তখন তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র। স্মৃতিচারণ করে কামাল বলেন, "গ্রেপ্তার হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার জন্য দুলাভাই কামালউদ্দিনের ওপর চরম নির্যাতন করে পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা। নির্যাতন সইতে না পেরে এক পর্যায়ে দুলাভাই তিনি সাক্ষী হতে রাজি হয়েছিলেন। তিনি যেদিন সাক্ষী দিতে যান সেদিন আমিও ট্রাইব্যুনালের সামনে উপস্থিত ছিলাম। সাক্ষীর ওপর মামলার ভবিষ্যত এবং আসামিদের জীবন মরণ অনেকটা নির্ভর করছিল। তাই সংশ্লিষ্ট সবার চোখে মুখে তখনব উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছিল-কামাল ভাই কী রকম সাক্ষ্য দেন তা ভেবে।

কাঠগড়ায় উঠে প্রথম দিকে কামাল ভাই যেভাবে একে একে ঘটনাবলী বলে যাচ্ছিলেন তাতে মনে হয়েছিল তিনি সত্যি সত্যি সব ঘটনা খোলাখুলি বলে দিচ্ছেন। কথা বলছিলেন কখনো উর্দু, কখনো বাংলা আবার কখনো ইংরেজিতে। একটা পর্যায়ে হঠাৎ করে থেমে গিয়ে একটু পানি চান। পানি খেয়ে শান্তভাবে বললেন, 'আমার আর কিছু মনে নেই।'

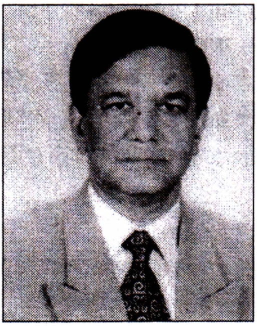
আদালত-অঙ্গন নিস্তব্ধ। বিবাদী পক্ষের আইনজীবী বললেন, 'মনে নেই মানে কী? আপনি সাক্ষী দিতে এসেছেন সাক্ষী দিন।' সরকারি পক্ষের আইনজীবীও বললেন, 'হ্যাঁ আপনি সাক্ষী দিন, যা জানেন তাই বলুন।' কামাল ভাই বললেন, 'দেখুন আমাকে যা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল এর মধ্যে বলতে বলতে সেগুলো ভুলে গিয়েছি। আর কিছু মনে নেই।' তিনি অনেকটা নাটকীয়ভাবেই আদালতকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'নাটকে তো একজনকে পেছনে বা ভেতরে থেকে ফ্রমড (বলে দিতে হয়) করতে হয়। মাননীয় চেয়ারম্যানের কাছে আমি আবেদন জানাই যে, ওদের (যারা সাক্ষী দিতে বাধ্য করেছে) একজনকে এখানে আনা হোক। উনি বলতে থাকবেন, আর আমি এখানে তাঁর কথামতো বলতে থাকবো।' একথা বলার পর আদালতে নিরবতা ভেঙে হাস্যরোল পড়ে যায়। এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান (আদালতের বিচারক) বললেন, 'ওসব কথা রাখুন, আসল কথা খুলে বলুন।' এরপর দুলাভাই গায়ের কাপড় খুলে আদালতের সামনে দেখান কীভাবে তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছে, প্রহার করা হয়েছে। বললেন, তাঁর পায়খানার রাস্তায় বরফ ও গরম পানি দেওয়া হয়েছে। সূঁচের আঘাতে হাতের নখ পঁচে গেছে। এভাবে নির্যাতনের যন্ত্রণা সইতে না পেরে সাক্ষী দিতে আমি বাধ্য হয়েছি।'

শেখ মুজিব নন, সার্জেন্ট জহুর

স্মৃতিচারণ করে কামাল বলেন, "দুলাভাই সেদিন আদালতকে আরও বলেছিলেন, 'ওরা (পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তরা) আমাকে বলেছিলেন, আমি যাতে বলি শেখ মুজিবকে আমি চিনি। অথচ আমি শেখ মুজিবকে কোনোদিন দেখিনি, কীভাবে চিনব। তারা শিখিয়ে দিয়ে বলে, 'যে দেখতে সবচেয়ে লম্বা ও বেশি গোঁফ আছে তিনি শেখ মুজিব। এরপর অন্য আসামিদের লাইনে দাঁড় করিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে আমি লম্বা গোঁফঅলা যাকে শনাক্ত করি তিনি নাকি শেখ মুজিব নন–সার্জেন্ট জহুরুল হক।' এ সময় আদালতে আবারও হাসাহাসি শুরু হয়। আদালতকে তিনি জানান, আসলে তিনি শুধু আত্মীয় হিসেবে সুলতান ভাইকে চেনেন। এ ছাড়া চাকরির সুবাদে দু-একজন বন্ধুকে চিনতে পারেন। এভাবে বক্তব্য দেওয়ার পর তিনি বৈরি সাক্ষী ঘোষিত হন এবং মামলা ভিন্নখাতে পরিচালিত হয়। এ ঘটনার পর আমার বোনের আকুতি মিনতি দেখে আদালত দুলাভাইয়ের জামিন মনজুর করেছিলেন।

পাকিস্তানের অবহেলা, ঘৃণা আমাকে বিতৃষ্ণ করে

লে. জে. (অব.) মো. মাহবুবুর রহমান



স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় জড়িত থেকেও মামলার আসামি হওয়া এবং নির্যাতন থেকে বেঁচে গেছেন এমন একজন সেনা কর্মকর্তা তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মো. মাহবুবুর রহমান। পরবর্তী সময়ে সৌভাগ্যক্রমে তিনিই হয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের লে. জেনারেল এবং সেনাবাহিনী প্রধান। কর্নেল (অব.) শামসুল আলম, ব্রিগেডিয়ার (অব.) খুরশিদ উদ্দিন, কর্নেল (অব.) শওকত আলীর কাছ থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় তাঁরা কুমিল্লা সেনানিবাসে তাঁদের গ্রুপের সঙ্গে মো. মাহবুবুর রহমানের জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। বিস্তারিত জানার জন্য ২০০৯ সালের ৪ জানুয়ারি লে. জেনারেল মাহবুবুর রহমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। বনানীর ওল্ড ডিওএইচএস এ তাঁর বাসভবনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়ার পটভূমি এবং কীভাবে গ্রেপ্তার বা নির্যাতন থেকে বেঁচে গেলেন তার বিস্তারিত। সাবেক এই সেনাপ্রধান মাহবুবুর রহমানের জন্ম ১৯৪১ সালের ২৪ ডিসেম্বর দিনাজপুরের বিরল থানার জগতপুর গ্রামে। তিনি ১৯৬৫ সালে দিনাজপুর জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৬৩ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র থাকাকালে তিনি সেনাবাহিনীতে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পরই নিয়োগ পেয়ে প্রশিক্ষণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের কাফরুল যান এবং ৬৪ সালের অক্টোবরে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদার কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসে যোগ দেন।

সেনাবাহিনীতে আসার কারণ

বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন কেন জানতে চাইলে লে. জে. (অব.) মাহবুবুর রহমান বলেন, “আমি কিশোরকাল থেকে রাজনীতি সচেতন ছিলাম। কিছু ঐতিহাসিক ব্যক্তির সংগ্রামী কাহিনী আমাকে রাজনীতি সচেতন হতে সাহায্য করে।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবনী আমার ভাল লাগতো। তাঁর ছবি আমার সঙ্গে থাকতো সবসময়। তিনি যে 'ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' তৈরি করেন এবং বলতেন, 'যুদ্ধ করে, সংগ্রাম করে দেশকে স্বাধীন করতে হবে, আমাকে অস্ত্র দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'। এসব কথা পড়ে আমি অনুপ্রাণিত হই। ষাটের দশকের শুরু থেকে বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের অবহেলা, ঘৃণা, বঞ্চনা এসব কিছুই আমাকে পাকিস্তানের প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলে। তাদের অগণতান্ত্রিক দুশাসন এবং শোষণের ফলে আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, আমার মনে হয়েছিল পাকিস্তানের পশ্চিমা কেন্দ্রে ক্ষমতাটা কেন্দ্রীভূত থাকার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আর এর মূল শক্তি পাঞ্জাবি সেনাদের আধিপত্য। বাঙালিদের সংখ্যা সেখানে খুবই নগণ্য। কাজেই আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে হবে।"

যেভাবে বিপ্লবী দলে এলেন

দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে গোপন বিপ্লবী সংগঠনে যুক্ত হওয়া এবং শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি আস্থার পটভূমি তুলে ধরে মাহবুবুর রহমান বলেন, '৬৩ সালেই আমি মনে মনে ভাবি, আমাদের স্বাধীন হতে হলে সেনাবাহিনীতে গিয়ে বাঙালি সেনা সদস্য বাড়াতে হবে ধীরে ধীরে। উপযুক্ত পদে যেতে হবে। মূলত এ রকম চিন্তাভাবনা থেকে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র থাকাকালেই আমি সেনাবাহিনীতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে পাকিস্তানিদের অমানবিক ও বৈষম্যমূলক আচরণ আরও কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়। কাফরুল থেকে বাংলাদেশের কুমিল্লা সেনানিবাসে এসেও বাঙালি ও পাঞ্জাবিদের মধ্যে বৈষম্যের চিত্র দেখে পাঞ্জাবিদের প্রতি ক্ষোভটা আরও তীব্র হয়। এ অবস্থায় কুমিল্লা সেনানিবাসের বাঙালি অফিসার অর্ডিন্যান্স এর ক্যাপ্টেন শওকত আলী এবং আরএমও ডা. ক্যাপ্টেন শামসুল আলমের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ও পরিচয় হয়। তাঁরা আমাকে নবীন অফিসার হিসেবে খুব স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। আমিও তাঁদেরকে বড় ভাইয়ের মতো জানতাম। তাঁরা বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশকে স্বাধীন করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলতেন।

মূলত তাঁদের কাছ থেকেই আমি এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হই। তখন আমারও মনে হয়েছে নেতাজী সুভাষ বসু ইংরেজদের কাছ থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা আনতে না পারলেও আমরা সেনাবাহিনীর মধ্যে সংগঠিত হয়ে চেষ্টা করলে হয়তো পারবো। মত বিনিময়ের এক পর্যায়ে আমি বিপ্লবী সংগঠনের সদস্য হয়ে যাই। শওকত ভাইয়ের সঙ্গে কুমিল্লা শহরের বাইরে কয়েকটি বৈঠকেও আমি অংশ নিয়েছি। গোপনীয়তা রক্ষা হতো বলে বৈঠকস্থল সম্পর্কে তখন তেমন কিছু জানতে চাইনি। অনেক কিছু এতদিনে মনেও নেই, সম্ভবত কান্দিরপাড় এলাকায় কারও বাসায় বৈঠকগুলো হতো।

শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আস্থা

তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার কখনো দেখা না হলেও নানাভাবে তাঁর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের কথা জেনে তাঁর ওপর আমি আস্থাবান হয়ে উঠি। ক্যাপ্টেন শওকত ভাই বলেছিলেন এই আন্দোলনের পেছনে শেখ সাহেব আছেন। কুমিল্লায় সম্ভবত ৬৬ সালের দিকে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমের উপস্থিতিতে একটা বৈঠকেও মোয়াজ্জেম সাহেব বলেছিলেন দেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনার পেছনে শেখ মুজিব নেতৃত্বে আছেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ভারতীয় সাহায্য-সহযোগিতাও পাওয়া যাবে। এখন বিভিন্ন সেনানিবাসে আমাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা দরকার। আমিও পুরোপুরি আস্থাবান ছিলাম যে, শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই বাংলাদেশকে স্বাধীন করা সম্ভব। তাঁর মধ্যে যে সাহস, বাঙালি জাতিসত্তার প্রকাশ ও নেতৃত্বগুণ ছিল তাতে দূর থেকেই আমি তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়েছিলাম। তাঁর প্রতি অনুরাগী ছিলাম বলেই আমি দেশকে স্বাধীন করার সংগ্রামী প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে পেরেছিলাম। তিনি যে অবিসংবাদিত নেতা তা এখনও স্বীকার করি। কুমিল্লায় থাকাকালে আমি আমার মতো করে বেশ কজন সেনা সদস্যকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করি যাতে তাঁরা প্রয়োজনে ডাক এলে কাজে নেমে পড়তে পারেন।'

বিপ্লব তথা লড়াই শুরু হলে তাঁর দায়িত্ব কী হতো জানতে চাইলে অবসরপ্রাপ্ত সাবেক এই সেনা প্রধান বলেন, 'ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য থাকতো। কোথাও মাইন লাগানো, সেতু ধ্বংস করা বা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার মতো কাজগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লোকেরা করতো। আমার পরিকল্পনা ছিল সেনাবাহিনীর অন্য যাঁরা আমাদের সদস্য হবেন তাঁদেরকে বিস্ফোরকের ব্যবহার সম্পর্কে গোপনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব, যাতে তাঁরা স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হলে সেগুলোর সঠিক ব্যবহার করতে পারে। দিন তারিখ বা সময় ঠিক হলে বিস্ফোরক দিয়ে আমার দায়িত্ব আমি যথাযথভাবে পালন করব এ ব্যাপারে আমার ওয়াদা ছিল।'

বেঁচে গেলেন যেভাবে

এরকম একটা ঝুঁকিপূর্ণ বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় যুক্ত থেকেও আগরতলা মামলা এবং নির্যাতন থেকে রক্ষা পেলেন কিভাবে জানতে চাইলে জনাব মাহবুবুর রহমান বলেন, 'আমার তখনও ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের বেসিক কোর্স সম্পন্ন হয়নি। ওই কোর্স হতো করাচির রিসালপুরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। সম্ভবত ৬৭ সালের প্রথম দিকেই ওই কোর্স শেষ করার জন্য আমাকে রিসালপুর পাঠানো হয়। প্রশিক্ষণ শেষে নিয়োগ দেওয়া হয় পাঞ্জাবের ঝেলাম-সেনানিবাসে। ওই সময়ে আমার বিয়ে ঠিক হলে ছুটি নিয়ে দেশে আসি। এসেই বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারি যে, শওকত সাহেব গ্রেপ্তার হয়েছেন। কাজেই আমাকেও হয়তো গ্রেপ্তার করা হতে পারে। এ অবস্থায় বিবাহিত জীবনে যাতে কোনো প্রশ্ন না আসে সেজন্য আমি বিষয়টি হবু স্ত্রীকে জানাই। সে ছিল শিক্ষিত এবং আমার পূর্ব পরিচিত। আমার সব কথা শুনে সে বরং

আমাকে অনুপ্রাণিত করে বলে যে, যা হয় হোক। বিয়ে হতেও কোনো সমস্যা নেই। এরপর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরে আমি আবার ঝেলামে চলে যাই। পরে আমি শুনেছি যে, একজন ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লোক, এ প্রক্রিয়ার (স্বাধীনতার) সঙ্গে যুক্ত এবং সে কোথায় আছে, নাম কী ইত্যাদি জানার জন্য শওকত ভাইদের ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, নির্যাতন করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা শত অত্যাচার সত্ত্বেও আমার নাম বলেননি। ফলে শেষ পর্যন্ত সাক্ষী প্রমাণ না পাওয়ায় আমার নাম আসামি হিসেবে আসেনি। মামলা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেলে আমি শঙ্কামুক্ত হই। পরবর্তীতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় স্ত্রী-সন্তানসহ আমি পশ্চিম পাকিস্তানে আটকা পরে যাওয়ায় যুদ্ধে অংশ নেওয়া সম্ভব হয়নি। এ কারণে মনে কষ্টও ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে দেশে ফিরি এবং চাকরির ধারাবাহিকতায় স্বাধীন দেশের সেনাবাহিনী প্রধান হওয়ার গৌরব অর্জন করি।

আমি বিশেষ করে শওকত সাহেব ও শামসুল আলম সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁদেরকে বড় ভাই হিসেবে সম্মান করি। তাঁরা সে সময় জিজ্ঞাসাবাদে আমার নাম বলে দিলে আমি আর এ পর্যায়ে আসতে পারতাম কি না সন্দেহ।'

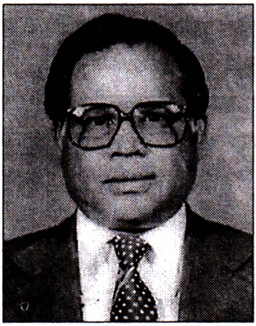
সেনানিবাসে বিজয় কেতন

মাহবুবুর রহমান জানান, তিনি সেনাপ্রধান থাকার সময় ১৯৯৬ সালে ঢাকা সেনানিবাসে আগরতলা মামলা পরিচালনার জন্য গঠিত বিশেষ আদালত কক্ষটিকে যাদুঘর করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর আগে তিনি ক্যাপ্টেন শওকত (পরবর্তীতে কর্নেল) এবং (কর্নেল অব.) শামসুল আলমকে সেনানিবাসে আমন্ত্রণ জানান। জেনারেল (অব.) মাহবুব বলেন, 'আমি তাঁদেরকে আগরতলা মামলার বিষয়বস্তু অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্য গোপন আন্দোলন এবং এতে বঙ্গবন্ধুসহ সংশ্লিষ্টদের কার্যক্রম ঐতিহাসিকভাবে স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটা কিছু করার ইচ্ছা প্রকাশ করি। তাঁদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সেনানিবাসে আদালত হিসেবে ব্যবহৃত কক্ষটিকে যাদুঘর হিসেবে তৈরির উদ্যোগ নিই। বিজয় কেতন নামে ওই যাদুঘরে ৬৮-৬৯ সালে আদালত চলাকালে বঙ্গবন্ধুসহ অন্য আসামিদের যেভাবে আসন বিন্যাস এবং এজলাস ছিল সেভাবেই সাজানো হয়েছে। সেখানে আদালত চলাকালে বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত জিনিসগুলোও রাখা হয়েছে।'

মাহবুবুর রহমান বলেন, 'আমার মনের সান্ত্বনা এই যে, স্বাধীনতার ২৫ বছর পর হলেও ঐতিহাসিক ঘটনাটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটা ভূমিকা রাখতে পেরেছি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই যাদুঘরের উদ্বোধন করেন।'

ভাসানী বললেন, তোরা শেখ মুজিবকে ধরে নেয়

আলী নওয়াজ



মামলার অভিযোগপত্রে নাম আছে, অন্যদের মত গোপন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকাও ছিল অথচ কৌশলে গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছেন এমন একজন আলী নওয়াজ। তিনি মামলার ৩৩ নং আসামি আলী রেজার ছোট ভাই। ১৯৬১ সাল থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ এবং 'স্বাধীনতার জন্য কিছু একটা' করার ব্যাপারে কানাঘুষার কথা জানতে পারেন তিনি। এক পর্যায়ে নিজেও যুক্ত হন এ প্রক্রিয়ায়। তবে সরাসরি ও সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখেন ৬৬ সালের শুরুর দিক থেকে।

এছাড়া তাঁর বড় ভাই আলী রেজাও এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে অনেক কিছু জানার কথা তাঁর। তাই তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রাসঙ্গিক মনে করি। ২০০৮ সালের ২ নভেম্বর বিকেলে তাঁর ঢাকার উত্তরায় ১১ নং সেক্টরের ১১ নং সড়কের ৪৪ নং বাসায় (সবুজছায়া) তিনি এ সাক্ষাৎকার দেন।

আলী নওয়াজের জন্ম ১৯৩৫ সালের ২৬ অক্টোবর। বাবা জহুর আলী ছিলেন ডিএসপি (জেলা পুলিশ সুপার)। গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়া জেলা সদরের লাহিনী গ্রামে। বাড়িতেই প্রাথমিক শিক্ষা নেন। ১৯৫৪ সালে কুষ্টিয়া ডিগ্রি কলেজ থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি পাস করেন। অবশ্য পরীক্ষা দেওয়ার পরপরই তিনি বিমান বাহিনীতে যোগ দিয়ে পাকিস্তানের করাচি চলে যান এবং ৬১ সালের শুরুর দিকে ক্যাডেট হিসেবে কমিশন পান। এর আগে ১৯৬০ সালের শেষের দিকে করাচির রিসালপুরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণে থাকার সময় প্রশিক্ষক সার্জেন্ট জহুরুল হকের সঙ্গে আলী নওয়াজের পরিচয়।

প্রথম ধারণা দেন সার্জেন্ট জহুর

পাকিস্তান আমলের শুরু থেকে বাঙালিদের প্রতি বঞ্চনা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের গোপন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলী নওয়াজ বলেন, 'করাচিতে বিমান বাহিনীতে থাকার সময় বাঙালিদের প্রতি পশ্চিমাদের নানা রকম বৈষম্যমূলক আচরণ দেখে আমি মনে মনে ক্ষুব্ধ হই। অন্য বাঙালি সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সময়ও সংশ্লিষ্টদের ক্ষুব্ধ মনোভাবের বিষয়টি জানতে পারি। বিমান বাহিনীতে প্রশিক্ষণে থাকার সময় লক্ষ্য করি সার্জেন্ট জহুরুল হক

বাঙালি প্রশিক্ষণার্থীদের দিনের প্রশিক্ষণ শেষেও একটা বিশেষ সময় দিতেন এবং নিজেদেরকে বিশেষভাবে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতেন। সার্জেন্ট জহুর আমাকে পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং ওদের বিরুদ্ধে নিজেদের সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন।'

সাংগঠনিক তৎপরতা

আলী নওয়াজ জানান, দেশে থাকতেই তিনি খেলাধূলার প্রতি আসক্ত ছিলেন। করাচি গিয়েও কমিশন পাওয়ার পর থেকে কাজের ফাঁকে সঙ্গীদের নিয়ে খেলাধূলা ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলেন। এসময় চাকরিস্থলে নানা সমস্যা ও পরিণতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে পরস্পর মতবিনিময় করতেন। সংশ্লিষ্টদের মনোভাব বুঝে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার প্রসঙ্গটিও আসতো আলোচনায়। এভাবে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে কয়েকজন সহকর্মীকে নিজেদের দলভুক্ত করেন। তিনি বলেন, 'প্রথমদিকে বিষয়টি শুনে অনেকে ভয় পেতেন। তবে এক পর্যায়ে সবকিছু গোপন থাকবে বলে আস্থা এলে স্বতস্ফূর্তভাবে দলে যোগ দিতেন। যেমন জাকারিয়া নামে একজন কারিগরি কর্মকর্তা (টেকনিক্যাল অফিসার) ছিলেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে। তাঁর বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে। আমি আমাদের গোপন কর্মকান্ডের কথা জানিয়ে তাঁকে আমাদের দলভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানালে 'বিষয়টি ঝুঁকিপূর্ণ' মন্তব্য করে প্রথমদিকে তিনি তা এড়িয়ে যান। অবশ্য কিছুদিন পরেই তিনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন। বিমান বাহিনীর ইন্সট্রাকটর (প্রশিক্ষক) সার্জেন্ট ফজলুল হক এবং স্পোর্টস অফিসার ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রুস্তমও আমার মাধ্যমে এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত। এভাবে পর্যায়ক্রমে একজনের মাধ্যমে আর একজন করে অনেকেই জড়িত হন বিপ্লবী সংগঠনে।'

শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রথম দেখা করাচি

আলী নওয়াজ জানিয়েছেন, ১৯৬৬ সালের প্রথম দিকে তিনি বিমান বাহিনীর চাকরি ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। এ সময় বরিশাল আইডব্লিউটিতে (অভ্যন্তরীণ জল-পরিবহন সংস্থা) ডেপুটেশনে দায়িত্ব পালন করছিলেন লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের 'পরিকল্পনা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আলী নওয়াজের প্রতি অনুরোধ জানান। নওয়াজের পারিবারিক কারণে চাকরির প্রয়োজন থাকায় মোয়াজ্জেম তাঁকে ইস্টার্ণ ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স নামে একটি বীমা কোম্পানিতে চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। কিছুদিন পর তিনি যোগ দেন গ্রেট ইস্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে।

গ্রেট ইস্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পদে কাজ করার সুবাদে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত এবং পদস্থ লোকদের সঙ্গে মেলামেশা ও সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ হয় আলী নেওয়াজের। এ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ও তাজ উদ্দীন আহমদের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ ঘটে। এই সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের লোকজনের মনোভাব জানা ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম

ও বঙ্গবন্ধুকে জানাতেন তিনি। ইতিপূর্বে শেখ মুজিবের কথা নানাভাবে শুনলেও এবং করাচির একটি বৈঠকে তাঁকে দেখলেও ঢাকায়ই তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা হয় আলী নওয়াজের। স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, "করাচিতে থাকার সময় আমাদের ওপর জুলুম নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে কিছু একটা করার জন্য দলে লোক ভেড়ানো ছাড়া বিশেষ কোনো দায়িত্ব আমার ওপর ছিল না। তবে সশস্ত্র প্রস্তুতির বিষয়টি স্পষ্ট হয় তখন থেকে। ঢাকায় এসে একাধিক জায়গায় বৈঠকের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করতে হয় আমাকে। সেই সুবাদে আমার গাড়িতে করে শেখ সাহেবকে নিয়ে কয়েক জায়গায় গিয়েছি। সঠিক তারিখ মনে নেই। কারণ তিনি (শেখ মুজিব) মাঝে মাঝে ধরা পড়তেন আবার ছাড়াও পেতেন। এরকম ৬৬ সালের শেষ অথবা ৬৭ সালের প্রথম দিকে হবে। শেখ সাহেব এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী তাজউদ্দিন আহমদকে নিয়ে এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। ওই সময় তাঁরা দুজন পাকিস্তান- বাংলাদেশের নানা সমস্যা প্রসঙ্গে আলোচনার এক পর্যায়ে আমিও যোগ দিই তাতে। তিনি (বঙ্গবন্ধু) হাসতে হাসতে বলছিলেন, 'আপনারা তাহলে বাংলাদেশ করেই ছাড়বেন'। আমি তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করি- 'স্যার, আপনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তাতে সমতা আনতে পারবেন?' তাঁর উত্তর ছিল- 'এটাতো সম্ভব হবে না।' তখন আমি বলেছিলাম, 'এটা না হলে আমাদের বাংলাদেশ হওয়া দরকার।"

আলী নওয়াজ এর আগে করাচিতে একটি বৈঠকে শেখ মুজিবের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন, '৬৬ সালের কথা। করাচিতে পাকিস্তান বিমানের (পিআইএ) ক্যাপ্টেন নাজিমের বাসায় একটি বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম। নাজিম সাহেবের বাড়ি ছিল সিলেট। আমাদেরকে জানানো হয়েছিল, বৈঠকে একজন ভদ্রলোক অতিথি হিসেবে আসবেন এবং তিনি কিছু কথা বলবেন। বৈঠক শুরুর সময় দেখি সেখানে যে ভদ্রলোক অতিথি হিসেবে এসেছেন তিনি শেখ সাহেব। সেই বৈঠকেই তাঁকে আমি প্রথম সরাসরি দেখি। বৈঠকে মূলত বিমানের লোকজনই ছিলেন। তখন পাকিস্তানে বোয়িং বিমান ছিল চারটি। ঘটনাক্রমে এর মধ্যে তিনটির ক্যাপ্টেন ছিলেন বাঙালি। বৈঠকে আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয় যে, পরিকল্পনা সফল হলে তাঁরা বিমান নিয়ে কৌশলে বাংলাদেশে চলে আসবেন।'

ঢাকার কয়েকটি বৈঠকস্থল

আলী নওয়াজের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৯৬৬-৬৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বেশ কয়েকটি বৈঠক হয় ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় তাঁর তত্ত্বাবধানে। এরমধ্যে গ্রিন স্কোয়ারের একটি জায়গায় বৈঠকে আলী রেজা, লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম, আহমদ ফজলুর রহমান, খান শামসুর রহমান, রিসালদার শামসুল হক প্রমুখ ছিলেন। ওই বৈঠকে আলী নওয়াজ রিসালদার শামসুল হককে প্রথম চেনেন মোয়াজ্জেম সাহেবের মাধ্যমে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় শামসুল হক একাই ১৬টি ভারতীয় ট্যাংক ধ্বংস করেন পশ্চিমা সীমান্তে।

মহাখালীর একটি জায়গায় অপর এক বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আলী নওয়াজসহ সার্জেন্ট ফজলুল হক, রুস্তম এবং আমির হোসেন। কিন্তু সেই বৈঠকের ব্যাপারে কেউ গোয়েন্দাগিরি করছে বলে সন্দেহ হলে নওয়াজের পরামর্শে বৈঠকের স্থান পরিবর্তন করে গুলশান এলাকার একটি নৌকার ভেতর বৈঠকটি করা হয়। মূলত বিমান বাহিনীর সদস্যদের পক্ষ থেকে এই বৈঠক ডাকা হয়। রেসকোর্স ময়দানেও একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আড্ডাচ্ছলে বাদাম খেতে খেতে এতে সংশ্লিষ্টরা কথা বলেন পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে বসে। এতে নওয়াজ ছাড়াও এবি খুরশিদ, সুলতান উদ্দিন, স্টুয়ার্ড মুজিব এবং অন্য দুজন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকগুলোতে মূলত কোন গ্রুপের কাজ কোথায় কতদূর এগিয়েছে, নতুন করে কারা যুক্ত হয়েছে, গোয়েন্দা বিভাগকে এড়িয়ে আরো দ্রুততার সঙ্গে কীভাবে সাংগঠনিক কাজ এগিয়ে নেওয়া যায় এসব বিষয়ে আলোচনা হতো।

আলী নওয়াজের দেওয়া তথ্য মতে, ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ১০-১২টি বাড়ি ঠিক করা হয়েছিল সভা করার জন্য। এর মধ্য গ্রিন স্কোয়ার, ধানমন্ডি ১৯ নং এবং দিলু সড়কের কয়েকটি বাড়ি ব্যবহার করা হতো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে। সে সব বাড়ির এখন চিহ্ন নেই। হাত বদল হয়ে ভেঙে নতুন বাড়িঘর কিংবা অন্য স্থাপনা তৈরি হয়েছে সেখানে। এর আগে (আন্দোলন সংগঠনের সময়) ওই সব বাড়িতে আগরতলা মামলার আসামিদের মধ্য থেকে সুলতান উদ্দিন, নূর মোহাম্মদ, সার্জেন্ট শামসুল হকসহ আরও অনেকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। অবশ্য এসব প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছে সিভিল ডিফেন্সের ছত্রছায়ায়। সিভিল ডিফেন্সের তৎকালীন পরিচালক কর্ণেল হাসেম এসব কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা দিয়েছেন, সহানুভূতি দেখিয়েছেন। এসব কার্যক্রম সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আগে আলোচনা হতো। কাজ শেষেও তাঁকে অগ্রগতির বিষয়ে জানানো হতো।

তোরা শেখ মুজিবকে ধরে নেয় : ভাসানী

বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে সশস্ত্র আন্দোলন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঠিক কখন থেকে জড়িত এমন প্রশ্নের জবাবে আলী নওয়াজ বলেন,"আমার মনে হয় একেবারে প্রথম দিক থেকেই তিনি জড়িত ছিলেন। কারণ তাঁর মতো নেতার সহায়তা ছাড়া এ ধরণের কাজের সাহস করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে আমরা যাঁরা এই কাজে জড়িত হয়েছিলাম আমরা ষড়যন্ত্র বা অন্য যা কিছু করি না কেন আমরা জানতাম, উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতার সমর্থন ছাড়া কেউ আমাদের স্বীকৃতি বা সমর্থন দেবে না। আমি জেনেছি যে, আমাদের লোকদের মধ্যে আলোচনায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথম দিকে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বলেছিলেন, 'একটা লোকই এটা করতে পারবে এবং সে হলো শেখ মুজিব। তোরা তাকে ধরে নেয়। কারণ তাঁর সব জায়গায় গ্রহণযোগ্যতা আছে, নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা আছে।' শেখ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাহস দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমাদের মতো

আমিও চাই দেশটা স্বাধীন হোক। তোমরা কাজ করো। আমি সব রকম সহায়তা দেব।' তিনি তা করেছেনও। আমার জানামতে, তিনি পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রামের ডা. ছৈয়দুর রহমান, মানিক চৌধুরী, বিধান কৃষ্ণ সেনকে যুক্ত করেছিলেন লিয়াজো রক্ষার জন্য। বিধান সেন একাধিকবার আমার বাসায়ও এসেছিলেন। আর এ বিষয়ে ভাল করেই জানতেন তাজ উদ্দিন আহমদও।"

যে কারণে গ্রেপ্তার হননি

১৯৬৮ সালে বিপ্লবী কর্মকান্ডে জড়িতরা যখন একে একে গ্রেপ্তার হচ্ছিলেন, পত্রপত্রিকায়ও কিছু খবর বের হচ্ছিল তখনই আলী নওয়াজ সতর্ক হয়ে যান। বিমান বাহিনীর পরিচিত কয়েকজন বন্ধুও তাঁকে সতর্ক করে দেন। আলী নওয়াজ বলেন, "একদিন এক বন্ধু এসে খবর দেন, 'তোমার বাসা চিহ্নিত হয়েছে তুমি তাড়াতাড়ি সরে পড়।' প্রতিবেশী এক সামরিক কর্মকর্তা কর্ণেল ডা. চোধুরীর পরামর্শে আমি আমার আর এক বন্ধুকে লং ড্রাইভের কথা বলে তাঁর গাড়িটা বদল করে বারান্দায় এনে রাখি। সন্ধ্যায় দেখি দুজন পাকিস্তানি সৈন্য এসে টর্চলাইচ দিয়ে গাড়ির নম্বর দেখছেন। কর্ণেল চোধুরী এগিয়ে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কি যেন কথা বলার পর ওরা ফিরে যান। এর আধঘন্টার মধ্যেই আমি কুষ্টিয়া রওনা দিই। কয়েকদিন পর এসে দেখি কর্ণেল চোধুরীও সেই বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। এরপর থেকে আমি সতর্কভাবে চলাফেরা করি। পরে বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারি, যে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে তাতে আমার নাম নেই। আসামিরা সবাই সেনানিবাসে আছেন। এরপর মামলার শুনানি শুরু হলে আমি আদালতে যাওয়া শুরু করি। সেনাবাহিনীতে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে জেলখানায় আসামিদের কিছু খবরাখবর এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের কিছু কথাবার্তা থাকলে তা আইনজীবিদের কাছে জানাতাম। প্রায় সন্ধ্যায় খান আতাউর রহমানের বাসায় আইনজীবিরা বসে শলাপরামর্শ করতেন। সেখানেও যেতাম মাঝে মধ্যে। আদালতে অভিযোগপত্র শুনানির শুরুর দিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। প্রথমেই ধরা হয় শেখ মুজিবের নাম। অভিযোগের বিবরণ পড়া শুরু হলে শুনি ১৩ নম্বর পৃষ্ঠায় আমার নাম। অভিযোগপত্রের অনুচ্ছেদ ২৭ এ তিন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে লেখা হয়েছে তদন্ত চলাকালে এসব ব্যক্তির পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সেখানে আমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল আমার পদের নাম লেখা হয়েছে এলএসি (সেনাবাহিনীতে একটি পদের নাম)। কিন্তু আমি এলএসি ছিলাম না। আমার দুপাশে ছিলেন দুজন সেনা কর্মকর্তা। অ্যাডভোকেট সালাম সাহেব আলী নওয়াজ নাম শুনে চোখ বাঁকা করে আমার দিকে তাকান। কিন্তু কিছু বলেননি। আমিও চুপ থাকি। সেনা কর্মকর্তারা তখনও বুঝতে পারেননি যে আমিই সেই আলী নওয়াজ। এক পর্যায়ে তাঁরা জানতে চান আমি কখনো ফোর্সে চাকরি করেছি কী না। পাল্টা আমি ফোর্স কী জিনিস জানতে চেয়ে উত্তর দিই, 'আমি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে কাজ করি।' বিরতির সময় সালাম সাহেব আমাকে বকা দিয়ে বললেন, 'তুমি সব কিছু জেনেশুনে এখানে কোন সাহসে ঢুকলে?'

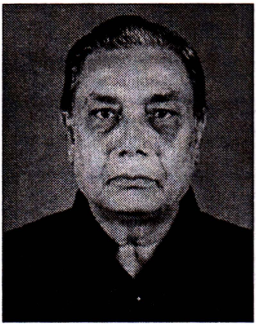
এর আগে প্রথম দিন আদালতে গিয়ে বড় ভাই আলী রেজার সঙ্গে কথা বলার সময় আমাকে দেখে শেখ সাহেব জানতে চান আমি কেন সেখানে গিয়েছি। তাঁকে আমি আমার সঙ্গে কথা না বলা এবং আমাকে না চেনার ভান করার জন্য অনুরোধ করি। এভাবে নানা ফাঁকতালের মধ্য দিয়ে এক পর্যায়ে মামলাই শেষ হয়ে যায়। আলী নওয়াজ জানান, এ রকম আরও অনেকে অনেক জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছেন। গোপনীয়তার কারণে কেউ কাউকে চিনতে পারেননি এবং ধরাও পড়েননি।

মুক্তিযুদ্ধে আলী নওয়াজ

আলী নওয়াজ জানান, তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কোলকাতা গিয়ে সেখানে তাজউদ্দিন আহমদ ও জেনারেল ওসমানীর মধ্যে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করেন। এ ছাড়া তিনি শরণার্থী শিবিরগুলোর তত্ত্বাবধানের জন্য গঠিত সহায়ক কমিটিতে কাজ করেন। তিনি বলেন, 'ওই কমিটিতে ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং চেয়ারম্যান ছিলেন। এ সময় বহু শরণার্থী শিবিরে ঘুরতে হয়েছে। সেখানে ভালমন্দ নানা অভিজ্ঞতার মুখোমুখিও হয়েছি। দায়িত্বপ্রাপ্ত বাঙালি-ভারতীয় উভয় দেশের লোকদের কেউ কেউ শরণার্থীদের রেশন কার্ডের পণ্য আত্মসাৎ করে বিক্রির অভিযোগও শুনেছি। কিছু ঘটনা নিজে দেখেছিও।'

‘ইয়ে বাঙালি এধার আও’ বললে মনটা খারাপ হতো

জয়নাল আবেদীন খান



আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন অভিযোগপত্রে তালিকাভুক্ত আসামি ছাড়াও সে সময় আরও অন্তত দুতিন হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁদের অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মূল আসামিদের সঙ্গে গোপন আন্দোলন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ না থাকায় এবং আন্দোলনের চাপে সরকার মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও অন্যদের সঙ্গে কারাগার থেকে ছাড়া পান। তবে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাঁদের ওপরও অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল সে সময়। আসামি বা সাক্ষী হিসেবে চিহ্নিত না হওয়ায় পরবর্তী ইতিহাস বা কোনো লেখালেখিতে এসব স্বাধীনতাপ্রেমীদের নাম আসেনি। এরকম প্রায় এক বছর দুই মাস কারাভোগ করার পর ৬৯ সালের ২১ অথবা ২২ ফেব্রুয়ারি ছাড়া পেয়েছেন এমনই একজন সাবেক নৌসেনা জেড এ খান (জয়নাল আবেদীন খান)।

মামলার অভিযোগপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, করাচিতে অনুষ্ঠিত অন্তত তিনটি বৈঠকে জয়নুল আবেদীন নামে এক ব্যক্তির উপস্থিত থাকার কথা এতে উল্লেখ করা হয়েছে। (দেখুন, অভিযোগপত্রের ৯০, ৯১ ও ৯৩ অনুচ্ছেদ) তবে তদন্তে পরিচয় উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি বলে মন্তব্য করা হয়। ধারণা করা হয় নামের মধ্যে কিছুটা অমিল থাকায় অভিযোগপত্রে আসামি হিসেবে জয়নাল আবেদীন খানের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেও তিনি অংশ নেন।

২০০৭ সালের ১৪ মার্চ দুপুরে পুরানা পল্টনের আজাদ ভবনের বিপরীতে অবস্থিত একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের (জেড এখানের আত্মীয়ের ব্যবসায়িক কার্যালয়) কার্যালয়ে বসে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। তখন তিনি মতিঝিল এলাকায় একজন সাধারণ শেয়ার ব্যবসায়ী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। জেড এখানের জন্ম ১৯৩৮ সালের ১৪ জুলাই পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার ধলাপাড়া গ্রামে। বাবার নাম আবদুল আলী খান।

জেড এ খান জানান, ১৯৫৭ সালে বাউফল থানার কালিশ্বরী উচ্চবিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পর তিনি পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগ দেন একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে।

চাকরিতে যোগ দিয়েই চলে যান করাচিতে প্রশিক্ষণের জন্য। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে বদলি করা হয় নন স্টাবলিশমেন্ট শাখায়। ৬১ সালে তিনি করাচি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন।

পাকিস্তানিরা বলতো 'ইয়্যে বাঙালি এধার আও'

জেড এ খান চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময় শুনেছিলেন, বিএ পাস শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেই সাধারণ সৈনিক থেকে অফিসার হয়ে যেতে পারবেন। অন্য কোনো যোগ্যতার দরকার হবে না। তাই চাকরির ফাঁকে পড়ালেখাও চালিয়ে যান সেখানে। কিন্তু কাজে যোগ দেওয়ার পর দেখেন পাকিস্তানিদের মধ্যে কথা আর কাজে বিস্তর ফারাক। তাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, নিয়োগ-বদলি, কিংবা পদোন্নতি সবকিছুতেই বাঙালিদের প্রতি ছিল চরম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য আর অবহেলা। কথায় কথায় 'ইয়্যে বাঙালি এধার আও' বলে ডাক দিলে মনটা খুবই খারাপ হয়ে উঠতো। এসব ঘটনার রেশ ধরে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে নিজের মধ্যে ক্ষোভ ও ঘৃণার জন্ম হয়। এ অবস্থায় কিছুদিনের মধ্যে বেশ কজন বাঙালি সৈনিকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তাঁর, যাঁরা এরকম বৈষম্যমূলক নীতির ব্যাপারে হতাশ ও ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নূর মোহাম্মদ বাবুল (ক্যাপ্টেন বাবুল নামে পরিচিত), সুলতান উদ্দিন, মফিজুল হক, লে. মতিউর রহমান। এই পরিচয়ের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জানা যাক জয়নাল আবেদীন খানের কথায়;

'তাঁদের (বাঙালি সৈনিকদের) সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণের নানা দিক বেরিয়ে আসে। আলোচনায় মতামত আসে যে, এই বৈষম্য দূর করার জন্য দেশকে (পূর্ব পাকিস্তানকে) স্বাধীন করতে পারলেই সবচেয়ে ভাল হয়। এজন্য কী করা যায়, নিজেদের করণীয় কী হতে পারে, একটা বিপ্লবী কাউন্সিল করা যায় কী-না এসব বিষয়ও আলোচনায় উঠে আসে। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় একাধিক বৈঠক হয়। লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম লে. মতিউর রহমান, নূর মোহাম্মদ বাবুল, সুলতান উদ্দিন এরাই প্রথম দিকে এসব বৈঠক ডাকতেন এবং তাঁরাই আমাকে এতে যুক্ত করেন। আমি তাঁদের সঙ্গে বেশ কটি বৈঠকে ছিলাম। '৬৪ সালের পর সিএসপি রুহুল কুদ্দুসের সঙ্গে অনুষ্ঠিত কয়েকটি বৈঠকেও আমি গিয়েছিলাম। এ ছাড়া (সম্ভবত) ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হকের করাচির বাসা এবং ঢাকার সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছের একটি ঘরেও এক বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম। মূলত আমাদের মধ্যে পক্ষ হয়ে একজন বৈঠক ডাকতেন, আমরা সেখানে যেতাম। আলাপ-আলোচনা শেষে চলে আসতাম। আমাদের শৃঙ্খলা অনুযায়ী অন্যের বিস্তারিত পরিচয় বা কার বাসায় বৈঠক হলো—এসব জানতে চাইতাম না। করাচিতে ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুল জলিলের বাসায় একটি বৈঠকের কথা মনে পড়ে। সেখানে স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, সার্জেন্ট মফিজ উল্লাহও ছিলেন।

সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

জয়নাল আবেদীনের জানামতে, ১৯৬২সালের প্রথম দিক থেকে নানাভাবে আলোচনা

হলেও মূল সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হয় ওই বছরের শেষ দিকে। '৬৫ সালের দিকে এর ব্যাপক বিস্তার ঘটে। তখন আন্দোলনের নানা কৌশলও প্রায় নির্ধারণ হয়ে যায়। নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে নিয়ে একটি কমিটি হয় বিপ্লবী কাউন্সিলের মতো। তবে সবকিছু ছিল অলিখিত। এক একজন সদস্যের ওপর পাঁচ বা দশজন সদস্য সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল। সদস্যরা নিজ দলের সদস্য ও প্রধান ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে পরিচিত হতেন না। এভাবে সারা দেশে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অন্তত কয়েক হাজার সদস্য এ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়। সদস্য ভর্তির প্রথম পর্যায়েই সংশ্লিষ্ট সদস্যকে কোরান শপথ দেওয়া হতো যাতে এই গোপন তৎপরতা সম্পর্কে কোথাও কিছু প্রকাশ করা না হয়।

শেখ মুজিব প্রসঙ্গ

বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ঝুঁকিপূর্ণ সাহসী এই গোপন প্রক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে প্রথম দিককার এই সদস্য জেড এ খান বলেন, 'আমাদের এই কাজের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততার কথা আমি স্পষ্ট জানতে পারি ১৯৬৫ সালের পর। তার আগে আমাদের যেসব বৈঠক হতো সেখানে আলোচনায় উঠে আসতো যে, আমরা কয়েক হাজার সৈন্য একত্র হলে কিংবা বিদ্রোহ করলে তো দেশ স্বাধীন করা যাবে না। এজন্য দরকার জনসমর্থন, রাজনৈতিক সমর্থন। তখন বাঙালিদের মধ্যে বিভিন্ন নেতার ব্যাপারে আলোচনা হলেও অনেকের অভিমত ছিল যে, শেখ সাহেবই একমাত্র বাঙালিদের পক্ষে সাহস নিয়ে কথা বলতে পারেন। এ রকম সিএসপি রুহুল কুদ্দুসের উপস্থিতিতে এক বৈঠকে আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ নেতৃত্বের প্রসঙ্গটি তুললে মোয়াজ্জেম সাহেব বলেছিলেন, 'এ নিয়ে আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। আমরা যোগাযোগ রাখছি, সব ব্যবস্থা হবে। তখনই আমার মনে হয়েছে তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে শেখ সাহেবের যোগাযোগ ছাড়া রুহুল কুদ্দুস সাহেব আমাদের সঙ্গে কীভাবে বৈঠক করেন? তিনি রবিবার ছুটির দিনে বৈঠকের সময় ও স্থান ঠিক করতেন।'

মুক্তিযুদ্ধে জয়নাল আবেদীন খান

সেনা বিদ্রোহের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা কিংবা অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন মামলার কারণে সাময়িকভাবে ভগ্ন হলেও ভবিষ্যতের লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হননি জেড এ খান। তাই একাত্তরে শুরু হওয়া মুক্তিযুদ্ধে আবার সক্রিয় হয়ে উঠেন তিনি। প্রথমে বাঁশ-কাঠ কেটে কৃত্রিম অস্ত্র বানিয়ে এলাকায় লোকজনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। বললেন, '৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার পর মনে হলো আমরা একটা যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কাজেই সেভাবে যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়া প্রয়োজন মনে করেছি এবং এলাকার লোকজন নিয়ে তৈরি হচ্ছিলাম। পরে মুজিবনগর গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিই। সেখানে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ করেছি আমি তৎকালীন সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের অধীনে থেকে।'

আইউব বুঝতে চাননি বাঙালিদের মনের কথা

সৈয়দ ইলিয়াছ ধামী



অবিচার অনাচার আর বৈষম্যের শিকার বাঙালিরাই শুধু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে ঘৃণা করতেন তাই নয়, প্রতিবেশী মুসলিম দেশের অনেকেও ওদের অপছন্দ করতেন। বিশেষ করে এদেশে থেকে যাঁরা পাকিস্তানিদের কীর্তিকাণ্ড দেখেছেন তাঁদেরও বিশ্বাস জমেছিল, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি এভাবে বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না। পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে একদিন স্বাধীন হয়ে যাবে। এমন উপলব্ধিকারী ব্যক্তিদের একজন অধ্যাপক সৈয়দ ইলিয়াছ ধামী। ১৯৬৭সালের শেষ এবং ৬৮সালের মাঝামাঝি সময়ে কথিত আগরতলা মামলার ১ নম্বর আসামি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহধর্মীনি বেগম ফজিলতুন্নেছার মধ্যে কৌশলে চিঠি চালাচালি করে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ ও তথ্যের আদান প্রদানে বিশেষ ভূমিকা রাখেন তিনি।

পাকিস্তানের অতি কাছের তথা সীমান্ত সংলগ্ন আফগানিস্তানের বাসিন্দা কানাডা প্রবাসী ড. শফিক ধামীর ছেলে ইলিয়াস ধামী ১৯৬২ সালের প্রথম দিকে ঢাকায় আসেন পড়ালেখার জন্য। ৬৮ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ছিলেন এদেশে। এখানে থাকার সময় বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি বা বন্ধ হলে বাঙালি ছাত্র বন্ধুদের সঙ্গে চলে যেতেন বিভিন্ন গ্রামে। সেখানে নৌকায় করে ঘুরতেন, নদীতে বা পুকুরে স্নান করতেন, মুগ্ধ হতেন বাঙালিদের বৈচিত্রময় জীবনাচার ও সংগ্রামী চেতনা দেখে। আবার পাকিস্তানি অনেকের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের কারণে ভেতর থেকে উপলব্ধি করার সুযোগ হয়েছে তাদের আচার-আচরণ ও মন মানসিকতা সম্পর্কে, যা তাঁর ভাষায় 'অত্যন্ত বাজে'। তিনি দেখেছেন পাকিস্তানিরা কীভাবে বাঙালিদের ওপর শোষণ বৈষম্য আর অবহেলার স্টিম রোলার চালিয়েছিল। আবার বাঙালি ছাত্র-জনতা ও তাঁদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্যে এসে দেখেছেন তাঁর দেশপ্রেম, সাহস আর জেনেছেন তাঁর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কথা।

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি বুঝেছিলাম বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিদের কোনো অনুভূতি ছিল না, তাদের দূরদৃষ্টি ছিল না যে, বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর কী হতে পারে। আইউব বুঝতে চাননি বাঙালিদের মনের কথা এবং পাকিস্তান কীভাবে টিকবে। তিনি লাঠি-বন্দুক

দিয়ে সবকিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন। আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম এভাবে বাঙালিদের বশে রাখা যাবে না।'

তারুণ্যের সময় সুদর্শন, স্মার্ট আফগান ইলিয়াছ ধামীর সঙ্গে আন্তরিক বন্ধুত্ব ছিল পাকিস্তানি এক সেনা কর্মকর্তার (জিওসি) মেয়ের সঙ্গে। সেই সূত্রে মেয়ে বন্ধুটির সঙ্গে কিংবা একলা সেনানিবাস এলাকায় তাঁর ছিল নির্বিঘ্ন যাতায়াতের সুযোগ। আর সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কৌশলে তিনি চিঠি চালাচালি করতেন কারাবন্দি শেখ মুজিব ও বেগম ফজিলতুন্নেসা মুজিবের মধ্যে।

ইলিয়াছ ধামী জানান, পড়ালেখা শেষে ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি চলে যান আমেরিকা। সেখানে আমেরিকার আইন অনুয়ায়ী বাধ্য হয়ে যোগ দেন সেনাবাহিনীতে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশ নেন মার্কিনীদের পক্ষে। ৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মার্কিন জেনারেল এরেকসনের কাছে যখন জানতে পারেন 'পূর্ব পাকিস্তানে ইন্ডিয়ানরা ঢুকে পড়েছে', তখন মনে খুব খারাপ লেগেছিল তাঁর–কেন এমন হলো? ওই সময় তিনি মালয়েশিয়া বদলি হন। ভাবেন, তিনি যা মনে করছেন অর্থাৎ ইন্ডিয়ানরা বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে তা তো হবার নয়। বরং তাঁর মনে হলো পাকিস্তানিরাই বাঙালিদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছেন। বললেন, 'আমি অনুতপ্ত হলাম। ভাবলাম আমার তো আমেরিকান বাহিনীতে যোগ না দিয়ে বাঙালিদের সঙ্গে থেকে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রয়োজন ছিল। কারণ বাংলাদেশ ও বাঙালিদের জন্য আমার আলাদা একটা অনুভূতি ছিল।'

সৈয়দ ইলিয়াছ ধামী বাংলাদেশে ফিরে আসেন ২০০৪ সালে। বিয়ে করেন এক বাংলাদেশী, মাইজদী জেলার বাসিন্দা সাংবাদিক কামাল উদ্দিনের মেয়েকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী, একে ফায়েজ, ড. শমশের আলীসহ অনেকেই তাঁর সহপাঠি বন্ধু।

২০০৭ সালের ২০ মার্চ বিকেলে ঢাকার ধানমন্ডি সাত মসজিদ সড়কে অবস্থিত বেসরকারি স্টেটস ইউনিভার্সিটির উপাচার্যের কার্যালয়ে বসে আমি তাঁর সাক্ষাৎকার নিই। ওই সময় তিনি স্টেটস ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই লেখা প্রেসে দেওয়ার সময় জানা যায়, তিনি আমেরিকা চলে গেছেন সপরিবারে।

সাক্ষাৎকারে তাঁর দেওয়া বক্তব্যে উঠে এসেছে তৎকালীন পাকিস্তানিদের আচার-আচরণ, অহংবোধ আর বাঙালিদের দেশপ্রেম ও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের নেপথ্য কথা। বিস্তারিত জানা যাক তাঁর বক্তব্যে:

পাকিস্তানিদের সঙ্গে মনের মিল হতো না

'১৯৬২, ৬৩, ৬৪ সালে আমি থাকতাম ঢাকা হলের তৃতীয় তলায় ৩০৯ নং কক্ষে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলাম বায়োকেমিস্ট্রির। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নাশনাল স্টুডেন্ট ফ্রন্ট (এনএসএফ) ছিল একটি শক্তিশালী সংগঠন। যার অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর মোনায়েম খানের এক ছেলে। ডাক নাম

সম্ভবত খোকা। পুরো নাম মনে নেই। তিনি খুব টাকা পয়সা খরচ করতেন সে সময়। এনএসএফের পাঁচ সদস্য ছিল খোকার সঙ্গী। খোকা থাকতেন আমার পাশের কক্ষে। সেখানে যাতায়াতকারী এনএসএফের সদস্য জাহাঙ্গীর ও তোফায়েল আহমদের (আওয়ামী লীগের তোফায়েল নন) কথা এখনো মনে আছে। ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি কিছু ছাত্রও। তখন থেকেই কেন জানি না পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে আমার কখনো মনের মিল হতো না। আমি সব সময় পছন্দ করতাম বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে। প্রায় ৪০ বছর আগের দিনের অনেক স্মৃতি এতদিনে মন থেকে মুছে গেলেও বাঙালিদের ভালোবাসা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কিছু স্মৃতি আজো ভুলতে পারিনি।
ঢাকায় পড়ালেখার জন্য এসে আমার উপলব্ধি হয় যে, পাকিস্তানিরা বাঙালিদের সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করছে। তাদের ব্যবহার, মনমানসিকতা ছিল খুবই বাজে ধরনের। নিজেদের যেন সবকিছুতেই বড় মনে করতো। সবকিছুতে অগ্রাধিকার পেতো উর্দুওয়ালারা। আর্মির ভেতর বাঙালি খুব একটা ছিল না। প্রায়ই দেখতাম পাঞ্জাবি পাঠান। সিপাই থেকে অফিসার প্রায় সেখানকার। ভাবতাম, বাঙালিদের মধ্য থেকে লোকজন নেওয়া হতো না কেন?'
এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ইলিয়াছ ধামী আরো দেখলেন, পাকিস্তানি ছাত্র যারা এখানে ছিল তাদের জন্য রান্না বা খাওয়া-দাওয়ায় বিশেষ ব্যবস্থা হতো। তবে তিনি (ইলিয়াছ ধামী) বাঙালিদের সঙ্গে মিলে মিশে মাছভাত পরটা ইত্যাদি খেতে পছন্দ করতেন। ঢাকার খাজা বিরিয়ানি, ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের পপুলার রেস্টুরেন্ট, গুলিস্তান রেস্টুরেন্ট, রেকস রেস্টুরেন্ট, রমনা রেস্টুরেন্ট ইত্যাদিতে গিয়ে বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন, মজা করতেন। এক পর্যায়ে এখানকার সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে মিশে যান তিনি। বাঙালি সৌখিন ছাত্র গায়কদের সঙ্গে সুর মিলয়ে গাইতেন 'ও মাঝিরে... ।'
বাঙালি সাংস্কৃতিক কর্মীদের এক অনুষ্ঠানে পশ্চিমা এক জেলা প্রশাসকের বাধা দেওয়ার একটি ঘটনার কথা জানালেন ইলিয়াছ ধামী এভাবে "১৯৬৪ সালে একবার ময়মনসিংহ গিয়েছিলাম একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। সেখানকার জেলাপ্রশাসক ছিলেন অবাঙালি। তিনি অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে বললেন, 'এখানে এ ধরনের অনুষ্ঠান হবে না।' আমি জোর গলায় বলে উঠলাম, 'অনুষ্ঠান হবে।' জেলাপ্রশাসক অনেকটা আশ্চর্য হয়েই জানতে চান, 'কে-কে বললো অনুষ্ঠান হবে।' আমাদের সঙ্গী বন্ধুরা বললেন, 'এখানে একজন আফগানী আছেন, তিনি বলছেন।' পাকিস্তানিরা আফগানদের ভয় করতো। জেলাপ্রশাসক আমার কথা শুনে চুপ মেরে চলে যান। সেদিন আমরা অনুষ্ঠান করেই ছাড়লাম।"

জিওসির মেয়ের সঙ্গে সেনানিবাসে

সুন্দর সুঠামদেহী আফগান যুবক ইলিয়াছ ধামীকে বিশ্বাস করতেন পাকিস্তানি অনেকে। সেই সুযোগটা কাজে লাগান তিনি বাঙালির জননেতাকে সাহায্য করার কৌশল হিসেবে। এ প্রসঙ্গে জানা যাক তাঁর জবানবন্দি; "সম্ভবত ৬৬-৬৭ সালে ঢাকার জিওসি ছিলেন

ফজলে মতিন। তাঁর এক মেয়ে 'তাহসিন' পড়তো ঢাকা মেডিকেল কলেজে। মেডিকেলে আসতো ফ্লাগ গার্ডসহ বড় জিপ গাড়ি নিয়ে। যে কোনোভাবেই হোক তার সঙ্গে আমার আন্তরিক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সে আমাকে প্রায় সময় নিয়ে যেতো তার বাসায়ও। এক সঙ্গে হতো খাওয়া দাওয়া।

তবে তার সঙ্গে প্রকৃত ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল ইপিআরের পাকিস্তানি এক পদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে। কিন্তু সে বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরার সময় আমাকে সঙ্গে রাখতো, নিয়ে যেতো। অন্যকে পরিচয় করিয়ে দিতো ফ্রেন্ড হিসেবে। সেই সুবাদে অনেক সময় সেনানিবাস এলাকায় ঘুরতে যেতাম তার সঙ্গে, জিওসির গাড়িতে করে। এসব দেখে সেখানে অনেকেই অবাক দৃষ্টিতে তাকাতো আমার দিকে। সম্ভবত ৬৭ সালের শেষ দিকে কিংবা ৬৮ সালের প্রথম দিকে এক সময় শুনলাম 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে একটি মামলা হয়েছে। বাঙালিদের নেতা শেখ মুজিবসহ অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। শেখ সাহেবের গ্রেপ্তারের খবরে আমি কিছুটা বিচলিত হই। মনে হলো পাকিস্তানিরা এটি নাটক সাজাচ্ছে বাঙালিদের ফাঁসানোর জন্য। আমার তখন চিন্তা ঢুকলো কি করা যায়। কারণ তার আগেই শেখ মুজিবের সঙ্গে আলাপে, তাঁর ব্যবহারে তাঁর প্রতি আমার এক ধরনের আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। পরে তাঁর সঙ্গে জেলখানায় বেগম মুজিবের চিঠি চালাচালির মাধ্যমে একটা যোগাযোগ স্থাপন করে দিই। ওই ঘটনা আমার কাছে খুবই অনন্দের ঘটনা, সৌভাগ্যের ঘটনা বলে মনে হয়।' কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব যেখানে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় আটক নেতা-আসামিদের সঙ্গে তাঁদের নিকট আত্মীয়রা পর্যন্ত দেখা করার অনুমতি পাওয়া অসাধ্য ছিল?"

ইলিয়াছ ধামী বলেন, "এ ঘটনার বেশ আগেই ছাত্র লীগের বেশ কিছু নেতা-কর্মীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক সম্পর্ক না হলেও ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানে এবং কখনো কখনো মজা করার জন্য আমি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতাম মিছিল সমাবেশে। এরকম সম্পর্কের সূত্র ধরে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ (পরবর্তী আওয়ামী লীগ নেতা) এবং অন্য দু'একজন ছাত্রলীগ নেতার সঙ্গে শেখ সাহেবের ধানমন্ডীর বাসভবনে যাওয়ার সুযোগ হয় আমার। তাঁর মতো নেতার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমার খুব ভালো লাগে। তিনিও দেখি আমাকে স্নেহ করতেন, পছন্দ করতেন। অন্যদের সঙ্গে একাধিকবার যাওয়ার পর এক সময় তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে একা দেখা করার কথা বলেন। আমার কৌতুহল জাগে, ভালোও লাগে। এরপর ওপরে দোতলায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে কয়েকবার একাকী দেখা করি। ওনার ছেলেরা মিউজিক করতেন। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় ধমক দিয়ে ছেলেদের মিউজিক করা থামিয়ে দিতেন।

শেখ সাহেবের সাথে কথা বলে মনে হয়েছিল তিনি পাকিস্তানিদের ওপর ভীষণ ক্ষ্যাপা ছিলেন। ৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আমি বাংলাদেশে ছিলাম। দেখি যুদ্ধ তো পশ্চিম ফ্রন্টেই হয়েছিল। মনে হয়েছে আইউব খান ভুল করেছেন। যুদ্ধ শুরুর আগে অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার কথাটি একবার ভাবা উচিৎ ছিল তাঁর। এখানে মাত্র ছয়টি যুদ্ধ

বিমান ও এক ডিভিশন সৈন্য ছিল। সে সময় ভারত যদি সিদ্ধান্ত নিত যে, সে এখানে ঢুকে যাবে তাহলে অনায়াসেই তা পারতো। এত দুর্বল ছিল সবকিছু।"

বুঝে যাই ছয় দফার মানে কী

ছয় দফার প্রসঙ্গ টেনে ইলিয়াছ ধামী বললেন, "৬৫ সালের যুদ্ধের পরই ছয়দফা সামনে আসে। শেখ সাহেব বলছিলেন, 'তুমি (পাকিস্তান সরকার/আইউব খান) আমাদের অরক্ষিত রেখে ওখানে (পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে) যুদ্ধ শুরু করেছো। লাহোর ফ্রন্টে পাকিস্তানিদের যে আক্রমণ সেটা ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জওয়ানদের কৃতিত্ব। তাঁরাই লাহোর রক্ষা করেছে। বাঙালিরা না হলে লাহোরও দ্রুত চলে যেত, যেভাবে সেখানে ভারতীয়রা বিমান হামলা শুরু করে।' ওই সময় আমার মনে হয়েছে আইউব খান একজন বাজে ফিল্ড মার্শাল। এরপর শেখ সাহেব ছয় দফা ঘোষণা করলে আমি বুঝে যাই এর মানে কী! যদিও তিনি সেপারেশনের কথা নয়, কনফেডারেশনের কথা ভাবছিলেন। ওনার সঙ্গে (শেখ মুজিবের সঙ্গে) কথা বলে মনে হয়েছিল উনি ভেতরে ভেতরে চেয়েছিলেন তোমরা ওখানে থাক, আমরা এখানে থাকি। এটা ভালো লেগেছিল আমারও। আগরতলা মামলার আগে একবার আমি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম তিনি আসলে কি চান? তিনি আমার কাছে পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'তোমার কি মনে হয় আমরা একসাথে থাকতে পারব?' আমি তখন বলেছিলাম, 'আমি ছাত্র মানুষ, আপনি নেতা, আপনিই ভালো বুঝবেন।"

মুজিব-বেগম মুজিবের চিঠি চালাচালি যেভাবে

এদিকে আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হয়ে গেলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ইলিয়াছ ধামীর। তবে যোগাযোগ বজায় ছিল বেগম মুজিবের সঙ্গে। সে সময় রাষ্ট্রদ্রোহের মতো অভিযোগের শিকার হওয়ার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তিনি রাখলেন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ ব্যাপারে ইলিয়াছ ধামী বলেন, "একদিন বিষণ্ন মনে বেগম মুজিব বললেন, 'কী করবো বুঝতে পারছি না। তাঁর সঙ্গে (শেখ মুজিবের সঙ্গে) যোগাযোগ করতে পারছি না, খবর ও পাচ্ছি না।' আমি বললাম, 'আপনি একদম চিন্তা করবেন না। আমি এখানে এলে কিংবা জেলখানায় গেলে কেউ কিছু বলবে না।' শেখ সাহেবের বাসা এবং আশেপাশে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনের নজরদারি ছিল। কিন্তু আমি ভয় পেতাম না। এরপর বেগম মুজিব আমাকে বিশ্বাস করে শেখ সাহেবকে দেওয়ার জন্য চিঠি দিতেন। আমি সেগুলো নিয়ে সেনানিবাসে তাঁকে দিয়ে আসতাম। এদিক সেদিক ঘোরাফেরার ছলে সুযোগ পেলেই ঢুকে পড়তাম ওনার কক্ষে। বালিশের কভারের ভেতর কৌশলে গুঁজে দিতাম চিঠিগুলো। আবার সেখানে রাখা শেখ সাহেবের পাল্টা চিঠি নিয়ে পৌঁছে দিতাম বেগম মুজিবকে। সেনানিবাস এলাকায় দায়িত্বশীলদের প্রায় সবাই আমাকে ভালো জানতেন, বিশ্বাস করতেন। জিওসির মেয়ের বন্ধু হওয়ায় তেমন সন্দেহ করতেন না কেউ। কিছু বলতেন না। অনেকে এটাও জানতেন যে, আমি এক আফগান। জিওসির মেয়ের সঙ্গে কয়েকবার যাওয়া আসার এক পর্যায়ে কারাগারের ইনচার্জ এক মেজরের সঙ্গে আমি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক

গড়ে তুলি। তাঁর জন্য মাঝে মাঝে মিষ্টি, মোগলাই পরটা, কাবাব ইত্যাদি নিয়ে যেতাম। তিনি খুব পছন্দ করতেন এসব। দুজন বসে এক সঙ্গে খেতাম। ওদিকে শেখ সাহেব তাঁর কক্ষের ভেতর থেকে আমাকে দেখলেই গার্ডকে অনুরোধ করতেন তাঁকে বারান্দায় হাঁটতে দেওয়ার জন্য। আর উনি বারান্দায় হাঁটাহাটি করার সময় আমি ঘোরাঘুরির ছলে কক্ষে ঢুকে বেগম মুজিবের চিঠি দিয়ে শেখ সাহেবের রাখা চিঠি নিয়ে চলে যেতাম। এ রকম চার পাঁচ বার যাওয়া আসার পর একদিন মনে হলো এক অফিসার আমাকে সন্দেহ করছেন। তিনি আমার কাছে পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি একজন আফগান ছাত্র হিসেবে পরিচয় দিয়ে সেখানকার দায়িত্বে নিয়োজিত মেজরের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা জানাই। পরে তিনি আমাদের মধ্যে মেলামেশা দেখে আর কিছু বলেননি। প্রসঙ্গত ওই মেজরের পরিবার সেখানে ছিল না। মেসে তিনি থাকতেন একা। আমার জন্য সুবিধা ছিল যে, শেখ সাহেবের কক্ষের কাছেই ছিল মেজরের কক্ষটি। জেলখানা এলাকায় যাওয়া আসার সময় সার্জেন্ট জহুরুল হক, ডা. ছৈয়দুর রহমানসহ আরো কয়েকজনকে দুএকবার দেখেছি। জেনেছি তাঁরাও আগরতলা মামলার আসামি। অবশ্য তাঁদের কারো সঙ্গে সে সময় আমার কথা হয়নি। গার্ডের কাছে জেনেছি ওদের নাম।

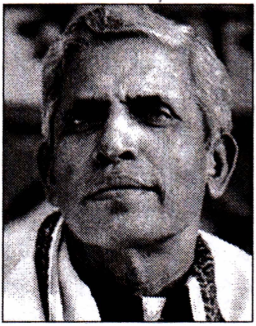
আমাদের কাজের কথা আসলে অন্য কেউ জানতেন না। শেখ সাহেব, বেগম মুজিব এবং আমি বুদ্ধি করে কৌশলে নিরবে ঝুঁকি নিয়ে কাজটি করেছিলাম। অবশ্য আমি বাংলা পড়তে পারতাম না। ওইসব চিঠিতে কী লেখা থাকতো তাও সঠিক জানতাম না।

এসব নিয়ে কিংবা মামলার বিষয়বস্তু নিয়ে শেখ সাহেবের কাছেও কিছু জানতে চাইনি কখনো। তবে বেগম মুজিবের কথাবার্তায় আঁচ করতে পারতাম চিঠিগুলোতে তাঁরা মামলার গতি-প্রকৃতি, বাইরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জেলের ভেতরকার অবস্থা এবং কার কী করণীয় এ জাতীয় তথ্য পরামর্শ দেওয়া-নেওয়া করতেন। আসলে সে সময় শেখ সাহেবের ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেম আমাকে এমনভাবে আকর্ষণ করেছিল যে, তাঁর জন্য কিছু করতে পারা আমার কাছে আনন্দ ও গৌরবের মনে হয়েছিল। দেশের তখনকার পরিস্থিতি দেখে আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে, বাংলাদেশ একদিন সত্যিই স্বাধীন হয়ে যাবে। কারণ এভাবে পরস্পর অবিশ্বাস-শোষণের মধ্যে তো দুই পাকিস্তান এক থাকা যায় না।"

ইলিয়াছ ধামী ৬৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ ছেড়ে আমেরিকা চলে যাওয়ার মাত্র চার বছরের মাথায় জানতে পারেন তাঁর সে বিশ্বাস সত্যে পরিণত হয়েছে। বাঙালিরা 'পূর্ব পাকিস্তানের নাম মুছে দিয়ে এদেশের নামকরণ করেছে 'বাংলাদেশ' এবং বিশ্বদরবারে আত্মপ্রকাশ করেছে স্বাধীন জাতি হিসেবে।

সামরিক-বেসামরিক সবার অবদান ছিল

আবদুর রাজ্জাক



ষাটের দশকের স্বাধীনতাপন্থী প্রগতিশীল ছাত্র নেতা হিসেবে খ্যাত ও স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াসের প্রথম সারির সংগঠকদের অন্যতম ছিলেন আবদুর রাজ্জাক। ওই সময়ে প্রগতিশীল ছাত্রসমাজকে নিয়ে পরিচালিত প্রকাশ্য ও গোপন কর্মকাণ্ডের অনেক কিছুর সাক্ষী তিনি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনেও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তাঁর। স্বাধীনতার পর তিনি জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রধান, একাধিকবার সাংসদ ও মন্ত্রীত্বসহ আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ২০০৭ সালের ২২ মার্চ সকালে রাজধানীর নাখালপাড়া এমপি হোস্টেলে গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। এসময় তিনি তুলে ধরেন স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি, এতে প্রগতিশীল প্রবীণ-নবীন রাজনীতিবিদ, সরকারি আমলা, ছাত্রসমাজ ও সশস্ত্রবাহিনীর তৎকালীন বাঙালি সদস্যদের ভূমিকার ব্যাপারে তাঁর জানা নানা কথা।

আবদুর রাজ্জাক বলেন, '১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ছাত্র-যুবসমাজসহ সর্বস্তরের মানুষ যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার সূচনা ও প্রস্তুতি ছিল দীর্ঘদিনের। আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগসহ অনেক রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন এবং বাঙালি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবদান এ প্রস্তুতিতে ছিল। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীসহ আরও অনেকে স্বায়ত্বশাসন, স্বাধিকার ইত্যাদির স্বপ্ন মানুষের মনে জাগিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য অর্জনে অটল থেকে পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধুর মতো কেউ এগিয়ে যেতে পারেননি। পূর্ব বাংলা মুক্তিফ্রন্ট, স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস, ছয় দফা, পশ্চিম পাকিস্তানে বাঙালি সেনা সদস্যদের সংগঠিত করা সবই স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এক একটি পদক্ষেপ। সব কিছুতেই ছিল তাঁর নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা।'

বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'তখনকার দিনে বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি বিবেচনার মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দল করা কঠিন হবে ভেবে

বঙ্গবন্ধু ৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সংগঠন করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির আগে শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম প্রমুখ নেতা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, পাকিস্তানিদের শাসন-শোষণের চিত্র দেখে বঙ্গবন্ধু সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের চিন্তা করেন।

গোপন তৎপরতা ও স্বাধঅন বাংলা নিউক্লিয়াস গঠনের পটভূমি

স্বাধীনতার লক্ষ্যে ছাত্রলীগকে সংগঠিত ও স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস গঠনের পটভূমি ব্যাখ্যা করে সাবেক ছাত্রনেতা আবদুর রাজ্জাক বলেন, "স্বাধীনতার স্বপ্নকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু এ ব্যাপারে আন্দোলনের যথাযথ সুযোগ ও ক্ষেত্র খুঁজেন। ভাষার দাবি, ভাষার জন্য রক্তপাত ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর বাঙালিদের নেতৃত্বে সরকার গঠন এবং ৫৬ সালে একটি সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালিদের কিছু দাবি দাওয়া পূরণের সম্ভাবনা দেখা দিলেও নানা কারণে তা হয়নি। ৫৮ সালে আইউব খানের সামরিক শাসন জারির ফলে প্রকাশ্য রাজনীতির সুযোগ বন্ধ হয়ে গেলে বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগকে গোপনভাবে সংগঠিত করার মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ ব্যাপারে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনসহ কয়েকজন সিনিয়র ছাত্রনেতার সঙ্গেও পরামর্শ করেন তিনি। শাহ মোয়াজ্জেমকে সভাপতি ও শেখ ফজলুল হক মনিকে সাধারণ সম্পাদক করে ৬১ সালে গঠিত ছাত্রলীগের কমিটিতে সিরাজুল আলম খান এবং আমিসহ আরো কয়েকজন বিভিন্ন পদে ছিলাম। ৬২তে সোহরাওয়ার্দী গ্রেপ্তার হলে তাঁর মুক্তি, সামরিক আইন প্রত্যাহার, হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল ইত্যাদি দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা সংগঠিত হতে থাকি। এ পর্যায়ে সেনাবাহিনীতে বাঙালির সংখ্যা বাড়ানোর দাবি উঠে। আইউব খান বলেছিলেন 'বাঙালিরা যুদ্ধ করতে জানে না। এরা জানে শুধু জুতো সাফ করতে। তাই তাদের আর্মিতে নেওয়া যাবে না।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এ কথা জানতে পেরে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। মনে আছে আমি এবং সিরাজ ভাই (সিরাজুল আলম খান) আলাপ করছিলাম পেছনের দিকে বসে। সিরাজ ভাইকে বললাম, 'এভাবে আর থাকা যায় না। আসুন একটা কিছু করি।' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ' আমিও চিন্তা করছি, কিছু একটা করতে হবে।'

এর আগে থেকে সিরাজ ভাই, শেখ মনি, ওবায়দুর রহমানরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তিনিই তাঁদেরকে বলেছিলেন কিছু একটা করা দরকার। সিরাজ ভাই বঙ্গবন্ধুকে সবসময় 'লিডার' সম্বোধন করতেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার সরাসরি কথা হয় ৬৩ সাল থেকে। ইতিমধ্যে স্বাধীনতার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আন্দোলন পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধুকে সর্বাধিনায়ক করে 'স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস' গঠন করা হয়। শুরু থেকে এর সদস্য ছিলেন সিরাজুল আলম খান, আমি এবং কাজী আরেফ আহমেদ। এই নিউক্লিয়াসই ছিল মূলত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের অন্যরূপ। ৬৪ সালে আমাদের কার্যক্রমের একটি

রূপরেখা তৈরি হয়। আমরা সাইক্লোস্টাইল মেসিনে এ সংক্রান্ত একটি প্রচারপত্র বের করি। পরে একটি ট্রেডল মেসিন (মুদ্রণযন্ত্র) কিনে মোহাম্মদপুরের একটা বাড়ির চিলেকোটায় সেটি বসানো হয়। বাড়িটি ঠিক করেন কাজী আরেফ আহমদ। প্রথম দিকে আমাদের সঙ্গে শিক্ষক সমিতির আবুল কালাম আজাদ ছিলেন। পরে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। প্রেসটিও বিক্রি করে দেওয়া হয়।

নিউক্লিয়াসের কাজে তখন তাত্ত্বিক সহযোগিতা দিতেন অ্যাডভোকেট কমরুদ্দিন। তিনি সোহরাওয়ার্দীর আমলে বার্মায় বাংলাদেশের হাই কমিশনার ছিলেন। 'হিসট্রি অব বেঙ্গল' নামে একটা অধ্যায় আমাদের এই লাইনের ক্যাডারদের জন্য তিনি পাঠ্য করেছিলেন। চে-গুয়েভারা, মাও সেতুং এবং আলজিরিয়ার ওপর একটি বইসহ আরও বেশ কিছু বই আমাদের পাঠ্য ছিল। এসব কিছুই হচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর অনুমতিক্রমে।

স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি এবং ছয় দফা

স্বাধীনতার জন্য ছাত্রলীগের তৎপরতা এবং ছয় দফা প্রসঙ্গে আবদুর রাজ্জাক বলেন, "৬৬সালে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করেন। ছাত্র ও শ্রমিকদের সংগঠিত করার পাশাপাশি ছয় দফার পক্ষে প্রচারের কাজও আমরা চালিয়ে যাই। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি– আবার ছয় দফা কেন- জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন 'ওপারে যাওয়ার সাঁকো তৈরি করে দিলাম।'

লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বঙ্গবন্ধুর অনুমতি সাপেক্ষ আমরা একটা পরিকল্পনা তৈরি করি। সে অনুযায়ী প্রতিটি থানায় যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে একজনকে প্রধান করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট গ্রুপ তৈরি করা হয়। প্রথম দিকে তারা ছয় দফা, স্বায়ত্বশাসন ইত্যাদি নিয়ে জনগণের সঙ্গে কাজ করতেন। কিছুদিন গ্রুপে থাকার পর রক্ত শপথের মাধ্যমে তাঁদেরকে স্বাধীনতার জন্য কাজ করার প্রস্তুতি নেওয়ার বিষয়টি জানানো হতো। গ্রুপের সদস্যদের একটি প্রচারপত্র দেওয়া হতো, যাতে থাকতো আমাদের লক্ষ্য, কর্মসূচি, গেরিলা যুদ্ধের কৌশল ইত্যাদি। সংশ্লিষ্টদের মধ্যে পুলিশ তথা গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কিত কেউ আছে কী না যাচাই করা হতো। বঙ্গবন্ধু তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় একটি ছোট ট্রানজিস্টার খুলে রাখতেন যাতে বাইরের কোনো মহল আমাদের পরিকল্পনার কথা ধরতে না পারে।

আগরতলা মামলায় গ্রেপ্তার হবার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমাদের কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। ৬৯ সালে তিনি জেল থেকে বের হওয়ার পর আমাদের কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চান। ইতিমধ্যে আমাদের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, মানিকগঞ্জ ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জেলার তিনশ সংসদীয় থানার প্রায় ২০০ থানায় কমিটি হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে শক্তিশালী ছিল চট্টগ্রামের গ্রুপটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতেও শক্ত দল ছিল আমাদের। এ মুহূর্তে আমার চট্টগ্রামের এমএ মান্নান, আদমজীর এক শ্রমিক নেতা মান্নান, অ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদ, এসএম ইউসুফ, মোকতার আহমদ প্রমুখের কথা মনে পড়ছে। আরও অনেকে ছিলেন সারাদেশে–যাঁরা স্বাধীনতার জন্য শপথ

নিয়ে আমাদের দলভুক্ত হয়েছিল। আমাদের অগ্রগতি জানার পর সবকিছুই বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিক অনুমোদন করেন। আমাদের কার্যক্রমে যুক্তদের নিয়েই পরবর্তীতে মুজিব বাহিনী গঠিত হয়েছিল।'

স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রচারণা '৬১-তে

পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ছাত্র-জনতার মধ্যে মন্ত্রবীজ ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য ১৯৬১ সালে প্রচারিত একটি গোপন প্রচারপত্র বিলি করার অভিজ্ঞতার কথা জানান আবদুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, ‘‘আমাদের জানার বাইরেও বঙ্গবন্ধু অনেককে দিয়ে অনেক কাজ করিয়েছেন। ৬১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরের কথা। একদিন মনিভাই (শেখ ফজলুল হক মনি) আমাকে ডেকে কাগজে মোড়ানো কতগুলো প্রচারপত্র দিয়ে বললেন, ‘এগুলো রাত তিনটার দিকে ভার্সিটি এলাকার হলে হলে, ঘরে ঘরে খুবই সাবধানে বিলি করতে হবে।' তিনি চলে যাওয়ার পর সেগুলো খুলে দেখে প্রথমে আমি ঘাবড়ে যাই। কারণ সেখানে যা লেখা-ধরা পড়লে ১৪ বছর জেল নির্ঘাত। শিরোনাম ছিল ‘স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কায়েম কর।' নিচে লেখা ছিল ‘সংগ্রামী জনতা'। সেখানে বাঙালিদের ওপর পশ্চিমাদের শাসন-শোষণ এবং সশস্ত্র বাহিনী ও রাজনীতিতে কীভাবে বাঙালিদের বঞ্চিত করা হচ্ছে তার বিবরণ দেওয়া ছিল। এসব শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্য বাঙালি ছাত্র-জনতাকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানানো হয় ওই প্রচারপত্রে। আমার মনের ভেতর যেহেতু স্বাধীনতার চেতনাটা ছিল, তাই সাহস করে রাতের মধ্যে ফজলুল হক হলের বিভিন্ন ঘরে গিয়ে দরজার নিচ দিয়ে প্রচারপত্র ঢুকিয়ে দিয়ে চলে আসি। বাকিটুকু একটি টয়লেটের বেসিনের ওপর রেখে রুমে এসে শুয়ে থেকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি। সকালে আমার রুমমেট বাইরে গিয়ে ফিরে এসে বললো, ‘বাইরে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের লিফলেট পাওয়া গেছে।' আমি কিছু না জানার ভান করে বললাম, ‘এগুলো বিপজ্জনক, বাইরে ফেলে দে, কাউকে কিছু বলিস না।'

এই প্রচারপত্রও আমাদেরকে স্বাধীনতার জন্য উজ্জীবিত হতে প্রেরণা যুগিয়েছে। ১৯৬২তে নিউক্লিয়াস গঠনের সময় বিষয়টি আলোচনায় এসেছিল। মনি ভাই বলেছিলেন, ‘এটা বঙ্গবন্ধু করিয়েছেন। মানিক মিয়াও (তোফাজ্জল হোসেন মানিক, ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক) এতে যুক্ত আছেন।' পরে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকেও বিষয়টি জেনেছি। ৬৭ সালে মানিক মিয়াও এটি স্বীকার করেন। ছয় দফা আন্দোলনের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু জেলে থাকা অবস্থায় পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (পিডিএফ) গঠিত হলে সেখানে ছয় দফা বিরোধী নেতারা সব অংশ নেন। মানিক মিয়াও ছিলেন সেখানে। তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে আমার কাছে জানতে চান, এখন আমরা কী করছি। আমরা আমাদের আন্দোলন কর্মসূচির চিন্তা ভাবনার কথা বললে তিনি বললেন, ‘এগুলো করে লাভ হবে না। ঐক্য ছাড়া শেখ মুজিব জেল থেকে আসতে পারবে না। সবাই জেলে মারা যাবে। তখন কি হবে?' আমি স্বাধীনতার জন্য চারদিকে যে আলোচনা হচ্ছে সে ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি

বললেন, 'কিসের স্বাধীনতা?' আমি তাঁকে ১৯৬১ তে বিলি করা প্রচারপত্রে তিনি এবং বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন তা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বলেন, 'দেখ ওসব এখন বাদ দাও। বর্তমানে টোটাল কৌশল পরিবর্তন হয়ে গেছে, গ্লোবাল স্ট্যাটেজি চেঞ্জ হয়ে গেছে।' ওই সময় ছয় দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগে বিভক্তি আসে। শেষ পর্যন্ত ছয় দফা পন্থীরা জয়ী হয়। এরপর আগরতলা মামলা প্রত্যাহারসহ সংশ্লিষ্ট সবার মুক্তি দাবি এবং ছয় দফা ও ১১ দফার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সত্তরের নির্বাচন এবং ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের।

বাঙালি সেনা সদস্যদের ভূমিকা প্রসঙ্গে

ছাত্র সংগঠনের বাইরে অর্থাৎ সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'আমাদের কর্মকাণ্ড ছাড়াও বঙ্গবন্ধু গোপনে নানা কৌশলে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ তৈরি করে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব থাকতেই তাঁর অগোচরে এসব শুরু করেন বঙ্গবন্ধু। নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করলেও ১৯৫৬ সালের সংবিধান রচিত হওয়ার পর সোহরাওয়ার্দী '৯৮ ভাগ স্বায়ত্বশাসন হয়ে গেছে' বলে মন্তব্য করলে বঙ্গবন্ধু তা মেনে নিতে পারেননি। তখনই তিনি ভেতরে ভেতরে অন্য পথ ধরেন। সোহরাওয়ার্দীর ছত্রছায়ায় থেকেই তিনি সিএসপি রুহুল কুদ্দুস, আহমদ ফজলুর রহমান, খান শামসুর রহমানদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শক্রমে প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু করেন। একই সঙ্গে জাতীয় সংসদের কাজে করাচি গেলে সেখানে সশস্ত্র বাহিনীর বঞ্চিত ও হতাশ দেশপ্রেমিক বাঙালি সদস্য–যাঁরা পরে আগরতলা মামলার আসামি হন তাঁদেরকে সংগঠিত করেন। ওই সময় এত গভীরে আমরা যাইনি। তাই তাঁদের কার্যক্রম সম্পর্কে ভালো করে জানতাম না। তবে মনিভাই, সিরাজ ভাই কিছু কিছু জানতেন। আমি জানতে পারি মামলা শুরু হওয়ার পর। এর আগে তাঁদের কাছে জেনেছিলাম ৬২-৬৩ সালে বঙ্গবন্ধু আগরতলা গিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে আলোচনার জন্য। আমাদের আন্দোলনের প্রস্তুতি প্রক্রিয়া চলার সময় দু-একজন বাঙালি সেনা সদস্য মাঝে মধ্যে যোগাযোগ করে আমাদের আন্দোলন নিয়ে কথা বলছিলেন। কিন্তু তখন তাঁদের পরিচয় পাইনি। মামলা চলাকালে জেলখানায় গিয়ে তাঁদের আসল পরিচয় জানতে পারি। আগরতলা মামলা থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পর পরিষ্কার জানতে পারলাম যে বঙ্গবন্ধু ষাটের দশকের শুরু থেকেই এসব কাজ ভেতরে ভেতরে চালাচ্ছিলেন।'

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা প্রসঙ্গে আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'একাত্তরের ১৮ ফেব্রুয়ারি কি ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আমাদের ডেকে বললেন, 'ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হয়ে যা। যুদ্ধ শুরু হলে ভারতের সহযোগিতা পাওয়া যাবে। আমেরিকা ও চীন সমর্থন দেবে না। তবে রাশিয়ার সমর্থন এক পর্যায়ে আসবে। ভারতে গিয়ে যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে তাঁদের তালিকা এবং ঠিকানাও দেন তিনি। এসব কিছুই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রস্তুতির প্রমাণ বহন করে।'

সব পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা

কাজী আরেফ আহমেদ



স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য, ৬০ এর দশকের প্রভাবশালী ছাত্র ও যুবনেতা, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমেদ বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত ছাত্র-যুব কর্মীদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তাঁর সাথে আমি যোগাযোগ করি ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে। ৯ ডিসেম্বর তিনি চট্টগ্রাম এলে ওইদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম পূর্বাঞ্চলীয় রেলওয়ে রেস্টহাউজে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আগরতলা মামলা ও স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গঠন তথা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-পরিকল্পনার কথা জানতে চাই তাঁর কাছে। এ সময় বিশিষ্ট সাংবাদিক আবেদ খানও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। কাজী আরেফ প্রথমে ইতস্তত করছিলেন এই বলে যে, প্রকৃত সত্য ওই মুহূর্তে প্রকাশ করা উচিৎ হবে কি না। আমি বিধান সেনের কাছ থেকে নেওয়া সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ তুললে আবেদ খানও সাঁয় দিয়ে বললেন, 'এখন তো আর লুকিয়ে রাখার কিছু নেই। ও তো (এ লেখক) চট্টগ্রামে বসে বেশ কাজ করছে।' এরপর কথা বলতে রাজি হন কাজী আরেফ। জানান কিছু ঐতিহাসিক সত্য তথ্য।

ভিন্ন সময় ভিন্ন কৌশল

কাজী আরেফ বলেন, 'পাকিস্তানি শাসন-শোষণ থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শুরু থেকে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সব পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। এ জন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। ১৯৬১ সালেই তিনি ভারতের সাথে যোগাযোগ করেন। আগরতলা যাবার পথে একবার সীমান্তে ধরাও পড়েন তিনি। 'পূর্ব বাংলা মুক্তিফ্রন্ট নামে' একটি গোপন সংগঠন ও গড়ে তুলেছিলেন তিনি (আবদুর রাজ্জাক ও বিধান সেনের বক্তব্য দ্রষ্টব্য) যাতে চিত্তরঞ্জন সূতার ও আবদুর রব সেরানিয়াবত যুক্ত ছিলেন। পাকিস্তানের করাচিতে অবস্থিত বিক্ষুব্ধ বাঙালি কিছু সেনা কর্মকর্তা ও সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিষয়টিও সত্য ছিল। কিন্তু ৬৮ সালে আগরতলা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এসব বিষয় সরাসরি স্বীকার করা সম্ভব ছিল না। বাধ্য হয়ে বঙ্গবন্ধুসহ সবাই সবকিছু চেপে

যান। এভাবে বিষয়টি ইতিহাসের পাতায় যথাযথ গুরুত্ব পায়নি।' তবে এখন সেই সব দিনের সংগ্রামের নানান দিকগুলো জনগণের জানা প্রয়োজন বলে কাজী আরেফ স্বীকার করেন। কেননা এসবে কলঙ্কের কিছুই নেই, বরং এটি বাঙালি জাতির জন্য গর্বের ইতিহাস। ওইদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলার স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর কর্মপরিকল্পনার আরো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে ঢাকায় গিয়ে আরো বিস্তারিত লিখে আমার কাছে (লেখকের কাছে) পাঠানোর কথা বলেন। কিন্তু এর কিছুদিন পর তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

তবে ১৯৯৯ সালের ১৫ জানুয়ারি 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা' ঈদ সংখ্যায় 'আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অন্বেষনে' শিরোনামে এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয় কাজী আরেফ আহমেদের। এতে ষাটের দশকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি যা লিখেন তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে–'৬১ সালেই শেখ মুজিব চিত্তরঞ্জন সুতার ও আবদুর রব সেয়নিয়াবতসহ কয়েকজন রাজনীতিককে নিয়ে 'পূর্ব বাংলা মুক্তিফ্রন্ট' নামে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এঁদের সিদ্ধান্ত ছিল প্রয়োজনে সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করতে হবে। একইভাবে স্বাধীনতায় বিশ্বাসী কর্মী সৃষ্টি, বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য ন্যায় সংগত দাবি দাওয়ার আন্দোলনকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা আন্দোলনে উন্নীত করতে হবে। এই সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তাঁকে (কাজী আরেফ আহমেদকে) দিয়ে ছাত্রলীগের মধ্যে গড়ে তোলা হয় একটি গোপন ধারা যা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে পরিচিত হয়। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, কর্মীদের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়াসহ সার্বিকভাবে তৈরি করার লক্ষ্যে ওই তিন ছাত্রনেতাকে নিয়ে ৬৪ সালে গঠন করা হয় 'কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস'।

সহযোগিতার জন্য ভারত-লন্ডনে বঙ্গবন্ধু

কাজী আরেফ আহমদের প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, ৬৬ সালের ৮ মে থেকে ৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় মি. চিত্তরঞ্জন সুতারের সাথে শেখ মুজিব (আগরতলা মামলার আসামি হিসেবে সেনা ছাউনিতে নিয়ে যাবার আগে) বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় স্বাধিকার আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরের কৌশল নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। এরই মধ্যে সরকার পক্ষ শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে ক্যামেরা ট্রায়ালের ব্যবস্থা করে। এতে 'তিনি (মুজিব) ৬২ সালে ভারতের আগরতলা গিয়ে ভারতের সাথে যোগসাজশে পাকিস্তানকে বিভক্ত করে তথাকথিত বাংলাদেশ সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত' বলে উল্লেখ করা হয়। পরে তাঁকে আগরতলা মামলার এক নম্বর অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ক্যামেরা ট্রায়ালের সমস্ত বক্তব্য শুনে শেখ

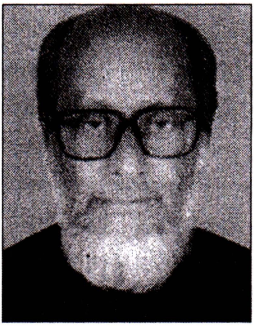
মুজিব চিত্তরঞ্জন সুতারকে জানান, 'ওরা (পাকিস্তানিরা) আমার সব কিছু জেনে গেছে, তাই এ পথে আর নয়, অন্য পথে এগুতে হবে। পাকিস্তানি শাসন, শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তর করা এবং ওদের মুখোশ উন্মোচন করে বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও জাতির সমর্থন আদায়ের চেষ্টা ও পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে হবে। এই আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব ৬৯ সালে জেল থেকে মুক্তির পর চিত্তরঞ্জন সুতারকে ভারত পাঠান ইন্দিরা গান্ধী ও ভারত সরকারের সহযোগিতা-সহানুভূতি আদায়ের জন্য। বঙ্গবন্ধুর বিশেষ দূত হিসেবে কোলকাতা গিয়ে ভবানীপুরে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে অবস্থান করেন চিত্ত রঞ্জন। অপরদিকে বঙ্গবন্ধু নিজে চিকিৎসার নামে লন্ডন যান আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে। যাবার আগে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের নিউক্লিয়াসের সাথে বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমার ওপর তোমরা আস্থা রেখ। পাকিস্তানি সম্ভাব্য হামলা ও বাঙালি জনগণের ওপর শক্তি প্রয়োগের সম্ভাব্য প্রস্তুতির বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করা, তোমাদের প্রশিক্ষণ, অস্ত্রশস্ত্র ও সমর্থন আদায় করাই আমার এ যাত্রার প্রধান লক্ষ্য।' লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর ৭১ এর ফেব্রুয়ারি মাসে বিপ্রবী পরিষদের ৬০ জনকে ভারতে প্রশিক্ষণে পাঠানোর প্রস্তুতি নিতে বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দেন। কিন্তু সে সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের কারণে সেই প্রশিক্ষণের সময় পিছিয়ে যায়।

এর আগে ২১ জানুয়ারি চার যুবনেতাকে কোলকাতায় ভবানীপুরের চিত্ত রঞ্জন সুতারের ঠিকানা দিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এই ঠিকানায় গেলেই তোমরা প্রবাসী সরকার, সশস্ত্র বাহিনী গঠন, প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রশস্ত্রের সহযোগিতা পাবে।' তিনি ওই ঠিকানা চার যুবনেতা ছাড়াও তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানকেও দেন এবং সেখানে যাবার নির্দেশ দেন।

পরবর্তীতে আমরা দেখি সেই চার নেতা যাঁরা চার জাতীয় নেতার মর্যাদায় আসীন হয়েছিলেন, তাঁদের নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় এবং সেই সরকারকেই ভারত সরকার প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছিল।

সশস্ত্র সংগ্রামের দরকার ছিল

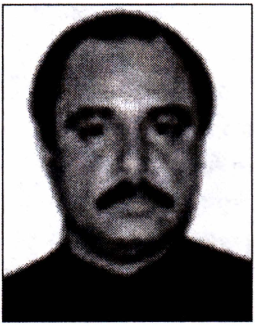
এম এ মান্নান



১৯৭১ এ চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি, চট্টগ্রাম সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য, মুক্তিযুদ্ধের সময় বি এল্ এফ ১ নম্বর সেক্টরের নোয়াখালী এবং বৃহত্তম চট্টগ্রাম তথা ইস্টার্ণ জোনের কমান্ডার, পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ছিলেন প্রয়াত এম এ মান্নান। ছিলেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সদস্য। ১৯৯৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর চট্টগ্রাম নগরের বাগমনিরাম এলাকার বাসায় আলাপকালে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রকাশ্য ও গোপন প্রস্তুতি সম্পর্কে এ লেখককে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা ব্যর্থ হলে শোষণ নিপীড়ন আর বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্য তৎকালে বাঙালিদের সামনে এক দফা অর্থাৎ স্বাধীনতা ছাড়া বিকল্প পথ ছিল না। সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য একটি সার্বভৌম ভূ-খণ্ড, তথা পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি সশস্ত্র সংগ্রাম দরকার ছিল তখন। দরকার ছিল প্রশিক্ষণ ও গোলাবারুদের। এ প্রয়োজনীয়তার কথা অনুধাবন করছিলেন তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমার জানামতে, তিনি ১৯৬৪-৬৫ সালের দিকে গড়ে তুলেছিলেন গোপন সংগঠন-যাতে যুক্ত হয়েছিলেন সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তি, আমলা এবং ছাত্র-জনতা। এ গোপন ছাত্র সংগঠনের নাম ছিল স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ, পরবর্তীকালে যার নাম হয় বি এল এফ (মুক্তিযুদ্ধকালে এর নাম ছিল মুজিব বাহিনী)।' এম এ মান্নান জানান, বঙ্গবন্ধু যে সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিদের নিয়ে আরো একটি গোপন সংগঠনের নেতৃত্ব দিতেন, অনেকে তা জানতেন না। বঙ্গবন্ধুর ওই তৎপরতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ছয় দফা এবং ১১ দফার পাশাপাশি গোপন সংগঠনের তৎপরতার মাধ্যমে একটি সশস্ত্র জনযুদ্ধের জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাহায্য এবং সমর্থনের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু সচেতন ছিলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি আগে থেকেই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এ রকম প্রস্তুতির ফলেই মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিবেশী ভারতে কোটি লোক আশ্রয় সাহায্য, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র, ত্রাণ সবই পেয়েছিল।

সবই আগে তার ঠিক করা ছিল

আ স ম আবদুর রব



সত্তর-একাত্তরে ডাকসুর সহসভাপতি ও স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা আসম আবদুর রব। স্বাধীনতার জন্য ছাত্র-জনতাকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে আন্দোলন সংগ্রামে ভূমিকা ছিল তাঁর। স্বাধীনতাত্তোরকালে জাসদের সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তী সময়ে (৯৬ সালে আওয়ামী লীগ আমলে) মন্ত্রী ছিলেন। আসম আবদুর রব মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পটভূমি সম্পর্কে বলেন, 'সেভাবে বলতে গেলে মুক্তিযুদ্ধের শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের সময় থেকেই ছাত্রলীগের মধ্যে স্বাধীন পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবি জোরদার হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে ছয় দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এদেশে যে গণআন্দোলন সৃষ্টি হয় দেখতে দেখতে তা বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে রূপ লাভ করে। ছয় দফার আন্দোলনকে উনসত্তরের ১১ দফা আন্দোলনে এবং একাত্তরে সে আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপদান করার পেছনে আমিসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের বিপুল সংখ্যক কর্মী ও নেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ২৫ মার্চ হানাদার বাহিনী দেশব্যাপী গণহত্যাযজ্ঞ শুরু করলে বাঙালির পক্ষ থেকে যে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তা ছিল ১৯৬২ থেকে ক্রমাগত দানা বেঁধে ওঠা মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত ও সশস্ত্র বহিঃপ্রকাশ।'

মুক্তিযুদ্ধের আগে সশস্ত্র প্রস্তুতি বিষয়ে আ স ম রব বলেন, 'অবশ্যই প্রস্তুতি ছিলো। যুদ্ধ শুরু হবার অনেক আগে থেকেই ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের বিপ্লবী কর্মীদের আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে গোপনে সংগঠিত করার মাধ্যমে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করি। এ ব্যাপারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন দলত্যাগী বাঙালি সদস্য আমাদের সহযোগিতা করেন। এদের অধিকাংশই ছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর বাহিনীর সদস্য।'

'মুক্তিযুদ্ধের কোনো প্রস্তুতি ছিলো না এবং যুদ্ধ হঠাৎ করেই আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়'-বলে যাঁরা প্রচার করেন তাঁরা এটি করেন হয় সে সময়ের ঘটনাবলীর সবটুকু জানেন

না বলে কিংবা কোনো অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে।'

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে চট্টগ্রাম আউটার স্টেডিয়ামে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলায় স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন আসম রব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমি (লেখক) শুনেছি তাঁর বক্তব্য। তিনি বলেন, 'অনেক ব্যাপার আছে যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার কারণে মূল নেতৃত্ব সরাসরি বলতে পারেন না বা প্রকাশ করতে পারেন না, অন্য কোনো মাধ্যম তথা নিম্নস্তরের নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে সেসব কথা বা কাজ করাতে হয়। পতাকা উত্তোলন (স্বাধীন বাংলাদেশের), জয় বাংলা বাহিনী গঠন, স্বাধীনতার জন্য নিয়মতান্ত্রিক ও সশস্ত্র প্রস্তুতি এবং কুচকাওয়াজ ও গোপন প্রশিক্ষণসহ আমাদের প্রায় কর্মকাণ্ড বঙ্গবন্ধু জানতেন এবং তাঁর নির্দেশ-সম্মতিতেই সব কিছু করা হতো। এমনকি ভারতে গিয়ে কোথায় কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে, কোথায় প্রশিক্ষণ হবে, অস্ত্র কোত্থেকে আসবে এসবই আগে থেকে তাঁর ঠিক করা ছিল।'

শেখ মুজিবের আশীর্বাদ আছে

হাসানুল হক ইনু



স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সদস্য, স্বাধীনতা পূর্বকালের ছাত্রলীগের বিশিষ্ট নেতা, মুক্তিযোদ্ধা, পরবর্তীতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের অন্যতম নেতা ও সংসদ সদস্য (২০০৯) হাসানুল হক ইনু বলেন, 'এটা সবাই স্বীকার করেন যে, সব মুক্তিযোদ্ধা সব রাজনৈতিক নেতা নেত্রী-কর্মীই একই কায়দায় চিন্তা করে না, এক কাতারে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে সুরক্ষায় কাজ করে না। এটাই আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতা। মুক্তিযুদ্ধ এক বিশাল ঘটনাপ্রবাহের ছবি। এদেশে এখন সব কিছুকেই দলীয়করণ করে ফেলা হয়। ফলে কার কি ভূমিকা তার চিত্রায়ন সঠিকভাবে হয় না।

মুক্তিযুদ্ধের নেতা-নেতৃত্ব ছিল; যোদ্ধা ও সমর্থক ছিল। যুদ্ধের শত্রু ও মিত্রও ছিল। নেতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই ছিলেন স্বাধীন বাংলার প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপতি। তিনি হচ্ছেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি।

কিন্তু এটাও ঠিক যে, সেই মুক্তিযুদ্ধ কেবলই মুজিব বা আওয়ামী লীগের ছিল না, আবার মুজিব কেবলই কোনো এক দলের বা কোনো এক কন্যারও নয়। মুজিব বারো কোটি বাঙালির, বাংলাদেশের।' '... স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ এর নির্দেশে প্রকাশ্যে সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করার সিদ্ধান্ত হয় প্রথমে ১৯৭০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন ছিল আগরতলা মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। নামকরণ করা হয় 'ফেব্রুয়ারি বাহিনী'। এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেন নগর ছাত্রলীগ সভাপতি মফিজুর রহমান। সহ অধিনয়াকের দায়িত্ব পালন করেন ছাত্রনেতা হাসানুল হক ইনু। 'ফেব্রুয়ারি বাহিনীর' কুচকাওয়াজ ভারোত্তলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। এ কুচকাওয়াজে শেখ হাসিনাও অংশ নিয়েছিলেন।'

'...৭০ এর ৭ জুন তারিখেই কুচকাওয়াজের মাধ্যমে জয়বাংলা বাহিনীর আত্মপ্রকাশ এবং পতাকা প্রদর্শনের পরিকল্পনা করেছিলেন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, সেখানে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিত থাকার ব্যাপারটা ঠিক করা হয়। এটি করা হয় মূলত দেশবাসীকে স্বাধীনতার দিকে উদ্বুদ্ধ

করার চিন্তা থেকে। এর আগের দিন সন্ধ্যায় তৈরি করা হয়েছিল জয় বাংলা বাহিনীর পতাকা। তখন দেশে সামরিক শাসনের জগদ্দল পাথর। যে কোনো সময় দেশদ্রোহীতার অভিযোগে গ্রেপ্তার, মামলা এবং ফাঁসি হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

অনেকের মনে হয়তো শঙ্কা ছিল; আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ফাঁদ থেকে এর আগের বছর মুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আরো একটি দেশদ্রোহীতামূলক তৎপরতার সাথে সামিল হবেন কিনা? কিন্তু না। বাংলার মুক্তি সংগ্রামের স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিব অনেককে হতবাক করে দিয়ে হাজির হয়েছিলেন ৭০ এর ৭ জুনের কর্মসূচিতে। স্বাধীনতাকামী ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে সেদিন নতুন করে শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি। শেখ মুজিবুর রহমান রাজি হয়েছিলেন কুচকাওয়াজে আসতে। এটা একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত। এতে ধারণা হয় যে, আওয়ামী লীগের অবস্থান যাই হোক না কেন-দেশকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টায় শেখ মুজিবের আশির্বাদ আছে।'

বন্দিদের ওপর নির্যাতনের বীভৎস কাহিনী

বিবস্ত্র করে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হতো : খুরশিদ উদ্দিন

পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের লেলিয়ে দেওয়া সেনা কর্মকর্তারা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর '৭১ সালে মক্তিযুদ্ধের আগেও যে কী অমানবিক, নিষ্ঠুর নির্যাতন করেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা যাক ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. খুরশিদ উদ্দিনের কাছ থেকে:

'৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি আমাকে করাচি থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় রাওয়ালপিন্ডি। সেখানে দুসপ্তাহ ধরে চালানো হয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। একজন অফিসার আর একজন অফিসারকে লাঠি দিয়ে কীভাবে এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করতে পারে তা এর আগে কখনো ভাবতেও পারিনি। এভাবে নির্যাতন করতো মূলত অবাঙালিরা। অনেক সময় সমস্ত চক্ষুলজ্জা ছেড়ে প্রায় ন্যাংটো (বিবস্ত্র) করে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হতো। আবার কখনো একপায়ে দাঁড় করিয়ে প্রচণ্ড মারধর করতো যতক্ষণ না মুখ দিয়ে কথা বের হতো। জানতে চাইতো শেখ সাহেবকে চিনি কি না? মোয়াজ্জেমসহ আর কার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তাদের নানা জিজ্ঞাসাবাদের ধরণেই বুঝতে পারি তারা আমাদের অনেক কথাই জেনে গেছে। কিন্তু এত নির্যাতনের পরও কিছুই স্বীকার করিনি। কারণ আমরা কোনো প্রমাণ জানামতে রাখতাম না। আমি মোয়াজ্জেমকে যেসব চিঠি লিখতাম, সেগুলো সে নষ্ট করে ফেলতো। একটি চিঠি শেষ পর্যন্ত তার একটা বইয়ের মধ্যে পেয়েছিল পাকিস্তানি গোয়েন্দারা। মামলা চলাকালে সেটি প্রমাণ হিসেবে আদালতে দাখিল করা হয়। ওই চিঠির মূল কথা ছিল, 'আমরা তো তৈরি, কিন্তু দেশ কখন স্বাধীন হবে, আমাদের পরিকল্পনা কেন পিছিয়ে যাচ্ছে? মা সন্তান-সম্ভাবা হলে যেমন দেরি করা যায় না। আমিও সেরকম সহ্য করতে পারছি না। আশা করি এবার আর গর্ভপাত হবে না ইত্যাদি। ওই চিঠির সূত্র ধরে আমাকে নির্যাতন করে কথা আদায়ের চেষ্টা করা হয়। অবশ্য ঢাকায় আনার পর আর শারীরিক নির্যাতন করা হয়নি।'

সার্জেন্ট জহুরুল হক, ফজলুল হক–এরা ছিলেন কমান্ডো গ্রুপের সদস্য। পাকিস্তানিরা তাঁদেরকে গুলি করে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। কারাগার এলাকায় যেসব চাকর, ভিক্ষুক ইত্যাদি আসতো তাদের প্রতি জঘন্য দুর্ব্যবহার করতো পাকিস্তানিরা। এ ব্যাপারে প্রতিবাদমুখর ছিলেন সার্জেন্ট জহুরুল হক। আর এটাকে অজুহাত করে তিনি বাথরুমে যাওয়ার সময় পেছন থেকে গুলি করে তাঁকে হত্যা করা হয়।"

শরীর এখনো অবশ হয়ে যায় : আবদুল জলিল

আগরতলা মামলার বিভিন্ন জনকে গ্রেপ্তার অভিযান চলাকালে সার্জেন্ট আবদুল জলিল ছিলেন ছুটিতে, পরিবারসহ বাংলাদেশে। ওই সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য সংশ্লিষ্টরা তাঁর করাচির বাসায় গিয়ে জানতে পারেন তিনি দেশের বাড়িতে। এদিকে ছুটি শেষ হয়ে এলে তিনি আবার চলে যান করাচির বাসায়। অতপর তাঁর দেশের বাড়িতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এলে জানা যায়, তিনি এরইমধ্যে করাচি চলে গেছেন। এভাবে পরোয়ানা তামিল করতে দেরি হওয়ায় তিনি একটু দেরিতেই গ্রেপ্তার হন করাচিতে, ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে। সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং মফিজুল্লাহও গ্রেপ্তার হন করাচিতে।

গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের কিছু স্মৃতি শোনা যাক জলিলের ভাষায়-'আমি আগে থেকে আঁচ করতে পেরেছিলাম, যে কোনো সময় গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারি। কিন্তু ছেলেমেয়ে স্ত্রী-সংসার ফেলে কোথাও চলে যেতেও পারছিলাম না। একদিন বাসায় খাচ্ছিলাম এমন সময় ওরা বাড়ি ঘেরাও করে দরজায় কড়া নাড়ে। দরজা খুলে দেখি গ্রেপ্তারকারী কর্মকর্তা ওসমানী (পশ্চিম পাকিস্তানি)সহ বেশ কিছু পুলিশ। বুঝে গেলাম আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। তাদের সঙ্গে বাইরে গিয়েই আবার অনুমতি নিয়ে বাসার ভেতরে যাই। আমার সঙ্গে থাকা ঘরের চাবি স্ত্রীকে দিয়ে নিজের পোশাক নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। পুলিশ হেড কোয়ার্টারে নিয়েই তারা প্রথমে আমাকে মানসিকভাবে দুর্বল করার চেষ্টা করে। যেসব কক্ষে তারা নির্যাতন চালায় সেসব কক্ষে নিয়ে নির্যাতনের নানা নিদর্শন আমাকে দেখানো হয়। এরপর আমাকে একটি সেলে রাখা হয়। সেখানে পরিবেশ ছিল অস্বাস্থ্যকর, কক্ষ জুড়ে ঘুরঘুর করছিল মশা। মশার কামড়ে ঘুম না আসায় একটা মশারি চাইলে তাও তারা দেয়নি। প্রথম দিন শারীরিক নির্যাতন না করলেও দ্বিতীয় দিন থেকে শুরু হয় নানা অবর্ণনীয় নির্যাতন। কখনো বরফের মধ্যে শুইয়ে রাখা, কখনো বায়ুপথে বরফ ঢুকিয়ে দেওয়া, নখের ভেতর সুঁচ ঢোকানো, টায়ারের রাবার দিয়ে হাতের হাঁড়ে আঘাত করা থেকে শুরু করে এমন সব অমানবিক অত্যাচার তিনদিন ধরে করা হয়েছে যা এখনো মনে উঠলে সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে উঠে। তিনদিন পর পর দেখি আমি, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ (৭নং আসামি, প্রয়াত) এবং মাহফুজুল বারী (২২নং আসামি) আমাদের তিন জনকে একই কক্ষে নিয়ে রাখা হয়। একই উদ্দেশে কাজ করা তিন সঙ্গী একত্র হতে পেরে কিছুটা সাহস ফিরে পেলাম। তিনজনের জন্য একটা শৌচাগারও ঠিক করে দেওয়া হয়। ওরা দুজনও আমার মতো বর্বর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এর আগে। এক পর্যায়ে আমরা তিনজনের সঙ্গে সার্জেন্ট শামসুল হককে একই বিমানে বাংলাদেশে এনে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টে। বিমানের ভেতর এবং বিমান বন্দরের টারমাক থেকে ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত বাইরের কাউকে বুঝতে দেওয়া হয়নি যে আমরা কোনো বন্দি। ক্যান্টনমেন্টে আমাদের রাখা হয় পাশাপাশি। কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে দেখা করার সুযোগ ছিল না। এমনকি বাথরুমে গেলেও সেখানে এবং আমাদের কক্ষের সামনে পাহারাদার নিয়োজিত থাকতো। এক পর্যায়ে বুদ্ধি করে আমরা যে সেখানে আছি সেটা পরস্পরকে জানানোর জন্য বাথরুমের ভেতরের দেওয়ালে নাম লিখে রাখি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি : শওকত আলী

নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে কর্নেল (অব.) শওকত আলী বলেন, 'গ্রেপ্তারের পর আমাকে প্রচণ্ড রকম নির্যাতন করা হয় যা ভাষায় বর্ণণা করা সম্ভব নয়। এক কথায় যত রকম নির্যাতন করলে সত্য-মিথ্যা সব স্বীকার করিয়ে সই নেওয়া যায় সেরকম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন আমার ওপর চালানো হয়েছে। অনেকে নির্যাতন সইতে না পেরে রাজস্বাক্ষী হয়েছেন। কিন্তু আদালতে গিয়ে সব অস্বীকার করেছেন। ফলে তাঁদেরকে বৈরি ঘোষণা করা হয়েছে।'

"জেনারেল হেড কোয়ার্টারের নির্যাতন কক্ষে এসে মেজর মঞ্জুর আমার শার্টের কলার চেপে ধরে আমাকে চড় মারতে থাকে। মেজর হক নেওয়াজ আমাকে একটা ব্যাটন দিয়ে পিটাতে শুরু করে। আমি প্রতিবাদ করলে বলা হয়, তুমি একটা বাঙালি কুত্তা-তোমাকে মেরে ফেলা উচিৎ। কিছুক্ষণ মারধোরের পর আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। তখন হক নেওয়াজ আমাকে লাথি মারতে থাকে। আমাকে ছয়দিন এই প্রকোষ্টে বন্দী রাখা হয়। ইতিমধ্যে আমাকে কোনো উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া হয়নি। কোনো বিছানাপত্রও না। খালি মেঝেতে পড়ে থাকতে হতো। একদিন সন্ধ্যায় আন্ডারওয়ার ছাড়া আমার গায়ের সব কাপড় খুলে নিয়ে আমাকে খোলা জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ঠাণ্ডায় আমি প্রায় জমে গিয়েছিলাম। আমি কাঁপতে শুরু করেছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি।

১৮ থেকে ২০ জানুয়ারি তিন দিন আমার ওপর বর্বরোচিত ও নির্দয় অত্যাচার চলে। লে. শরীফ আমার সিদ্ধান্ত জানতে আসে (স্বীকারোক্তি দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারে)। আমি মিথ্যা স্বাক্ষী দেব না বলাতে শরীফ বলে; 'আমি ৫ মিনিটের মধ্যেই তোমাকে রাজি করাতে পারি।' এরপর হুমকি দেয় যে আগামী দিনের মধ্যে রাজি না হলে আমাকে প্রহার করা হবে। পরের দিনও যখন আমি অসম্মতি জানালাম সে আমাকে 'বাঙালির জারজ সন্তান' 'হিন্দুকা বাচ্চা' বলে গালাগাল করতে থাকে এবং বলে যে, সমস্ত বাঙালির জন্য একটা ডাক্তারের প্রয়োজন। সে আমাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটা জিপে তোলে এবং চতুর্দশ ডিভিশনের মেসের ভিআইপি হাউসে নিয়ে উঠায়। এখানে তিনজন লোক অপেক্ষা করছিল, সকলে মিলে আমাকে একটি কক্ষে নিয়ে যায়। শরীফ আমাকে আবার গালাগাল দিতে থাকে। পরে কয়েকটি চড় মারে। তিনজন ঘুষি ও লাথি মারতে থাকে। ওদের একজন ব্যাটন নিয়ে আমার সর্বাঙ্গে নির্দয়ভাবে পেটাতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর আমি মাটিতে পড়ে যাই। তারা চুলের মুঠি ধরে মাটি থেকে তুলে আমাকে দাঁড় করায়। দুহাত ওপরের দিকে তুলে হাঁটু বাঁকিয়ে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ব্যাটন দিয়ে দেহের প্রতি গ্রন্থিতে আঘাত করতে থাকে। আমি প্রায়শঃ মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিলাম। আর ওরা আমাকে চুলের মুঠি ধরে তুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখছিল। সারাক্ষণ আমাকে জঘন্য গালি দিচ্ছিল আর হুমকি দিচ্ছিল 'ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মারা হবে।' মেস থেকে দুপুরে খানা পাঠান হয় এবং তা আমার সামনে একটা টিপয়ের ওপর রাখা হয়। কিন্তু সেটা আমাকে দেওয়া হয়নি। রাতেও আমাকে খাবার খেতে দেওয়া

হয়নি। আমি পানি চাইলে আমার মুখে পানি ছিটিয়ে দেওয়া হয়। একবার আমার মুখ তোয়ালে দিয়ে বেঁধে আমাকে চিৎ করে শুয়ে দেয়। এরপর আমার হাত পা বেঁধে রেখে আমার আবদ্ধ মুখে পানি ঢালতে থাকে। এতে আমার শ্বাসরোধ অবস্থা হয় এবং আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

২৪ জানুয়ারি আমাকে ঢাকায় এনে চতুর্দশ ডিভিশনের ৮-এ- কক্ষে আটক রাখা হয়। বেডের ওপর একটি অত্যধিক আলো বিশিষ্ট বাল্ব সারা দিনরাত জ্বালিয়ে রাখা হতো। সেই দিনগুলোর কথা চিন্তা করতেও আমি ভয় পাই।"

সুঁচগুলো ঢুকে যেত নখের ভেতর : আবদুর রাজ্জাক

সুবেদার রাজ্জাকের স্ত্রী রিজিয়া ও ছেলে তরিকুল ইসলাম রাজ্জাকের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর ওপর পশ্চিমা সেনাকর্মকর্তাদের নির্যাতনের ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরেন এভাবে, "গ্রেপ্তারের পর থেকেই কথিত ষড়যন্ত্রের তথ্য প্রকাশ করার জন্য তাঁর ওপর নানান রকম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করা হয়। ওরা জানায়, (পাকিস্তানি কর্মকর্তারা) শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে। তা ছাড়া সাক্ষী দেওয়ার বিনিময়ে পদোন্নতি ও জমি দেওয়াসহ নানান রকম প্রলোভন দেখানো হয়।

কিন্তু তিনি (রাজ্জাক) প্রতিবারই নির্যাতনের সময় বলতেন, 'দেশ, জাতি ও শেখ মুজিবের সঙ্গে বেঈমানী করতে পারবো না।' ফলে নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

তিনি তাঁর ওপর অসহ্য নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, তাঁকে প্রথমে বরফের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখা হতো। তখন একজন চিকিৎসক দাঁড়ানো থাকতেন। চিকিৎসক যখন বলতেন যে, এখনই বরফ থেকে বের না করলে উনি মারা যাবে, তখন বরফ থেকে বের করে গরম পানি ভর্তি ব্যাগ দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা হতো। চিকিৎসকের কথামত আবার গরম পানির নিচ থেকে তোলা হতো। জিজ্ঞাসাবাদের সময় হাতের কবজি ও হাঁটুতে লোহার রড দিয়ে প্রহার করা হতো নির্দয়ভাবে। রাতে দু হাত দুদিকে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো এবং হাতের প্রতিটি আঙুলের মাথায় একটি করে বৈদ্যুতিক সুচ লাগানো থাকতো। ঘুম এলে হাতের সামান্য নড়াচড়ায় সূচগুলো ঢুকে যেত নখের ভেতর। এ সময় জোরে কান্না এলে তিন জন পাকসেনা কর্মকর্তা এসে বলতো 'বল, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবি কি না'। তিনি বলতেন, 'ফাঁসির দড়িতে ঝুললেও সাক্ষী দেব না।' তাঁকে সব সময় অন্ধকার ঘরে রাখা হতো। কারও সাথে দেখা করতে দেওয়া হতো না। তিনি যখন ঢাকা সেনানিবাসের বন্দি হন তখন তাঁর কোনো খোঁজ না পেয়ে স্ত্রী পরিজন দিশেহারা হয়ে পড়েন। তাঁর ছোট ভাই প্রয়াত আব্দুস সাত্তার সরকার তাঁকে খুঁজতে রংপুর সেনানিবাসে গেলে সেখান থেকে কেউ তাঁকে এ বিষয়ে কিছু জানাতে রাজি হননি। কেউ মুখ খোলার সাহস পর্যন্ত দেখাননি। অনেক চেষ্টার পর একজন বাঙালি সেনা সদস্য অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে জানান, 'সুবেদার রাজ্জাক কুর্মিটোলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি। কিন্তু একথা আমি আপনাকে বলেছি জানলে আমার চাকরি থাকবে না। এ ছাড়া আমিও জেলে যাবো।' আগরতলা মামলার বিচারকাজ শুরু হবার পর থেকে অভিযুক্তদের তাঁদের পরিবারের সাথে

দেখা করতে দেওয়া হয়। বন্দি অবস্থায় অভিযুক্তদের পাশাপাশি কক্ষে রাখা হতো। আগরতলা মামলা শেষ হলে ১৯৬৯ সালে রাজ্জাককে চাকরি থেকে অবসর দেওয়া হয়।

বাথরুমে যেতেও হাতকড়া থাকতো : কমান্ডার আবদুর রউফ

আবদুর রউফ তাঁর ছুটিকালীন মিশন শেষ করে ৬৭ সালের ১০ ডিসেম্বর করাচির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ভেবেছিলেন সেখানে গিয়ে নিজেদের লোকজনদেরকে চাকরি ছেড়ে অথবা পালিয়ে দেশে আসার পরামর্শ দেবেন। তিনিও চলে আসবেন ঢাকায়। এরপর সবাই মিলে দেশেই শুরু করবেন স্বাধীন বাংলার জন্য জনমত গঠনের কাজ। তবে দোদুল্যমানতাও ছিল এই ভেবে যে, যেভাবে সব ওপেন সিক্রেট হয়ে যাচ্ছে তাতে বেশি সময় পাওয়া যাবে কী না। কারণ করাচি যাওয়ার জন্য বিমান বন্দরে যাওয়ার সময়ই খবর পান লে. কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েই করাচি পৌঁছে রউফ চাকরি থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেন। ইতিমধ্যে ধরপাকড়ের খবর করাচি পৌঁছলে আন্দোলনের সহকর্মীদের মধ্যেও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে নানা নজরদারি ও কড়াকড়ি। ডিসেম্বরের শেষ দিকে লে. মতিউর রহমানের গ্রেপ্তারের খবর শুনে রউফ বুঝে নিলেন এবার নিজের ধরা পড়ার পালা।

গ্রেপ্তারের সময়কার স্মৃতিচারণ করে জনাব রউফ বলেন, "এতদিন আমার কর্মকাণ্ডের কথা পরিবারের কাউকে বলিনি। কিন্তু গ্রেপ্তার ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে স্ত্রীকে সান্তনা দিয়ে বললাম যেন বিচলিত না হয়ে আসবাবপত্র ও গাড়িখানা বেচে দেয় এবং সন্তানদের নিয়ে দেশে চলে যায়। সে অসহায়ের মতো জিজ্ঞেস করলো 'তারপর কী হবে?' তার উত্তর আমার জানা ছিল না। আমার মানসপটে একদিকে তিন কন্যা, পাঁচ মাস বয়েসী ছেলে, স্ত্রী এবং অন্যদিকে বিভীষিকাময় এক অজানা অধ্যায়ের কথা ভেসে উঠছিল। নানা উৎকণ্ঠার মধ্যে ঈদের দিনটা কাটিয়ে পরদিন স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে কয়েকজন বন্ধুর বাড়ি ঘুরে বেলা দুটোর দিকে বাসায় ফিরে আসি। দারোয়ান জানালো নৌবাহিনী অফিস থেকে চারজন লোক এসে দুবার আমাকে খুঁজে গেছে। এরপর আমি চুল কাটতে গিয়ে ফিরে এসে দেখি আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য বাসার সামনে হাজির আমারই দুই সহকর্মী নেভাল একডেমির লে. সাঈদ ও লে. এম ইউ হক। তাঁরা আমাকে ডিউটি থাকার কথা বলে তাঁদের সঙ্গে একরকম জোর করে নিয়ে যেতে চান। আমি গোসল করার জন্য সময় চেয়ে ঘরে ঢুকে দেখি সেখানে আমার জন্য সস্ত্রীক বসে আছেন বাঙালি অফিসার লে. কমাণ্ডার কেএমজে আকবর। আমাকে গ্রেপ্তারের জন্য আসা পশ্চিমা দুই অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করেই তিনি এসেছেন কি-না জানতাম না। তবে পরে শুনেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে কাজ করেছেন এবং দেশ মুক্ত হবার সময় পাকিস্তান চলে যান। ৭৩ সালে আবার প্রত্যাবাসিত হয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগ দিয়ে পরে কমোডর হয়েছিলেন। যা হোক সেদিন ওরা আমাকে প্রথমে নৌঘাঁটি পিএনএস বাহাদুরে পরে সেখান থেকে সদর দপ্তরের গোয়েন্দা শাখায় নিয়ে একটি কক্ষে রাখে। সেখানে এক

ভয়ানক ভীতিকর পরিবেশ দেখে খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। রাতে লে. কমাণ্ডার আল্লাদিত্তা কয়েকটি কাগজ দিয়ে তাতে সই দিতে বলেন। আমি রাজি না হওয়ায় লে. কমাণ্ডার আসলাম ও অন্য একজন অফিসার আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। তাঁরা একটি জিপে করে আমাকে শহরতলীর কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে শীতের রাতে লেপ তোষকহীন একটি ঘরে আটকে রাখে। রাতে একটি প্লেটে দেওয়া হয় কিছু রুটি ও তরকারি। একজন কমিশন পাওয়া কর্মকর্তা হিসেবে এসব কিছুই ছিল আমার জন্য চরম অবমাননাকর। আমি কিছুই খাইনি। রাতে ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে কখন জানি না ঘুমিয়ে পড়ি। মাঝরাতে হঠাৎ কে একজন এসে আমাকে জাগিয়ে তুলে জানতে চায় পাকিস্তান কোয়ার্টারস টেক্সটাইল মিলের প্রডাকশন ম্যানেজার মাহবুবকে চিনি কি না। আচমকা ঘুম থেকে উঠে অপ্রস্তুত অবস্থায় আমি তাঁকে (মাহবুবকে) চেনার কথা স্বীকার করি। পরে মনে হলো ওরা আচমকা ঘুম থেকে উঠিয়ে আমার মুখ থেকে সত্য কথাগুলো বের করতে চায়। কিন্তু আমি সতর্ক হয়ে যাই।

জানালাবিহীন অজ্ঞাত বন্দীশিবিরে আমাকে প্রায় সাতদিন আটক রেখে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। উচ্চ ক্ষমতার বাতি জ্বালিয়ে রাখা হতো রাতদিন। একদিন বাথরুমে গিয়ে পাশের কক্ষের বাথরুম থেকে ভেসে আসা কণ্ঠে শুনতে পাই 'ধনে ধানে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা...' গানটি। আমি আবেগাপ্লুত হয়ে কণ্ঠ মেলালে ওদিকের কণ্ঠ কিছুক্ষণের জন্য থেমে যায়। বলেন, অমি ইন্সট্রাক্টর মতিউর রহমান, আপনি কে? আমি বাথরুমের ভেতর থেকেই তাঁকে পরিচয় দিই। কয়েকদিন পর অবশ্য তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর আমাকে নিয়ে আসা হয় চট্টগ্রামের নৌঘাঁটি বিএনএস বখতিয়ারের মেসে। স্বাধীনতার পর এর নামকরণ করা হয় বিএনএস ঈসা খাঁ। এখানে এসে বয়-বেয়ারাদের কাছে জানতে পারি লে.মতিউর রহমান, লে.কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমসহ শ দেড়েকের মতো বাঙালি নাবিক ও অফিসার এখানকার মেসে বন্দি আছেন। সম্ভবত ২০ জানুয়ারি আমাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শীতের দিনে একটা কক্ষে সাধারণ খাটের ওপর পাতলা কম্বল ও বালিশ নিয়ে অষ্টপ্রহর পাহারার মধ্যে থেকে অতি নিম্নমানের খাবার খেয়ে বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছে। কয়েদীসুলভ যে আচরণ করা হয়েছে তা ছিল সভ্য দেশের রীতিনীতির বাইরে। বাথরুমে যেতেও হাত কড়া থাকতো। হাতকড়ার সাথে লম্বা দড়ি ধরে রাখতো পাহারাদার। এদিকে দীর্ঘদিন থেকে পরিবারের কারও কোনো খবরও পাচ্ছিলাম না। এক পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত উনত পাঞ্জাব অফিসার্স মেসে নেওয়া হয় এবং কিছুটা ভালো খাবার দাবার ও ভালো ব্যবহার হতে থাকে। এ সময় বিচারের পালা শুরু হয়েছে। জুনের মাঝামাঝি সময়ে আমাকে তৃতীয় পাঞ্জাব অফিসার্স মেসে নেওয়ার পর দেখা হয় লে. কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম ও লে. মতিউর রহমানের সাথে। তাঁদের কাছে শেখ মুজিবুর রহমানের মতো সবচেয়ে সাহসী মানুষটিও এখানে বন্দি ও অভিযুক্ত হিসেবে আছেন জানতে পেরে অনেকটা সাহসী হয়ে উঠি নিজেও। আলাপকালে মনে হয়েছে মোয়াজ্জেম সাহেব বন্দী অবস্থায় ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, অনেকটা ভেঙে

পড়েছিলেন। কারও ওপর যেন ভরসা করতে পারছিলেন না। সারাক্ষণ চুপচাপ থাকতেন, নামাজ পড়তেন, মোনাজাত করতেন। আমাকে বলতেন, 'এইসব করে লাভ নেই। ভাই তদবির করেন। তদবিরের পথ হলো নামাজ, দোয়া-কালাম।'

পাশের কক্ষে ক্যাপ্টেন শওকত, ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান ও মেজর মোতালেব থাকতেন। উভয় কক্ষের বাথরুম ছিল লাগোয়া একটা কাঠের পাঠাতন দিয়ে ভাগ করা। আমরা পরস্পর বাথরুমের ভেতরে থেকে কুশল বিনিময় করতাম।

অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে রেখেছিল : ডা. ছৈয়দুর রহমান

"চট্টগ্রাম থেকে আমি এবং মানিক চৌধুরী গ্রেপ্তার হই নিজ নিজ বাড়ি থেকে। মেজর মোস্তাফিজ নামে এক সামরিক কর্মকর্তা লোক নিয়ে এসেছিল আমাকে ধরার জন্য। চৈতন্যগলিতে আমার বাড়ির আশপাশের সব গলিপথ বন্ধ করে ঘেরাও করে রাত দুটায় আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় পুলিশ অফিসে। সেখানে দেখা হয় মানিক চৌধুরীর সঙ্গে। আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথম দফায় মারধর করে সমস্ত শরীরে রক্তাক্ত করে ওরা (আর্মিরা) বলেছিল, 'অঢ়ঢ়ষু ভরৎংঃ ফবমৎবব সবঃযড়ফ'. এর মানে এমন ভয়াবহ হবে তা আগে জানতাম না। কিন্তু নির্যাতনের নির্মমতাই বুঝিয়ে দিয়েছিল এর মানেটা কি? উপর্যুপরি ১৮ দিন ধরে অমানুষিক নির্যাতন চলেছে। লাঠি-লোহার আঘাত থেকে বৈদ্যুতিক শক কোনো কিছুই বাদ যায়নি। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতাম। এরপর মাথায় পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আনত, কোনো রকমে বসাত। চোখ মেলতে পারলে, সামান্য কথা বলতে পারলে আবার শুরু হতো নির্যাতন। ১৮ দিনের মধ্যে একদিনও রেহাই পাইনি। শেষ পর্যন্ত অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে রেখেছিল, হাঁটতে পারছিলাম না। শক্তি ছিল বলে কোনো রকমে বেঁচেছিলাম। এ অবস্থায় আমাকে যখন জেলে ফেরত পাঠানো হয় তখন জেলার আমাকে দেখে বলেছিলেন, 'আমি তো ওনাকে এভাবে দিইনি। ওনার শরীর তো এরকম ছিল না। এ অবস্থায় ওনাকে আমি নেব না।' বিকেলে আমাকে যখন ওনার (জেলারের) অফিসে নিয়ে রাখা হয়, উনি আমাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত গভর্নর মোনায়েম খানের নির্দেশে তিনি আমাকে রিসিভ করেন। মানিক চৌধুরীসহ অন্যদেরও নির্যাতন করা হয়েছিল প্রায় একই কায়দায়।" এভাবেই পাকিস্তানি সৈনিকদের বর্বর নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন ডা. ছৈয়দুর রহমান।

এরপর বলেন, "পরবর্তী সময়ে শারীরিক অবস্থার এত অবনতি হয়েছিল যে ভালোমত হাঁটাচলা করতে পারতাম না। হার্ট ডিজিজ ডেভেলপ করেছিল। তাই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলাম না। মামলা প্রত্যাহারের পরের বছর উনি আমাকে ওনার কাছে নিয়ে গিয়ে খুবই দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলাম 'তোমার ওপর যা অত্যাচার হয়েছে আমি সব জানি। আমার অবস্থা দেখে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছেনও তিনি। পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি।"

মানিক চৌধুরীর গোপন অঙ্গে অমানবিক আঘাত : সবিতা চৌধুরী

মামলা চলাকালে মানিক চৌধুরী আদালতে দেওয়া জবানবন্দির উদ্ধৃতি দিয়ে বিধান সেন এবং সবিতা চৌধুরী নির্যাতনের যে চিত্র তুলে ধরেন তা শুনলে যে কোনো লোকই হতবাক না হয়ে পারেন না। মেজর মুস্তাফিজুর রহমান (বিএনপি সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ১৯৯১-৯৬) নির্যাতনকারীদের অন্যতম সদস্য ছিলেন বলে জবানবন্দিতে জানা যায়। রাজনৈতিক দলের নেতা, সামরিক কর্মকর্তা এবং ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তা পিএন ওঝার নাম পরিচয় দিয়ে তাঁদের সঙ্গে মানিক চৌধুরীর সম্পর্কের কথা স্বীকার করে বিবৃতি দেওয়ার জন্য প্রথমে তাঁকে নানা প্রলোভন দেওয়া হয়। পরে চরম নির্যাতন করা হয়। শরীরের নানা স্থানে আঘাত করা ছাড়াও জোর করে উলঙ্গ করে বরফের ওপর উপুর হয়ে শুয়ে থাকতে বাধ্য করা হতো। বরফখণ্ডসহ পানিভর্তি ড্রামে বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা, শরীরের গোপন অঙ্গে অমানবিকভাবে আঘাত করা হয়। মেজর মুস্তাফিজ, ক্যাপ্টেন সুলতান হোসেন শাহ, কর্নেল আমির হোসেন, স্কোয়াড্রন লিডার সামসুর রহমান নির্যাতনে অংশ নেন এবং জোর করে একটি বিবৃতিতে টিপসই নেন।

পরে নির্যাতনের ব্যাপারে মানিক চৌধুরী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানোর পর মেজর মুস্তাফিজসহ অন্য দুই সেনা কর্মকর্তা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা আবার নির্যাতন চালায় মানিক চৌধুরীর ওপর। মুখোশ পড়া লোকজন এসে ডিমের মতো একটি জিনিসে আগুন ধরিয়ে তাঁর নাকে চোখে ধোয়া ছুড়ে দিলে তার নাক কান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই অবস্থায় কিল ঘুষি ও লাথি মারা হয়। এক পর্যায়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং ১১ ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলেন। মুক্তি পাওয়ার পর দীর্ঘদিন চিকিৎসার মাধ্যমে নির্যাতনের ক্ষতিচিহ্ন এবং নাক কানের স্বাভাবিকতা কিছুটা ফিরে আসে।

মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হতো : জয়নাল আবেদীন

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সদস্য-সমর্থকদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার এক পর্যায়ে গোপন পরিকল্পনার বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে অন্য অনেকের মতো জয়নাল আবেদীন খানের জীবনেও নেমে আসে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও নির্যাতনের খড়্গ। ৬৭ সালের শেষ দিকে তিনি দেশে এসেছিলেন ছুটিতে। ছুটি শেষ হওয়ার ১০-১২ দিন আগেই করাচি থেকে টেলিগ্রামে খবর আসে ছুটি বাতিল হয়েছে। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয় অতি সত্তর চট্টগ্রাম নেভাল বেইসে যোগ দেওয়ার জন্য। নির্দেশ অনুযায়ী নেভাল বেইসের ফটকে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচজন পাকিস্তানি সৈন্য এসে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। এরপরের কাহিনী শোনা যাক তাঁর ভাষায়, "ঘেরাও অবস্থা দেখে বুঝে নিলাম আমি ধরা পড়েছি। তারা ভেতরে খবর দিলে লেফটেন্যান্ট পর্যায়ের একজন অফিসার এসে আমাকে ভেতরে নিয়ে এক জায়গায় বসান। মাঝ রাতের দিকে আমাকে স্টেডিয়ামের পাশাপাশি (সার্কিট হাউসের দক্ষিণ দিকে) নেভাল বেইসের ক্যাম্পের কাছে কোনো এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে থাকার মতো জায়গা ছিল। সেখানে চার পাঁচদিন

আটকে রেখে সম্ভবত ৬৮ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করা হয় জিজ্ঞাসাবাদ ও হালকা নির্যাতন।

১০-১১ দিন পর থেকে দেখা যায় ওদের ভয়ঙ্কর রূপ। জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে শুরু হয় নানা রকম অমানুষিক নির্যাতন। এক নাগারে তিন থেকে পাঁচ দিন পর্যন্ত ঘুমোতে দিত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে লাঠি কিংবা বেত দিয়ে বেধড়ক প্রহার করা হতো। কখনো কখনো রশি দিয়ে পা বেঁধে নিচের দিকে মাথা ঝুলিয়ে রাখাসহ নানারকম নির্যাতনে কাহিল হয়ে পড়লে জানতে চাইতো আমাদের দলে আর কারা আছে, কাকে কাকে চিনি, কোথায় কোথায় বৈঠক হয়েছে, বৈঠকে কারা থাকতো ইত্যাদি। আরও জানতে চাইতো কমান্ডার মোয়াজ্জেমসহ অন্যদের সঙ্গে আমার কোথায় দেখা-পরিচয় হয়েছে। শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা ও কথা হয়েছে কী না; কোন কোন পদের লোকজন এতে যুক্ত আছেন, বিপ্লবী কাউন্সিল কখন করা হয়েছে এতে কারা রয়েছে, দেশ স্বাধীন করার ষড়যন্ত্রের কারণ ইত্যাদিও জানতে চাইতো আমার কাছে। সব প্রশ্নের উত্তরে শুধু উচ্চারণ করতাম 'জানি না'। দু-এক জায়গায় বড়জোর বলেছি, 'এক জায়গায় চাকরি করার সুবাদে কাউকে কাউকে চিনি কিন্তু তাঁদের বাইরের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুই জানি না।' স্বীকার করলে আরও ভয়ঙ্কর বিপদ এবং আমাদের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এই আশঙ্কায় কিছুই স্বীকার করিনি।'

জেড এ খান জানান, বন্দি অবস্থায় প্রায় এক বছর তাঁকে চট্টগ্রাম রাখা হয়। মাঝখানে একবার ঢাকা আনা হয় কয়েকজন আসামি যেমন কর্নেল শওকত, সার্জেন্ট জহুর প্রমুখকে সামনাসামনি শনাক্ত করার জন্য। তিনি চিনেও না চেনার ভান করে বলতেন 'তাঁদেরকে চিনতাম, কিন্তু এরা তো সেই সব লোক বলে মনে হয় না।' অবশেষে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে রিপোর্ট দেওয়া হয় এবং ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি জানান, তাঁর কাছে একটি ডায়েরি ছিল, তাতে কোথায় কখন, কার বাসায় বৈঠক হয়েছে, কারা কারা সেখানে ছিলেন সব লেখা ছিল। কিন্তু ছুটি বাতিলের নোটিশ পেয়ে তাঁর সন্দেহ জাগে কোনো একটা বিপদ হতে পারে। তাই তিনি ডায়েরিটা পুড়ে সম্ভাব্য প্রমাণ নষ্ট করে ফেলেন।

বলতে গেলে কষ্ট আরো বাড়ে : মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী

মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী জানান, স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা তৎপরতা, এতে শেখ মুজিবের জড়িত থাকা, আন্দোলনের পরিকল্পনা ইত্যাদি জানার জন্য অন্য বন্দিদের মতো তাঁর ওপরও প্রচণ্ড মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়। প্রথমেই তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় তিনি আসামি হবেন না সাক্ষী হবেন। তিনি সাক্ষী হতে না চাইলে তাঁকে বেদম মারধর করা হয়। তাতেও কোনো কথা বের করতে না পেরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে দেওয়া হয় বৈদ্যুতিক শক। বলেন, 'অনেক রকম নির্যাতনই তো করা হয়েছে। সবকিছু বলতে গেলে কষ্ট আরো বাড়ে।"

পেটের পর্দা ফেটে গিয়েছিল মোয়াজ্জেমের

লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমের বন্দিজীবন ও নির্যাতনের কাহিনী জানা যাক মিসেস মোয়াজ্জেমের ভাষায়, "আমার স্বামীকে নিয়ে যাওয়ার পরদিন নূরুল ইসলাম শিশু এসে মোয়াজ্জেম সাহেব ভাল আছেন জানিয়ে তাঁর জন্য কিছু শীতের কাপড় চাইলেন। আমি রেগে গিয়ে কিছু না দিয়েই তাঁদের ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'আপনারা তাঁকে কোথায় নিয়ে গেছেন, সে না এলে আমি কিছু দেব না।' পরদিন তাঁরা আবার এসে আমার শ্বাশুড়ির কাছ থেকে কিছু কাপড় ছোপড় নিয়ে যান। এদিকে আমার উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে দুদিন পরও কোথাও স্বামীর খোঁজ না পেয়ে। মশিউর রহমান যাদু মিয়ার বাসায় গেলে তিনি বলেন, 'কুর্মিটোলা দিয়ে হয়তো তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' এরপর এপ্রিল কি মে মাসে মেজর মোস্তাফিজুর রহমান (পরে বিএনপির মন্ত্রী) আমার শ্বশুরের বাসায় এসে জানান, মোয়াজ্জেম ক্যান্টনমেন্টে আছেন। আমাকে ও আমার শ্বশুরকে তিনি সেখানে নিয়ে যান। ওর চেহারা দেখে সেদিন মুখ থেকে আমার কথা বের হয়নি। আমাদের পাশে মোস্তাফিজ সাহেব বসা থাকায় তেমন কথা বলতে পারেনি ও। মামলা শুরু হওয়ার পর প্রায় সময় আদালতে যাওয়ার সুযোগ হয়। তারপর ধীরে ধীরে জানতে পারলাম, তার ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে, নির্যাতন হয়েছে। সে এক অমানুষিক নির্যাতন। মামলা শেষে সে বাড়ি আসার পর নির্যাতনের চিহ্ন দেখে আমি আঁৎকে উঠি। ঘুষি ও লাথির আঘাতে তার পেটের একটা পর্দা (লেয়ার) ফেটে গিয়েছিল। দাঁত ভেঙে গিয়েছিল একটা। হাঁটতে পারতো না স্বাভাবিকভাবে। পেটে জ্বালাপোড়া ছিল অনেকদিন। বাসায় রেখে চিকিৎসা করিয়েছি। মামলা চলাকালে ক্যান্টনমেন্টে যাওয়ার পর অনেককে চিনতে পারি। মিসেস রুহুল কুদ্দুস, মিসেস ফজলুর রহমান ও অন্যদের সঙ্গে পরিচয় এবং কথা হয়েছে। তাঁদের কাছেও তাঁদের স্বামীদের ওপর নানা নির্যাতনের কথা শুনেছি। সেই মোয়াজ্জেমকে পাকিস্তানি বাহিনী একাত্তরের যুদ্ধের শুরুতে ২৬ মার্চ নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।"

লাঠিপেটা করে বরফের ওপর বসিয়ে রাখা হতো : নূর মোহাম্মদ বাবুল

নূর মোহাম্মদ বাবুল ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের দিকে ছুটিতে ছিলেন। ৯ ডিসেম্বর থেকে কামাল উদ্দিন, সুলতান উদ্দিন ও স্টুয়ার্ড মুজিব, মোহাম্মদ আলীসহ বেশ কজন গ্রেপ্তার হওয়ার খবর পেয়ে তিনিও বুঝেছিলেন, যে কোনো সময় গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারেন। ৬৮ সালের ২ জানুয়ারি চট্টগ্রামের নিউমুরিং নেভাল বেইসের কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার পর পরই সেখান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর জিজ্ঞাসাবাদের সময় চালানো হয় নির্মম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। সে সব কাহিনী শোনা যাক নূর মোহাম্মদের ভাষায়, "ধরে নিয়েই আমাদের কার্যক্রমের নানা বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পাকিস্তানি সেনারা। প্রশ্নের মধ্যে প্রধান বিষয় ছিল, শেখ সাহেবকে চিনি কী না, মোয়াজ্জেমের সঙ্গে এক সাথে চাকরি করেছি কী না, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে আলাদা করার চেস্টা করেছি কী না, আর কারা কারা এতে জড়িত ইত্যাদি। আর এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর না পাওয়ায় চালাতো নির্যাতন। নির্যাতনের মধ্যে বেদম লাঠিপেটা থেকে শুরু করে বরফের ওপর

বসিয়ে রাখা পর্যন্ত সব কিছু করা হয়েছে। রাতে ঘুমোতে দিত না। চট্টগ্রামে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লে. শরীফ নামে এক পাঞ্জাবি অফিসার ছিলেন। তিনি এবং তাঁর লোকজনই বেশি নির্যাতন করেছে। এভাবে নির্যাতনের এক পর্যায়ে কারাগারের এক চিকিৎসক এসে মন্তব্য করেন, এভাবে নির্যাতন চালালে আমি মারা যাব। এরপর নির্যাতন একটু কমানো হয়। উল্লেখ্য, ওই চিকিৎসক ছিলেন বাঙালি। বাঙালি ইন্টেলিজেন্সের লোকজন আমাদের ওপর নির্যাতন করেননি বরং কৌশলে সাহায্য করেছেন। পাঞ্জাবিরা ঘুমোতে দিত না। বাঙালি কেউ দায়িত্বে থাকলে বলতেন, আপনারা ঘুমোন, কোনো অসুবিধা হবে না।

৬৮র ১৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে বাইরে নিয়ে আবার গ্রেপ্তার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে জেল থেকে বের করার সময় ক্যাপ্টেন আরিফ মমতাজ নামে এক সেনা কর্মকর্তা আমাকে ভয় দেখিয়ে বললেন, 'দেখ শেখ মুজিবকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা তাঁর সঙ্গে জড়িত ছিলে, দেশ স্বাধীন করতে চেয়েছ। সব কিছুর প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। এখনো সময় আছে, সব কিছু স্বীকার কর।' এর আগে চট্টগ্রামে চাকরিতে থাকা অবস্থায় তিনি একবার আমার কাছে যান। জানতে চান, কোনো সমস্যা হলে আপনি কীভাবে বন্দরকে রক্ষা করবেন।' বন্দরে বিদেশি সাবমেরিন প্রবেশ করতে না পারার জন্য কী কী করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। কিন্তু ক্যাপ্টেন আরিফের কাছে আমি তা অস্বীকার করি। বলি যে, আমি ক্ষুদ্র মানুষ পানির নিচের বিশেষজ্ঞ, বন্দর রক্ষার মতো জ্ঞান নেই। আমার মনে হয়েছিল, তিনি আমার কাছ থেকে কথা বের করতে এসেছিলেন।"

মাথার ওপর ছিল উচ্চ ক্ষমতার বাতি : এবিএম সামাদ

মামলার প্রতিটি আসামিকে যেভাবে চরম নির্যাতন করা হতো স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য, তা থেকে বাদ যাননি এবিএম সামাদও। সেই নির্যাতনের কাহিনী জানা যাক তাঁর ভাষায়; "অন্যদের মতো আমাকেও ছোট্ট একটি কক্ষে রাখা হয়। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য প্রথম দিন থেকে নানা নির্যাতন শুরু হয়। শীতের সময় জামা-কাপড় ছাড়া খালি গায়ে থাকতে হতো। অনেক সময় শুধু একটা জাঙ্গিয়া পড়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হতো। মাথার ওপর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বাতি জ্বালিয়ে অস্থির করে তোলা হতো। এভাবে সেনা কর্তারা নির্যাতনের মাধ্যমে এক একটা প্রশ্ন করতেন আর উত্তর মনপূত না হলে অমানুষিকভাবে পেটাতো লাঠি দিয়ে। প্রথম দিকে নির্যাতন শুরুর দুদিন পর, একজন বাঙালি সেনা কর্মকর্তা এসে আমাকে বললেন, 'দেখুন, এত মার খাচ্ছেন, পিটুনীতে রক্ত ঝরছে শরীর থেকে, আরও পড়বে। কিন্তু কেন এভাবে অযথা হয়রানি হবেন? কষ্ট পাবেন?' আমি তাঁকে বললাম, 'ওরা শুধু শুধু নির্যাতন করলে, মারলে আমার কী করার আছে!' উনি বললেন, 'ওরা যা বলছে, আপনি যা দেখেছেন, যা জানেন সব স্বীকার করে নেন। পরে দরকার হলে কোর্টে গিয়ে বলবেন আমাকে মারধর করে স্বীকার করানো হয়েছে। তাহলেই তাদের চার্জ বা স্বীকারোক্তির কথা আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে না।'

তিন দিন তিন রাত একাধারে নির্যাতনের পর বাঙালি সেনা কর্মকর্তাটির কথামত এক আধটু কথাবার্তা স্বীকার করি। এরপর নির্যাতনও একটু কমে। মাঝে মাঝে একটু পানি, সামান্য খাবার দেওয়া হয়েছে।

এ অবস্থায় বলা হয় কাগজে স্বীকারোক্তি লিখে দেওয়ার জন্য। জানালাম, আমার লেখার শক্তি নেই। হাত-পা কাঁপে। আমাকে আগে ঘুমোতে দিন। কিছুক্ষণ ঘুমোতে দিয়ে আবার ঘুম থেকে উঠিয়ে প্রশ্ন শুরু করে এলোপাথারি। কোথায় কোথায় গিয়েছি, কোন কোন মিটিংয়ে কারা কারা উপস্থিত ছিলেন, ফেনী হয়ে আগরতলা যাওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গে তারা প্রশ্ন করে, দিন তারিখসহ জানতে চায়। আমি কিছু ঘটনা স্বীকার করলেও সুনির্দিষ্ট দিন তারিখ স্মরণে নেই বলে জানাই। ইতিমধ্যে নির্যাতন করে যে সব বিষয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে, আদালতে গিয়ে তার সবগুলোই অস্বীকার করি। এক পর্যায়ে মামলা বাতিল হলে অন্যদের সঙ্গে মুক্তি পাই।”

অভিযোগ অস্বীকারের কারণ

আগরতলা মামলার আসামিদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাঁদের ওপর প্রচণ্ড রকমের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়েছিল পাকিস্তানিরা। সেই মরণ যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেউ কেউ কিছু কিছু ফাঁক-ফোঁকর রেখে হলেও অভিযোগ স্বীকার করতে রাজি হন। আবার কেউ কেউ রাজি হন, 'আমরা সত্যিই স্বাধীনতা চাই' একথার সাহসী উচ্চারণের মাধ্যমে দেশপ্রেম প্রমাণ করার জন্য। এ পর্যায়ে কেউ কেউ রাজসাক্ষী হয়ে যান। পরে আবার পরবর্তী অবস্থা ও শেষ পরিণতির কথা ভেবে তাঁদের কেউ কেউ হয়ে যান বৈরি সাক্ষী।

এ প্রসঙ্গে ***সার্জেন্ট জলিলের বক্তব্য:*** 'আমাদের আইনজীবীরা আমাদের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, এটা একটা ক্রিমিনাল (ফৌজদারি অপরাধ) মামলা। এখানে যদি আমরা সবকিছু স্বীকার করে নিই, তাহলে বঙ্গবন্ধুসহ আমরা সবাই ফাঁসিতে মারা যাব। কারণ চার্জশিট (অভিযোগপত্র) ছিল সবার জন্য একটা। শুধু নাম ঠিকানাগুলো ছিল ভিন্ন। সবার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রায় একই, উদ্দেশ্যও একই। আন্দোলনের সামরিক বিভাগের শীর্ষ নেতা লে. কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনও একই যুক্তি স্বীকার করে আমাদের বললেন, 'হ্যাঁ আমরা যদি এখন সব কিছু স্বীকার করে নিই, তাহলে আমরা তো মারা যাবোই, আমাদের নেতা শেখ সাহেবও রক্ষা পাবেন না। আর পাকিস্তান সরকারও প্রকৃতপক্ষে এটাই চাচ্ছেন যে শেখ সাহেবসহ সবাইকে শেষ করা গেলে পুরো আন্দোলনটাই শেষ হয়ে যাবে। কাজেই সমস্ত অভিযোগই আমরা অস্বীকার করবো।'

ব্রিগেডিয়ার অব. খুরশিদ উদ্দিন বলেন, "মামলা চলাকালে প্রথম দিকে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ঠিক করি যে, আমরা ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে নেব। অনেকে নির্যাতনের স্মৃতি এবং জ্বালা মন থেকে মুছতে পারছিল না তখনো। কিন্তু আইনজীবীরা বললেন, 'তোমাদের সবকিছু সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে হবে। কারণ স্বীকার করলে এক মুহূর্তও দেরি না করে যেনতেন ট্রায়াল শেষে সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হবে। এ ছাড়া যে উদ্দেশ্যে তোমরা গোপন সংগ্রাম শুরু করেছ, সেই উদ্দেশ্যও ব্যাহত হবে। আর তোমরা অস্বীকার করলে তোমাদের পক্ষে জনমত তৈরি হবে। তোমরা যা চাইছো তা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়বে এবং তোমরা না পারলেও অন্যরা এগিয়ে যাবে এ পরিকল্পনা নিয়ে।' শেষ পর্যন্ত আদালতে সব কিছু অস্বীকার করি আমরা।"

বিধান কৃষ্ণ সেন বলেন, "একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের একাংশকে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে

বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত এবং এতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মদদ রয়েছে এমন একটি বিশ্বাস জনমনে ঢুকিয়ে দিতে পারলে স্বাধীনতার পক্ষের অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জনমত কিছুটা হলেও বিভ্রান্ত হতে পারতো। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছেও তা গ্রহণযোগ্য হতো না।

ভবিষ্যতের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হতে পারতো নানাভাবে। তাই 'কিল খেয়ে কিল হজম' করার মতো এরকম একটি ঐতিহাসিক ঘটনার বিষয়বস্তু গোপন রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।'

মুক্তির পরও স্বীকার না করার কারণ

মামলা চলাকালে জীবন রক্ষার প্রয়োজনে ঘটনা অঙ্গীকার করলেও মামলা থেকে মুক্তির পরও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ থেকে কেন বিরত থাকলেন এমন প্রশ্ন রেখেছিলাম সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের কাছে। জবাবে এবিএম সামাদ বললেন, "যেদিন আমাদের মুক্তি দেওয়া হবে সেদিন আমাদের সবার সামনে শেখ সাহেব এলেন। প্রত্যেককেই বললেন, 'তোমরা জেনে রাখ। আমাদের আন্দোলন চলবে। তোমরাও থাকবে আন্দোলনে। কিন্তু আপাতত বাইরে কেউ কোনোরকম বক্তব্য দেবে না। এখন যার যার জায়গায় চলে যাও। সময় মতো আমিই আবার যোগাযোগ করবো।'

ফলে পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে আর তেমন উচ্চবাচ্য হয়নি। এ ছাড়া, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্নজন নিজ নিজ চাকরি-ব্যবসা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বিষয়টি নিয়ে কেউ তেমন ঘাটাঘাটি না করায় ধীরে ধীরে এ রকম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ইতিহাস থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে।" একই রকম কারণ উল্লেখ করেন বিধান সেন, নূর মোহাম্মদ বাবুল এবং এসএ সামাদসহ অন্যরা।

কর্নেল (অব.) শওকত আলী বলেন, "পাকিস্তান আমলে একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ বাস্তবতার কারণে আমরা ঘটনাটা অস্বীকার করি। তখন সীদ্ধান্ত হয়েছিল স্বীকার না করার ব্যাপারে। কিন্তু স্বাধীনতার পর এটা অস্বীকার করার কোনো কারণ বা অর্থ আমি খুঁজে পাইনি। পরে বিভিন্ন বৈঠকে বঙ্গবন্ধুও এরকম ঘটনা ঘটার কথা স্বীকার করেছেন। কাজেই পাকিস্তান আমলে যা অস্বীকার করা হয়েছে এখনও তাই করতে হবে তা তো ঠিক নয়। বরং আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, পাকিস্তান আমলে আগরতলা মামলাকে মিথ্যা বা 'ষড়যন্ত্র মামলা' বলাটা ছিল একটা স্লোগান। আসলে ওই মামলায় আমাদের দিয়ে যা বলানো হয়েছে বা বলানোর চেষ্টা করা হয়েছে বলে আমরা অভিযোগ করি তার সবটাই সত্য ছিল।"

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ষড়যন্ত্র

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে রণাঙ্গণে অবস্থানরত ডা. খুরশিদ উদ্দিন উপলব্ধি করেন বেসামরিক সরকার বা প্রশাসনের সঙ্গে কতিপয় সামরিক মুক্তিযোদ্ধা তথা সেক্টর কমান্ডারের মধ্যে এক ধরনের ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। উভয় পক্ষের মধ্যে রয়েছে নীতির পার্থক্য। এ বিষয়ে ডা. খুরশিদের জবানবন্দি;

"আমরা জানি ইতিপূর্বে স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে একটি বেসামরিক সরকার গঠন করা হয়েছে। কেবিনেটেও সব বেসামরিক রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু কয়েকমাস পর দেখা গেল কয়েকজন সেক্টর কমান্ডার এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না। আগস্ট মাসে সেক্টর কমান্ডারদের এক সভা হয় ৮নং থিয়েটার রোডে। সেখানে একটি মিলিটারি কমান্ড কাউন্সিল গঠন করার প্রস্তাব দিয়ে কয়েকজন সেক্টর কমান্ডার বলেন, 'তাহলেই আমরা যুদ্ধ এগিয়ে নিয়ে যাব।' সেখানে তাঁরা যুক্তি দেখান যে, বেসামরিক নেতারা এখানে-ওখানে বক্তৃতা করতে করতে ঘুরে ফিরে সময় নষ্ট করেন। তাঁরা 'জেনারেল ওসমানী বৃদ্ধ হয়ে গেছেন' উল্লেখ করে মিলিটারি কমান্ড কাউন্সিলে তাঁকে না রাখার কথাও বলেন। প্রস্তাবকারীদের মধ্যে ছিলেন ৯ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল এবং মেজর জিয়াউর রহমান।

বিষয়টি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ টের পেয়ে ক্ষুব্ধ হন এবং মিলিটারি কমাণ্ড কাউন্সিলের প্রস্তাবকদের উদ্দেশে বলেন, 'যাঁরা এরকম আলাদা কাউন্সিল করতে চায় তাঁদের ভারত থেকে বের করে দেওয়া হবে।' তাঁরা এও বলেন যে, 'আমরা মিলিটারিদের সঙ্গে কোনো ডিল (চুক্তি) করবো না। কারণ বেসামরিক সরকারের লোকজন বিশ্বের কাছে বলতে পারবেন তাঁদের লোকদের ওপর পাকিস্তানিরা অবিচার, নির্যাতন, হত্যা ইত্যাদি চালাচ্ছে। তাই তাঁরা বিশ্বের কাছে সাহায্য চাইতে পারেন। এ ছাড়া জনগণের কাছে তাঁদের যেতে হয় বা যেতে পারবে যুদ্ধের ব্যাপারে জনমত গঠন করার জন্য। কিন্তু তোমাদের তো (মিলিটারিদের) কেউ সাহায্য করবে না।' বিষয়টি তাঁরা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, বিষয়টি তারা তাজউদ্দিন আহমদসহ সংশ্লিষ্ট নেতাদের জানিয়ে সতর্ক করে দেন। অবশ্য ওসমানী সাহেব তাঁর বিরুদ্ধে জিয়াসহ যাঁরা যাঁরা ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। পরে জানা গেছে, ওই ধরনের বিরোধপূর্ণ কাজের নীতিটা তৈরি করেছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ।

যুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলে আগস্টের সেই সভার খবর জানতে পারেন। এ ছাড়া নানাজনের কাছ থেকে তিনি খবর নিতেন। সব জেনে সম্ভবত তিনি ভালোভাবে আস্থায় নিতে পারেননি বিরোধিতাকারীদের।"

পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশনের প্রস্তাব জলিলের

আগরতলা মামলার অন্য আসামিদের মতো এবিএম সামাদও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। তিনি কাজ করেন ৯নং সেক্টরে মেজর (অব.) আবদুল জলিলের অধীনে (পরবর্তীতে জাসদ সভাপতি, আরও পরে ইসলামী মুক্তি আন্দোলনের সভাপতি)। নবম সেক্টরের রাইফেল কর্মকর্তা ছিলেন আগরতলা মামলার আর এক আসামি ফ্লাইট সার্জেন্ট (অব.) ফজলুল হক। আর আসামি সুলতান উদ্দিন ছিলেন টাকি ক্যাম্পের ইনচার্জ। সেই ক্যাম্পে জমা থাকতো অস্ত্রশস্ত্র। মেজর জলিলের অধীনে কাজ করতে গিয়ে সামাদ একদিন আবিষ্কার করেন মেজর জলিল মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেও ভেতরে ভেতরে তিনি পাকিস্তান-বাংলাদেশ কনফেডারেশনের লক্ষ্যে কাজ করছেন। এ প্রসঙ্গে সামাদ বলেন, "আমাদের দলেরই একজন সুবেদার তাজুল ইসলাম এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেওয়ার। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকের ঘটনা এটি। একদিন মেজর জলিল আমাদের নিয়ে এক বিশেষ ঘরোয়া বৈঠক ডাকেন। সেখানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ক্যাপ্টেন ফজলুল হক, সুলতান উদ্দিন, স্টুয়ার্ড মুজিব, সুবেদার তাজুল ইসলামসহ আরো কয়েকজন। বৈঠকে মেজর জলিল বললেন, 'দেখুন আমাদের এই যে আন্দোলন, এই আন্দোলন এখানেই শেষ হবে না। এরপরেও আমাদের আন্দোলন চলবে। কিন্তু আপনাদের মূল্যায়ন করার কেউ নেই। শেখ মুজিবও মুক্তি পাবেন না। তবে আমি আপনাদের মূল্যায়ন করবো।' বক্তব্যের এক ফাঁকে তিনি বললেন, 'দরকার হলে আমরা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বাতিল করে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করব, তাদের সঙ্গে কনফেডারেশন করব। কিন্তু ভারতের আধিপত্য আমরা মেনে নেব না।"

এবিএম সামাদ আরও জানান, মেজর জলিল সে সময় ভারতীয় সৈন্যদের আদৌ সহযোগিতা করতেন না। তাঁর এ ধরনের কাজকর্মে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণেই শেষ পর্যন্ত তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান। যদিও বিষয়টি শৃঙ্খলার কারণে তাঁরা কখনো প্রকাশ করেননি। সামাদ ওই ঘটনার পর বাঘেরহাট চলে যান এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। তিনি মনে করেন, কিছু কিছু লোক যুদ্ধে গেলেও তাঁরা দেশের স্বাধীনতা আদৌ চাননি, মেজর জলিল ছিলেন তাঁদেরই একজন।

উল্লেখ্য, মেজর জলিল স্বাধীনতার পর নতুন গঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি ছিলেন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকেই মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য তিনি তরুণ-যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। একই সঙ্গে ভারত বিরোধিতার নামে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সদ্য গঠিত বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক চালান। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শহীদ হওয়ার পর এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে জলিল গ্রেপ্তার হন। পরবর্তীতে মুক্তি পেয়ে তিনি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর আন্দোলন ভুল ছিল মন্তব্য করে ইসলামী মুক্তি আন্দোলন নামে মৌলবাদী চরিত্রের আদলে একটি দল গঠন করেন। তিনি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানেই মারা যান।

জেলে বসে পরিকল্পনা : এবার রাজপথের আন্দোলনে স্বাধীনতা

৬৮ সালের ১৯ জুন মামলা শুরু হয়ে যাওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কর্নেল শওকতসহ অন্য আসামিদের পরস্পরের মধ্যে কথা বলার সুযোগ তৈরি হয়। সেসময় মামলা পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান কী ছিল-এমন প্রশ্নের জবাবে কর্নেল শওকত বলেন, "মামলা শুরুর পর আমরা এক সঙ্গে কোর্টে যাওয়া আসা করতাম। আমাদের ১৩ জনকে একটা অফিসার্স মেসে রাখা হয়েছিল। সেখানেও আমরা মাঝে মধ্যে কথা বলতে পারতাম। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে বিকল্প উপায় নিয়েও ভাবতেন। সংশ্লিষ্টদের মনোভাব বুঝে তারপর নিজে সিদ্ধান্ত নিতেন। আগরতলা মামলার আসামি হিসেবে ঢাকা সেনানিবাসে থাকার সময় এবং আদালতে আসা-যাওয়ার সময় পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন জনের মতামত জানতে চাইতেন তিনি। একদিন বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আচ্ছা এবার তো ধরা পড়ে গেলি। এরপর দেশকে স্বাধীন করতে চাইলে ভবিষ্যতে কি করবি?' তখন আমাদের একেক জন একেক রকমভাবে নিজের ভাবনার কথা বললাম। কেউ বললেন, 'দেশ স্বাধীন করতে হলে আন্দোলন অব্যাহত রাখতে হবে। সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে অনেক বাঙালি আছেন যাঁরা আমাদের সাহায্য করবেন। কারণ তখন পর্যন্ত যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁদের বাইরে আরও অন্তত তিন হাজার পাঁচ শ সদস্য রয়ে গেছেন। আবার অনেকে বললেন, 'এবার রাজনৈতিকভাবে এগোতে হবে। সহকর্মী, সমর্থক যাঁরা আছেন তাঁদের সেভাবেই সমর্থন সহযোগিতা থাকবে।'

কর্নেল শওকত আলী বলেন, 'মামলা শেষ হওয়ার পর আমি শুনেছি আমাদের সৈনিক সংগঠনের বাইরে বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজস্ব একটা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছিলেন তৎকালীন ছাত্রলীগের নেতাদের নিয়ে। দেশের স্বাধীনতা, গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা এবং কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা যায় এসব বিষয়ে তিনি কথা বলতেন ছাত্র নেতাদের সঙ্গে।

পরে দেখা গেল বঙ্গবন্ধু আন্দোলনকে পুরোপুরি রাজনৈতিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যান। আমার মনে হয়েছে, তিনি নিজস্ব অন্য কোনো সূত্রের (সোর্সের) মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোথায় গেলে কী হবে, কী রকম সাহায্য পাওয়া যাবে, বিশেষ করে যুদ্ধ বেঁধে গেলে কী করতে হবে, এসব ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। এ ব্যাপারে সেই সূত্রকে ব্যবহার করেছিলেন। তবে সেই সূত্রটিও গোপন রাখা হয়।'

এস এ সামাদ স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'মামলা চলাকালে আদালতের ভেতর শেখ মুজিবের সঙ্গে অন্য আসামিদের প্রায়ই কথাবার্তা হতো। প্রথম সারিতে চারটা চেয়ার ছিল-১ নম্বরে

শেখ মুজিব, ২ নম্বরে কমান্ডার মোয়াজ্জেম-এভাবে দ্বিতীয় সারিতে ৫ থেকে ৮ নং আসামি। ঢাকা সেনানিবাসের ভেতরে এভাবে আসনগুলো এখনো সাজানো আছে। দ্বিতীয় সারিতে শেখ মুজিবের পেছনে ছিল সামাদের আসন। মামলার কার্যক্রম শুরুর আগে-পরে বিশেষ করে চা-বিরতির সময় নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হতো। ওই সময় শেখ মুজিব জানতে চাইতেন এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা কে কোথায় কীভাবে কাজ করেছেন। আন্দোলনের পরিণতি সম্পর্কেও কথা বলেছেন তিনি।

সে সব দিনের কথা স্মরণ করে এস এ সামাদ বলেছেন, "একদিন আদালত প্রাঙ্গণে বসে আমরা তাঁর কাছে আন্দোলনের ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি (শেখ মুজিব) বলেছিলেন, 'দেখ ওরা আমাদের কিছু করতে পারবে না। আমার অনেক লোকজন আছে। তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগও আছে। তোমরা দেখবে অচিরেই তারা কাজে নেমে যাবে। এবার এমন আন্দোলন হবে যে, আমরা সবাই ছাড়া পেয়ে যাব। অন্যদিকে সরকারের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠবে। এবার আমরা রাজপথের আন্দোলন করে দেশ স্বাধীন করব।"

এস এ সামাদের সঙ্গে কথা বলে এটা স্পষ্ট হয় যে, বঙ্গবন্ধু জেলখানায় বসে বাইরের আন্দোলন তীব্র করার কলাকৌশল নিয়ে ভাবতেন। কাকে দিয়ে কোন কাজটি হবে সেটিও ছিল তাঁর জানা। সে সময় আগরতলা মামলার বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহে আসা সাংবাদিকদের মধ্যে আতাউস সামাদ ছিলেন অন্যতম এবং বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাসভাজনও।

এবিএম সামাদ বলেন, "একদিন (সম্ভবত শনিবার) শেখ সাহেব সাংবাদিক আতাউস সামাদকে ডেকে বললেন, 'তুমি টি ব্রেকের সময় আমার সঙ্গে একটু দেখা করো।' আমি তখন শেখ সাহেবের পেছনেই বসা। টি ব্রেকের সময় সামাদ সাহেব এলে শেখ মুজিব তাঁকে বললেন, 'মাওলানা (আবদুল হামিদ খান ভাসানী) সাহেবের সঙ্গে তো তোমার ভালো সম্পর্ক। তুমি তাঁকে ভক্তিও করো। এখনো যোগাযোগ আছে তো?' সামাদ সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ আছে'।

শেখ সাহেব তাঁকে বললেন, 'তমি সন্তোষে গিয়ে ওনাকে বলো, শেখ মুজিব বলছেন, আপনাকে আন্দোলনে নামতে হবে। আপনি না নামলে আন্দোলন পূর্ণাঙ্গ হবে না। আর এ ব্যাপারে উনি কী বলেন আমাকে জানাবে।' এরপর রোববারের ছুটির পরদিন অর্থাৎ সোমবার টি ব্রেকের সময় আতাউস সামাদ সাহেব এলে শেখ সাহেব জানতে চাইলেন 'খবর কি?' সামাদ সাহেব বললেন, 'খবর ভালো। উনি কাগজে স্টেটমেন্ট দিয়ে দিয়েছেন, আন্দোলনেও নামবেন শিগগিরই। মঙ্গলবারেই পল্টনে সভা করবেন।' শুনে শেখ মুজিব আতাউস সামাদকে বললেন, 'তুমি খুব ভাল কাজ করেছ, আন্দোলন এবার ভালভাবেই জমবে।"

৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের আগে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আরো কয়েকবার দেখা হয়েছে এস এ সামাদের। স্মৃতিচারণ করে তিনি বললেন, 'মার্চের শুরুতে একদিন শেখ সাহেবের বাসায় যাই কিছু দরকারি কথা বলার জন্য। সেখানে গিয়ে দেখি একদিকে ছাত্ররা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তৈরি করছিলেন, বঙ্গবন্ধু সেই পতাকা উঠাবেন বলে। আমি ভেতরে যেতে চাইলে

ছাত্ররা বললো, 'উনি এখন কারো সঙ্গে দেখা করবেন না, বিকেলে মিটিং আছে। এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন।' আমি আমার পরিচয় জানিয়ে বললাম, 'আপনারা আমার নামটা বলেন, উনি না করলে আমি চলে যাব।' পরে অভ্যর্থনাকারীকে দোতলায় পাঠানো হলো। বঙ্গবন্ধু আমাকে যাওয়ার অনুমতি দেন। আমি কাছে যেতেই তিনি জানতে চাইলেন, 'কিরে খবর টবর আছে নাকি?' আমি তাঁকে জানালাম, 'সেনাবাহিনী গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছে। যে কোনো সময় আক্রমণ করে বসতে পারে। বিশেষ করে আপনি যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেন তাহলে ওরা আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে তো অত অস্ত্র নেই যে ওদের আক্রমণ ঠেকাব। অনেক মানুষ মারা যাবে।' তিনি তখন জানতে চাইলেন, 'তাহলে কি করা যাবে?' আমি তাঁকে অনুরোধ করি 'আপনি বক্তৃতায় আমাদের যে স্বাধীন হতে হবে এবং এ জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন সে বিষয় বলতে পারেন কিন্তু সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন না।'

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'দেখ, ছাত্ররা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমি ঘোষণা না করলেও ওরা এগিয়ে যাবে। কারণ ওদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আমিই উৎসাহিত করেছি।'

মোয়াজ্জেমের লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি এবং স্বীকৃতি না পাওয়ায় ক্ষোভ

বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে গোপন বিপ্লবী তৎপরতায় সামিল হয়ে ভাগ্যচক্রে হোক দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্রে হোক অভিযুক্তদের যে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে জীবন যাবার উপক্রম হয়েছিল তা অনস্বীকার্য। আর সরকার এ মামলা কোনো না কোনোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে ওইসব অভিযুক্ত ছাড়াও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনও বিপন্ন হতো। আন্দোলন পড়ে থাকতো মুখ থুবড়ে। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে অভিযুক্তদের সবার দৃঢ় অস্বীকৃতি এবং এই মামলাকে ষড়যন্ত্রমূলক আখ্যায়িত করে সৃষ্ট গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মামলাটি প্রত্যাহার করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ সংশ্লিষ্ট সবাই মুক্তি পান। তবে তাঁরা যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশপ্রেম ও ত্যাগের মহিমা সৃষ্টি করেছেন, সশস্ত্রবাহিনীর অন্য বাঙালি সদস্যদের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্রবীজ ঢুকিয়ে দিয়েছেন তা পরবর্তীতে সেসব বাঙালি সৈন্যকে ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে উজ্জীবিত করেছে। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের এই অধ্যায়টুকু ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী কোনো সরকার এ ব্যাপারে যথাযথ অনুসন্ধান কিংবা মূল্যায়ন ও সঠিক ইতিহাস রচনার উদ্যোগ নেয়নি। বেসরকারি পর্যায়েও সমসাময়িক লেখালেখিতে মামলার কার্যক্রম, অভিযোগ এবং অভিযুক্তদের তৎপরতা সম্পর্কে ভাসা ভাসা কিছু লেখালেখি হলেও তাঁদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে বসে অনুসন্ধানমূলক বা তথ্য নির্ভর লেখা কোনো ইতিহাস রচনা চোখে পড়েনি। এ নিয়ে অনেকের মধ্যে দুঃখ ও ক্ষোভ জমা হয়ে রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুল জলিল বলেন, 'আমরা যে গোপন আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলাম তাতে আমাদের নিজেদের কোনো স্বার্থ চিন্তা ছিল না। পাকিস্তানিদের শোষণ বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার পুরো বাঙালির স্বার্থই আমরা চিন্তা করেছিলাম। আমাদের যে আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যে সশস্ত্র প্রস্তুতিমূলক তৎপরতা তার কোনো কিছুই মিথ্যা ছিল না। যদিও আত্মরক্ষার্থে সেদিন আমরা তা অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলাম। স্বাধীনতার পর কি আওয়ামী লীগ, কি বিএনপি কোনো সরকারই আমাদের কার্যক্রমের সরকারি স্বীকৃতি দিল না এটাই আমাদের বড় দুঃখ।'

সার্জেন্ট জলিল ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধুর কথা স্মরণ করে বলেন, 'স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর

সঙ্গে আমাদের অনেকের দেখা হয়েছে, নানা বিষয়ে কথা হয়েছে। সমস্ত ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন তিনি। তবে আমাদের কাজের স্বীকৃতির বিষয়টি নিয়ে কথা হয়নি। আমরাও এনিয়ে তাঁর কাছে কোনো কথা তুলিনি। কারণ, তখন আমরা ভেবেছি দেশ স্বাধীন হয়েছে মাত্র, চারদিকে নানা সমস্যা। এটা কোনো কিছু চাওয়ার সময় না।'

তবে বঙ্গবন্ধু সামগ্রিক বিষয়টি নিয়ে না ভাবলেও আগরতলা মামলার অভিযুক্তদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি ভাবতেন-একথা উল্লেখ করে জনাব জলিল বলেন, "বঙ্গবন্ধু একদিন আমাকে বললেন, 'তুমি তো এয়ারফোর্স থেকে চলে এসেছো, এখন কি করতে চাও, কোথায় যেতে চাও।' আমি বললাম, 'আপনি যদি বিশ্বাস করতে পারেন–আমার কথা শেষ করতে না করতেই তিনি আমাকে তেজগাঁও সরকারি মোটর ভ্যাহেইকল ওয়ার্কশপে ব্যবস্থাপক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা জানান। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি সেখানে ওই পদে ছিলাম। সারাদেশের সরকারি গাড়ি এখান থেকে রক্ষণাবেক্ষণ হতো। কিন্তু যুদ্ধ বিধ্বস্ত অবস্থা কাটিয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলেও পরবর্তী কোনো সরকারই আমাদের স্বীকৃতির বিষয়টি আমলে নেয়নি।"

তিনি জানান, ৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আগরতলা মামলার আসামিদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির বিষয়টি তুলে ধরে আওয়ামী লীগের সাংসদ হাদিউজ্জমান দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব তোলেন। কিন্তু সরকারিভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। পরে সাংসদ কর্ণেল (অব.) শওকত আলী হাদিউজ্জামানকে দিয়ে সংসদে একটি বিল উত্থাপনের চেষ্টা করলেও অজানা কারণে তা আর হয়নি।

তিনি দুঃখ করে বলেন, 'সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে ৬৯র গণআন্দোলনের সূচনা। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতেও সরকারিভাবে কোনো কর্মসূচি থাকে না। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকতে বিমানবাহিনীর সদস্যরা এসে তাঁর কবরে ফুল দিতেন। গার্ড অব অনার দিয়ে সম্মান জানাতেন। বর্তমানে আসামিদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন তাঁরা, প্রয়াতের পরিবারের সদস্যরা এবং জহুরুল হক হলের ছাত্ররা ছাড়া আর কেউ তাঁর কবরস্থানে যান না। স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের নাম সার্জেন্ট জহুরুল হক হল করা হয়।' পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের ধারাবহিকতায় আগরতলা মামলার বিষয়বস্তু নিয়ে একটা অধ্যায় থাকা উচিৎ বলে অভিমত দেন সার্জেন্ট জলিল।

মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে খুরশিদ উদ্দিনের বিভিন্ন সময় দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। কিন্তু স্বীকৃতি নিয়ে কথা হয়নি। তিনি বলেন, 'মামলা শেষে আমরা চাকরি বা ব্যবসা যাঁর যেটা দরকার সেভাবে জড়িয়ে পড়ি। পরে আমাদের মধ্যে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি তাঁদের মধ্যে যাঁরা সেনাবাহিনীতে থাকতে চেয়েছেন তাঁদেরকে চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কাউকে কাউকে অন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে চাওয়া পাওয়া নিয়ে তেমন কথা প্রকাশ্যে হয়নি। তবে কোনো সরকার গৌরবময় বিষয়টিকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি না দেওয়ায় অনেকের মধ্যে কিছু ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

কমান্ডার আবদুর রউফ বলেন, "মামলা থেকে রক্ষা ও জীবন বাঁচানোর তাগিদ থেকে আমরা সবকিছু অস্বীকার করি। কিন্তু পরবর্তী সময়েও আমরা যে বিষয়টি স্বীকার করিনি তার কারণ রাজনৈতিক। সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপে এবং অন্যান্য জায়গায় অবস্থানকারীদের মধ্যে রাজনৈতিক কিছু মতভেদ সত্ত্বেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্বে আমরা একমত ও একত্রিত হয়েছিলাম।

গ্রুপের সদস্য হিসেবে বঙ্গবন্ধু নিজে আমাদের আদর-স্নেহ সহানুভূতি যা দেওয়ার যথেষ্ট দিয়েছেন। '৭৬ সালে আমাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বরখাস্ত করা হয়। কোনো পাওনা না দিয়ে আমার চাকরি যাওয়ার ২১ বছর পর শেখ হাসিনা আমার পদমর্যাদা ও সার্ভিস বেনিফিট সব ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বড় রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয় নেতা হিসেবে শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু উপাধি পাওয়ার পর আওয়ামী লীগের অনেকে আমাদেরকে যথার্থ মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহী ছিলেন কিংবা খাটো করে দেখার চেষ্টা করেছেন। এর প্রমাণ, এখনো মামলাটিকে অনেকে 'তথাকথিত' বলে উল্লেখ করেন। ধারণা করা হয়, দলের নেতা-কর্মীদের আবেগের কারণে গ্রুপ হিসেবে তখন আমাদের যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়নি। পরবর্তীতেও আওয়ামী লীগ সরকার কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় কিছু দুঃখ তো সবার মনে থাকতেই পারে।"

লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের স্ত্রী কোহিনুর বেগমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বোঝা গেছে মামলা চলাকাল থেকে শেখ মুজিবের সঙ্গে মোয়াজ্জেম পরিবারের কিছু ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছিল।

৬৯ সালে আইউব খান দেশের রাজনৈতিক সংকট নিয়ে আলোচনার জন্য রাওয়ালপিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক ডাকলে মাওলানা ভাসানীসহ অনেকে সেই বৈঠকে যেতে অস্বীকৃতি জানান। বাইরে প্রকাশ পায় যে, সে সময় শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে বৈঠকে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি তাতে সম্মত হন। অনেকেই তখন শেখ সাহেবের সমালোচনা করেন, তিনি হয়তো আইউবের ফাঁদে পা দিয়ে কোনো রকম সমঝোতা করবেন এই আশঙ্কায়। এমন সমালোচনামূলক কথাবার্তা শুনে তা বিবেচনায় নেন মিসেস মোয়াজ্জেম। তিনি বলেন, 'আমি শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বলেছিলান প্যারোলে না যাওয়ার জন্য। কারণ উনি (শেখ মুজিব) প্যারোলে মুক্তি পেয়ে পাকিস্তান যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে কেউ কেউ বলেছিলেন, উনি হয়তো সেখানে গিয়ে সরকারকে কিছু একটা বুঝিয়ে বের হয়ে যাবেন, আর এদিকে এদের (মোয়াজ্জেম ও অন্যদের) জেল-টেল কিছু একটা শাস্তি হয়ে যাবে। বিষয়টি আমার মাথায়ও ঢুকলো। আমি তখন শেখ সাহেবকে গিয়ে বলি, 'আপনি এভাবে প্যারোলে মুক্তি নিয়ে যেতে পারেন না। গেলে এদের সবাইকে নিয়েই বেরোতে হবে।' উনি তখন আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'দেখুন আপনি যেমন ফরিদপুরের মানুষ, আমিও ফরিদপুরের মেয়ে। কিছু একটা হলে আমি ছাড়ব না।' উনি তখন বলেছিলেন, 'আরে মেয়ে বলে কী? আমি সবাইকে নিয়েই বেরোবো।' পরে আমার স্বামী মুক্তি পেয়ে আমাকে বলেছিলেন, শেখ সাহেব নাকি বলছেন, 'তোমার স্ত্রী তো বাঘের বাচ্চা বাঘিনী।'

এদিকে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু পুরোপুরি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার মন্ত্রে মানুষকে উজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেন। একজন এক ভোটের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে ছয় দফার ব্যাপারে ম্যান্ডেট আদায়ের দিকে এগিয়ে যান তিনি। তাঁর উপলব্ধি ছিল ছয় দফা পাকিস্তানিরা মানবে না। ছয় দফা না মানলে তার ভিত্তিতে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে এক দফা অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলন ত্বরান্বিত করা যাবে। সংশ্লিষ্ট সেনা সদস্যদের কয়েকজন জানিয়েছেন, কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের মন সেদিকে তখন সায় দেয়নি। তিনি 'লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন পরিষদ' নামে নতুন একটি সংগঠন তৈরি করেন। যদিও সেটি তেমন একটা গ্রহনযোগ্যতা পায়নি।

মিসেস মোয়াজ্জেম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি শুনেছি মামলা থেকে বের হয়ে আসার পর ওনার সঙ্গে (বঙ্গবন্ধুর) আমার স্বামীর কোনো কারণে হয়তো বিরোধ দেখা দিয়েছিল। শেখ সাহেব নাকি একদিন তাকে বলেছিলেন 'মোয়াজ্জেম, দেশটাকে স্বাধীন করতে পারলে তোমাকে দেশের রাষ্ট্রদূত করে দেব।' মোয়াজ্জেম নাকি বলেছিল আমার ওসব কিছুর লোভ নেই। দরকারও নেই।' মার্কিনীরাও নাকি তাকে বলেছিল, 'সেন্ট মার্টিনটা আমাদের দিয়ে দিলে আমরা তোমাদের সাহায্য করব।' কিন্তু মোয়াজ্জেম দেশের কথা ভেবেছিলেন। কোনো লোভ তাঁর ছিল না। সে 'লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন পরিষদ' গঠন করে ৭০ সালে। এ নিয়ে কিছু ক্যাম্পেইনও করে। তখনকার আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সংগঠনের বেশ কিছু নেতা-কর্মী মোয়াজ্জেমকে সমর্থন দিয়েছিলেন। অনেকেই তাঁকে একটি নতুন পার্টি করার প্রস্তাব দেন। তাই মার্চেই সে সংবাদ সম্মেলন করে 'জাতীয়তাবাদী দল' নামে একটি পার্টি গঠনের ঘোষণা দেয়, যেটার অনুসরণে পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেছেন। তবে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংগ্রহ করে রাখিনি। এ ছাড়া কোনো কিছুতে সামনে থাকতাম না বলে সংশ্লিষ্ট কারো চেহারা বা নামও মনে রাখতে পারিনি।" স্বাধীনতার পর থেকে মোয়াজ্জেমকে সরকারিভাবে মূল্যায়ন বা পরিবারের প্রতি কেউ খোঁজখবর রাখেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করে মিসেস মোয়াজ্জেম।

আগরতলা মামলা উঠে যাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ও কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের মধ্যে দূরত্ব প্রসঙ্গে মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'জেলে থাকা অবস্থায় কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের চিন্তা ছিল আমাদের যে চিন্তাধারা অর্থাৎ সশস্ত্র উপায়ে দেশকে স্বাধীন করা এবং জেল থেকে বের হওয়ার পর আবার সেই পরিকল্পনা নিয়েই এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু বঙ্গবন্ধু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিকভাবে জনগণকে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে জাতীয় নেতায় পরিণত হন। অপরদিকে কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের রাজনৈতিক কোনো অভিজ্ঞতা বা অর্জন ছিল না। পরে তিনি 'লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করে পৃথকভাবে অগ্রসর হতে চাইলেন। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তা তেমন গুরুত্ব পায়নি। সম্ভবত এনিয়ে উভয়ের মধ্যে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি এবং দূরত্ব তৈরি হয়।'

লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি

'লে. কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম যে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি করেন তাতে সুলতান উদ্দিন, এবিএম সামাদসহ কয়েকজন প্রথম দিকে যোগ দিয়েছিলেন। তবে অনেকে এতে সম্মতি দেননি। আলী নওয়াজের মতে, "আমি তখনই বুঝেছিলাম, এটা করে কোনো লাভ হবে না, জনগণের মাঝে কোনো প্রভাবও ফেলা যাবে না। বিষয়টি আমি মোয়াজ্জেম ভাইকে বুঝিয়েছিও। আলী রেজা ভাইও তাঁকে বুঝিয়েছেন যে, 'দেখুন এসবের দরকার নেই। কারণ শেখ সাহেবকে এক দফা অর্থাৎ স্বাধীনতার দিকে যেতেই হবে। দেশের জনগণ ও অন্যান্য নেতা-কর্মীরা সেদিকে অনেক অগ্রসর হয়েছে। শেখ সাহেব যদি সেদিকে না এগোন তাহলে তিনিই পিছিয়ে পড়বেন। ভাইও (আলী রেজা) বলছিলেন, 'শেখ সাহেবের সঙ্গে আমাদের কিছু বিষয়ে পার্থক্য হয়তো রয়েছে। কিন্তু এক দফাকে তো তিনি অনুমোদন করেছেন, বলেছেন এক দফা ছাড়া উপায় নেই। এ ছাড়া তাঁর সঙ্গে যেরকম জনতা ও ছাত্র নেতা-কর্মী রয়েছে, সে রকম তো আর কারও নেই। কাজেই এগুলো করে লাভ হবে না।' তাঁরা কিছুদিন বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটা সভা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটা তেমন কার্যকরী হয়নি।"

এ প্রসঙ্গে মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী আইউব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগ দেওয়া বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন আস্থাভাজন মোয়াজ্জেম মাহমুদ চৌধুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মোয়াজ্জেম মাহমুদের একাধিকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয়েছে। কিন্তু মোয়াজ্জেম সাহেবের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের খোঁজখবর না নেওয়ায় তিনি বঙ্গবন্ধুর ওপর কিছুটা অভিমান করেন। মোয়াজ্জেম সাহেব একদিন মাহবুব উদ্দিন চৌধুরীকে বললেন, 'আমি তাঁর জন্য এতকিছু করলাম, অথচ তিনি আমাকে ডেকে জানতে চাইলেন না যে আমার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন চলছে। আমিও নিজ থেকেও কিছু বলিনি।'

স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও দুর্নীতি বেড়ে যাওয়ায় বঙ্গবন্ধুর আগরতলা মামলাখ্যাত সহযোদ্ধাদের অনেকের মধ্যে হতাশা ও অসন্তোষ দেখা দেয়। তাঁরা বিচ্ছিন্ন এই পরিস্থিতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন পরিস্থিতি উত্তরণে কী করা যায়। একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কীভাবে বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়ে নিজেদের মনের কথা তাঁরা মন খুলে বলতে পারবেন সে চিন্তা তাঁরা করছিলেন। মাহবুব চৌধুরীর ভাষায়, 'দেশের যে পরিস্থিতি, জনগণের কষ্ট যেভাবে বাড়ছিল, এমন বাংলাদেশ তো আমরা চাইনি।' প্রসঙ্গত মাহবুব চৌধুরী ইতিমধ্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। ৭৪ এর জুলাইয়ের আগে তাঁর আর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়নি।

এদিকে, কোনো না কোনো সূত্রে তাঁদের হতাশা ও অসন্তোষের কথা বঙ্গবন্ধুর কানে পৌঁছে যায়। তিনি একদিন সংশ্লিষ্টদের গণভবনে ডেকে পাঠান তাঁদের কথা শোনার জন্য। মাহবুব চৌধুরী জানান, "তখন আগরতলা মামলার আসামি চট্টগ্রামের মাহফুজুল বারী ছিলেন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের উপপ্রধান। শেখ সাহেবের কাছে তাঁর যাতায়াত

ছিল। ৭৪ সালের জুলাই মাসে তিনি আমাদের বললেন, 'বঙ্গবন্ধু আমাদের গণভবনে ডেকেছেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে ছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের গোপন প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকে ১৮ জন ২৬ জুলাই গণভবনে যাই। যাওয়ার সময় আমরা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির বিবরণসহ একটা প্রস্তাবনাও তৈরি করে নিই এবং সেটি তাঁকে দিই। বঙ্গবন্ধু সেটি পড়ার আগেই কথার ফাঁকে বললেন, 'দেখ, দুর্নীতি দেখার জন্য বাইরে যেতে হবে না। আমি ৩২ নং বাড়ি থেকে গণভবনে আসি সকাল আটটায়। আর বাড়িতে ফিরি রাত আটটা-নয়টায়। মাঝে মাঝে প্রয়োজন হলে ঢাকার বাইরে যাই। আমার গাড়ির বিলটা তোমরা গিয়ে চেক করো তাহলেই বুঝতে পারবে দেশে কী পরিমাণ দুর্নীতি হয়। কিন্তু কী করব। যাকে যেখানে দায়িত্ব দিই সে-ই বেইমানি করে। যাঁকে বিশ্বাস করি সে-ই পেছনে চুরি মারে।' দুর্নীতি সম্পর্কে তাঁর এরকম কথা শুনে মনে হলো আসলে সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে আছে। কিন্তু নানা কারণে সামাল দেওয়া যাচ্ছিল না। এ পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, 'বর্তমান অবস্থায় বিরাজমান পরিস্থিতি বদলানো যাবে না। এর পরিবর্তন করতে হলে সমাজতন্ত্র আনতে হবে এবং সেপথে এগুতে হবে।' মনে আছে আমি তখন বলেছিলাম 'এটা যদি সত্যি সত্যি মিন করেন, তাহলে প্রয়োজনে গুলি এলে আমি আগে আমার বুকে গুলি নেওয়ার চেষ্টা করব।'

প্রসঙ্গত ১৯৭৪ এর জুলাইয়ে বঙ্গবন্ধু যে পরিবর্তনের কথা বললেন, তার মাত্র ছয় মাসের মাথায় অর্থাৎ ৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি বাকশাল পদ্ধতি চালুর ঘোষণা দেন।"

আলী নওয়াজ স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর অনেক মানবিক গুণাবলী ছিল। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হওয়ায় নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলতে দ্বিধা করতাম না। অনেক সময় তিনি তাঁর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাইয়েছেন। কখনো কোনো কথায় ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে, কিংবা ওনার কথায় অভিমান করে বলেছি, 'ঠিক আছে আমি খাব না।' উনি তখন জোর করে আমার মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন।' বলতে বলতে আবেগাপ্লুত হয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে ফেলেন আলী নওয়াজ। চোখের পানি মুছতে মুছতে বলেন, "আজ আমাদের কোনো মূল্যায়ন নেই। আমরা যেন কেউ না। এটাই বড় দুঃখ। আরও একটা দুঃখ আমাদের মধ্যে রয়েছে। সেটা হচ্ছে স্বাধীনতার পর দেশের দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে ডেকে কোনো পরামর্শ করেননি। তিনি যদি আমাদের সবাইকে ডেকে বলতেন, 'দেখ দেশের আজ এই অবস্থা, তোরা কিছু একটা কর।' আমরা তখনই তাঁর ডাকে সাড়া দিতাম। তিনি হয়তো ডাকার সুযোগই পাননি। ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে কোনোদিকে মনযোগ দিতে দেননি। এ ছাড়া তিনি অনেক সময় বাস্তবতাও বুঝতে চাননি। ৭৫ এর ১৫ আগস্টের অনেক আগেই আমরা তাঁকে বুঝিয়েছি, 'স্যার আপনি নিরাপদে থাকুন, সতর্ক থাকুন। কারণ আপনাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত চলছে।' তিনি এসবে পাত্তা না দিয়ে বলতেন, 'আমাকে কে মারবে আবার?' আমি একবার মুখের ওপর বলেছিলাম, 'বাঙালিরাই মারবে।"

১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় মনোনয়নকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলী রেজার মনোমালিন্য দেখা দেয়। 'আলী নওয়াজের দেওয়া তথ্য মতে, ৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী

লীগের মনোনয়ন বোর্ড আলী রেজাকে প্রাদেশিক পরিষদের একটি আসনে মনোনয়ন দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আলী রেজা চেয়েছিলেন জাতীয় পরিষদের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। এ ব্যাপারে তিনি সরাসরি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বললে বঙ্গবন্ধু তাঁকে ভবিষ্যতে পররাষ্ট্র বা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মতো জায়গায় কাজে লাগানোর প্রয়োজনের কথা বলেন। কিন্তু তাতে তিনি (আলী রেজা) সন্তুষ্ট হতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে পুরোনো সম্পর্কের সূত্র ধরে বঙ্গবন্ধুর কাছে যাতায়াত-যোগাযোগ থাকলেও আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত থাকেননি।

১৯৭২ সালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠিত হলে এর যৌথভাবে আহ্বায়ক হন আবদুল আউয়াল ও আলী রেজা। এর আগে আউয়াল সাহেব ছিলেন আদমজি শিল্প গোষ্ঠীর শ্রম বিষয়ক উপদেষ্টা। কিন্তু আলী নওয়াজের ভাষায় 'এক পর্যায়ে জাসদের মধ্যে ধ্বংসাত্মক তৎপরতার প্রবণতা দেখা দেওয়ায় তিনি সেখানে থাকেননি।'

জয়নাল আবেদীন খান বলেন, "একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর দেশের সামগ্রিক অবস্থা ভালো ছিল না। নিজেরও ছিল না কর্মসংস্থান। একদিন আমি লে. মতিউর রহমানের সাথে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করি। অনুরোধ করি আমাদের কোনো রকম কর্মসংস্থান করা যায় কী না। তিনি স্বাধীনতার জন্য আমাদের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'দেখুন সবেমাত্র দেশ স্বাধীন হল। এই মুহূর্তে চারদিকে নানা ঝামেলা, সংকট। একটু অপেক্ষা করুন। সামনে দেখি কী করা যায়।' এরপর আর কখনো তাঁর কাছে যাইনি, অন্য কাউকেও কিছু বলিনি। মনের কষ্ট মনে চেপে রেখেছি।

আজ এতদিন পর স্বাধীনতার জন্য আমাদের ভূমিকার কথা শুনে অনেকে হয়তো ভাববেন, আমরা এসব বানিয়ে বলছি। কারণ স্বাধীনতার আগে আমাদের প্রথম দিকের কার্যক্রমকে ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রচার করা হয়েছে এবং সেভাবেই তা প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার মনে হয় এ কারণেই পরবর্তী সময়ে এভাবে আমরা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছি।'

কর্নেল (অব.) শামসুল আলম বলেন, 'আমরা চেয়েছিলাম স্বাধীনতা। সেটা পেয়েছি এবং এর চাইতে বড় পাওনা হতে পারে না। তবে সরকারিভাবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেলে সবাই মানসিকভাবে শান্তি পেতেন।'

পরিশিষ্ট

অভিযুক্ত ও রাজসাক্ষীর তালিকা

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মোট ৩৫ ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। এতে এক নম্বর তথা প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ ছাড়া রাজসাক্ষী হয়েছিলেন ১১ জন। অভিযুক্ত ও রাজসাক্ষীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখানে দেওয়া হলো।

অভিযুক্ত:

১। শেখ মুজিবুর রহমান, পিতা-মৌলভী শেখ লুৎফর রহমান, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর। হাল সা.-৬৭৭, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, রোড নং-৩২, ঢাকা।

২। পি, নং ৫৭৪ লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, পিতা-মৌলভী মোফাজ্জল আলী, ধুসরিতাল, পিরোজপুর, বরিশাল।

৩। ও, নং ৬৬৫০৮ স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, পিতা-মুন্সী আব্দুল লতিফ, ঘাটমাঝি, মাদারীপুর, ফরিদপুর।

৪। প্রাক্তন এল.এস সুলতান উদ্দিন আহমদ, পিতা-মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ, উত্তর খামার, কাপাসিয়া, ঢাকা।

৫। ও নং ৬৪৬৭২ এলএস সিডি আই নূর মোহাম্মদ, পিতা-তমিজ উদ্দিন আখন্দ, কুমারগাও, লৌহজং, ঢাকা।

৬। আহমদ ফজলুর রহমান, সিএসপি, পিতা-ইমাম উদ্দিন আহমদ, (ক) কচিসার, দেবীদ্বার, কুমিল্লা। (খ) ৭০৮ নং ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, রোড নং-৩০ ঢাকা।

৭। পাক/৫১৩০১, ফ্লাইট/সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ পিতা-হাজি মোহাম্মদ ইসমাইল, মুরাদপুর, নয়াহাট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

৮। প্রাক্তন করপোরাল আবুল বাসার মোহাম্মদ আবদুস সামাদ, পিতা-ইন্তেআলী মৃধা, মিঠাখালি, মঠবাড়িয়া, বরিশাল।

৯। প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দিন, পিতা-আফিজ উদ্দিন, শ্যামপুর, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

১০। রুহুল কুদ্দুস, সিএসপি, পিতা-রইসুদ্দিন আহমদ।

(ক) পাঁচরখি, কাকড়াঙ্গা, সাতক্ষীরা, খুলনা।

(খ) ৬১৮-এ, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, রোড নং-১৮ ঢাকা।

১১। পাক/৭২৮৭০, ফ্লাইট/সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক, পিতা-মৌলভী সৈয়দ আলী তালুকদার, শায়েস্তাবাদ, কোতোয়ালী, বরিশাল।

১২। ভূপতিভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী, পিতা-ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী, হাবিলাসদ্বীপ, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

১৩। মি. বিধানকৃষ্ণ সেন, পিতা-রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন, সারোয়াতলী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

১৪। পিজেও-২০৬৮ সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, পিতা-সিতু সরকার, (ক) দক্ষিণ বরষারচর, মতলবগঞ্জ, কুমিল্লা।

১৫। প্রাক্তন হাবিলদার/ক্লার্ক মুজিবুর রহমান, ইপিআরটিসি, পিতা-আবদুর রহমান, গোপালপুর, নবীনগর, কুমিল্লা।

১৬। প্রাক্তন ফ্লাইট/সার্জেন্ট মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, পিতা-মুন্সী আসকার আলী, বাঞ্ছারামপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

১৭। পাক/৭২৩২৪ সার্জেন্ট জহুরুল হক, পিতা-কাজী মুজিবুল হক, সোনাপুর, সুধারাম, নোয়াখালী।

১৮। প্রাক্তন এ/বি মোহাম্মদ খুরশীদ, পিতা-আবদুল জব্বার, সাবের কটেজ, ফরিদপুর।

১৯। এম. শামসুর রহমান খান সিএসপি, পিতা-ইমতিয়াজ উদ্দিন খান, লামুবাড়ি, মানিকগঞ্জ, ঢাকা।

২০। পিজেও-৭৬৮ রিসালদার একেএম শামসুল হক, এসি, পিতা-আবদুস সামাদ, লামুবাড়ি, মানিকগঞ্জ, ঢাকা।

২১। নং ৩০৩১০১৮ হাবিলদার আজিজুল হক, এসএসজি, পিতা-সিরাজুল হক, কচিয়া, বড়নদী, বরিশাল।

২২। পাক/৭৩০৪০/এসসি মাহফুজুল বারী, পিতা-মাওলানা একে মোমাজ্জাদ, চরলক্ষ্মী, রামগতি হাট, নোয়াখালী।

২৩। পাক/৭০৪১৫/ সার্জেন্ট শামসুল হক, পিতা-হাজি সাদেক আলী, নৈরাজপুর, কেএন হাট, ফেনী।

২৪। পিএসএস-১০০৫২০ মেজর শামসুল আলম এএসসি, পিতা-শামসুজ্জোহা, ১৬ নং খাজে দেওয়ান সেকেন্ড লেইন, ঢাকা।

২৫। পিএসএস-৬১০০ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল মোতালিব, পিতা-হাফিজ উদ্দিন, দরুদবাই রতি, পূর্বধলা, শামগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ।

২৬। পিটিসি-৫৭২৭ ক্যাপ্টেন এম শওকত আলী মিয়া, পিতা-মুন্সী মোবারক আলী নড়িয়া, ফরিদপুর।

২৭। পিএ-৬৫৬১ ক্যাপ্টেন খোন্দকার নজমুল হুদা, এসএসসি, পিতা-মরহুম খোন্দকার মোজাম্মেল হোসেন, পশ্চিম বগরা রোড, বরিশাল।

২৮। ক্যাপ্টেন এএনএম নুরুজ্জামান, ইবিআই, পিতা-মৌলভী আবু আহমদ, সাইদাবাদ, রায়পুরা, ঢাকা।
২৯। পাক/৭০৭০৪, সার্জেন্ট আব্দুল জলিল, পিতা-মৌলভী আব্দুল কাদের, সররাবাদ (হাজিবাড়ি), নারায়ণপুর, ঢাকা।
৩০। মোহাম্মদ মাহবুবউদ্দিন চৌধুরী, পিতা-আলহাজ মৌলভী আজিজ উদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী, পাইয়াম, চৈতিয়ান, সিলেট।
৩১। পি নং ৯৫৮, ফাস্ট লেফটেন্যান্ট এমএমএম রহমান, পিতা-মোল্লা মোহাম্মদ সোলায়মান, মাকরাইল, লোহাগড়া, যশোর।
৩২। প্রাক্তন সুবেদার একেএম তাজুল ইসলাম, পিতা-মৌলভী দলিলুদ্দিন আহমদ, শ্রীপুর, ভাণ্ডারিয়া, বরিশাল।
৩৩। মোহাম্মদ আলী রেজা, পিতা-মৌলভী জহুর আলী আহমদ, লাহিনী, কুষ্টিয়া, কোতোয়ালী, কুষ্টিয়া।
৩৪। পিএসএস ২০০৪৭১, ক্যাপ্টেন খুরশীদ উদ্দিন আহমদ এএমসি, পিতা-মৌলভী আব্দুর রহমান, বাশিয়া, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।
৩৫। পি নং ৯৪৪ ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ, পিতা-আলহাজ আবদুল লতিফ, পাকিস্তান হাউস, ভৈরব, ময়মনসিংহ।

রাজসাক্ষী

লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল হোসেন, পিতা-মিনহাজ উদ্দিন মিয়া, বাসাইল, ময়মনসিংহ। (২) প্রাক্তন করপোরাল মো. আমীর হোসেন মিয়া, পিতা-মৌলভী ফাজিল মোল্লা, জাজিরা, ফরিদপুর। (৩) সার্জেন্ট পাক ৫/৪২৭২ শামসুদ্দীন আহম্মদ, পিতা-মোহামদ আফতাব উদ্দীন, কোতোয়ালী, ময়মনসিংহ, (৪) ডা. সায়েদুর রহমান, পিতা-মৌলভী আবুল খায়ের চৌধুরী, এনায়েত বাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম। (৫) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ, পিতা এমএম সিরাজ, রূপগঞ্জ, ঢাকা এবং ৬০ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম, (৬) ক্যাপ্টেন পিএ/৬৬৩২ মোহাম্মদ আলিম ভূঁইয়া, পিতা-আলহাজ মজম উদ্দীন ভূঁইয়া, মুরাদনগর, কুমিল্লা, (৭) করপোরাল সিরাজুল ইসলাম, পিতা-মৌলভী আমিন উদ্দীন, বুড়িচং, কুমিল্লা। (৯) মোহাম্মদ গোলাম আহমদ, পিতা-আব্দুল জব্বার, জাফরাবাদ, মাদারীপুর, (১০) আবুল বাশার মোহাম্মদ ইউসুফ, পিতা-মুন্সী মোহাম্মদ আলী হাওলাদার, বরিশাল, (১১) সার্জেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, পিতা-মুন্সী আব্দুল আজিজ, চান্দিনা, কুমিল্লা।

(অভিযোগপত্রে দেওয়া নাম-ঠিকানাই এ তালিকায় দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে অধিকাংশের ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে।)

সরকার পক্ষের অভিযোগপত্র

(রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য)

১৯৬৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারি আইন অধ্যাদেশের ইউ/এস-৫ ধারামতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই মামলার ভাষ্য আদালতে উপস্থাপন করা হলো।

যথাযথ সম্মানের সঙ্গে উপস্থাপন করা যাচ্ছে যে:

১. গোপনসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের অনুসরণে এমন একটি ষড়যন্ত্র উদঘাটন করা হয় যার মাধ্যমে ভারত কর্তৃক প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও অর্থ ব্যবহার করে পাকিস্তানের একাংশে সামরিক বিদ্রোহের দ্বারা ভারতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি স্বাধীন সরকার গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কতিপয় ব্যক্তিকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা আইনের আওতায় এবং কতিপয় ব্যক্তিকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে চাকরির সঙ্গে সম্পৃক্ত আইনের আওতায় গ্রেপ্তার করা হয়।

২. ওইসব ব্যক্তির কয়েকজনের কাছ থেকে উদ্ধার করা তথ্য– প্রমাণাদিতে দেখা যায় যে, তাঁরা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির এবং কিছু নির্দিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ছদ্মনাম ব্যবহার করছে এবং একটি 'ডি ডে'-তে করণীয় কার্যক্রম সম্পর্কে ও অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁরা অনুরূপ ছদ্ম শব্দাবলী ব্যবহার করছে।

৩. তাঁদের প্রধান কর্মপরিকল্পনা ছিল সামরিক ইউনিটগুলোর অস্ত্রশস্ত্র দখল করে তাদেরকে অচল করে দেওয়া। কমান্ডো স্টাইলে অভিযান চালিয়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তাঁরা অগ্রসর হয়।

ক. সামরিক বাহিনী থেকে আসা লোকদের এবং প্রাক্তন সৈনিক ও বেসামরিক চাকরিজীবীদের তালিকা প্রণয়ন করা, যাঁরা কার্যকরভাবে একটি অগ্রবাহিনীর ভূমিকা পালন করে প্রচলিত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

খ. ভারত থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ছাড়াও স্থানীয় উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিরাপদে রাখা।

গ. মিথ্যা প্রচারণার সাহায্যে সর্বসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক আনুগত্যহীনতা সৃষ্টি করা। এবং

ঘ. জোরপূর্বক সামরিক কৌশলগত স্থানসমূহ দখল করার উদ্দেশ্যে 'ডি ডে'-এর মত একটি সুযোগের মুহূর্ত নির্ধারণ করা।

৪. এই ষড়যন্ত্র কার্যকর করার জন্য একটি সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় পাকিস্তানের যাঁরা ওই অভিযান কার্যকরী করার দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের প্রতিনিধিরা এবং ভারতীয় পক্ষের যাঁরা অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এই ষড়যন্ত্রকে সহায়তা করার উদ্যোগ নিয়েছিল তাঁদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ১৯৬৭ সালের ১২ জুলাই ভারতের আগরতলায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৫. এই ষড়যন্ত্র এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিচের অধ্যায়সমূহে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে, যখন অভিযুক্ত ষড়যন্ত্রকারীদের কোনো সভার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তখন ষড়যন্ত্রের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের পুনরাবৃত্তি পরিহার করা হয়েছে। যদিও তাঁরা তাঁদের প্রায় প্রতিটি সভায়ই ওই বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতো। এই অভিযোগনামার সঙ্গে পাঁচটি তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। এগুলোর শিরোনাম যথাক্রমে– 'তালিকা-এ', 'অভিযুক্তদের তালিকা', 'সাক্ষীর তালিকা', 'তথ্য-প্রমাণের তালিকা' ও 'জিনিসপত্রের তালিকা'– সংযোজনী-১ এ এগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সংযোজনী-২ এ অভিযুক্তদের ছদ্মনাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম যখন প্রথমবার উল্লেখ করা হয়েছে তখনই তাঁর সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে বলা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যখন ওই নামটি পুনরায় ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়েছে তখন শুধুমাত্র যাতে ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায় সে রকমভাবেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত তালিকাসমূহের যেকোনোটির অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার বেলায় ওই ব্যক্তি যে তালিকার অন্তর্ভুক্ত সেই তালিকার নাম এবং ওই তালিকার কত নম্বর ক্রমিকে তাঁর অবস্থান সেই নম্বরটি উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে, যখন প্রথমবারের মত কোনো স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তখন ওই স্থানের অবস্থান প্রভৃতি বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং পরে যখন আবার ওই স্থানটির নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়েছে তখন অন্যান্য স্থান থেকে ওই স্থানটিকে আলাদা করে বুঝানোর জন্য যেটুকু উল্লেখ করা দরকার তা-ই করা হয়েছে।

৬. ১৯৬৪ সালের ১৫ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর এই মামলার ১ নম্বর আসামি শেখ মুজিবুর রহমান করাচি সফর করছিলেন। এই সফরকালে তিনি পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন (বর্তমান লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন), আসামি নম্বর-২ কর্তৃক আহুত একটি সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এই লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৪ সালের শুরুতে তাঁর নিজ বাসভবন– বাংলো নং-ডি/৭৭, কেডিএ স্কিম নং-১, করাচিতে অনুষ্ঠিত একটি সভায় এই অভিযোগনামার ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ৪ নং আসামি প্রাক্তন বিশিষ্ট নাবিক সুলতান উদ্দিন আহমদ, ৫নং আসামি বিশিষ্ট নাবিক নূর মোহাম্মদ এবং ১নং সাক্ষী লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল হোসেনের সঙ্গে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য একটি বিপ্লবী সংগঠন সংগঠিত করার বিষয়ে তাঁরা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করবেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁদের এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এই

মামলার ২নং সাক্ষী মি. কামাল উদ্দিন আহমদের বাসায়, যার ঠিকানা-৩/৪৮, এমএসপিপি স্কুল টিচারস কো-অপারেটিভ সোসাইটি (মালামা আবাদ নামে বহুল পরিচিত), করাচি। এই সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন:

১. শেখ মুজিবুর রহমান, আসামি নং-১
২. মোয়াজ্জেম, আসামি নং-২
৩. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামি নং-৩
৪. সুলতান, আসামি নং-৪
৫. নূর মোহাম্মদ, আসামি নং-৫
৬. মি. আহমদ ফজলুর রহমান, সিএসপি, আসামি নং-৬ এবং
৭. মোজাম্মেল, সাক্ষী নং-১।

এই সভায় ২নং আসামি মোয়াজ্জেম বলেছেন যে, নৌ-বাহিনীতে অবস্থানরত পূর্ব পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একটি জঙ্গী বাহিনী সংগঠিত করেছে এবং সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানি কর্মকর্তারাও এই বাহিনীতে যোগদান করবেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এই পরিকল্পনা সফল করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সিভিল সার্ভিসে কর্মরত কর্মকর্তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ওই বাহিনীকে পরিচালনা করার জন্য তহবিল দরকার। ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান এর সঙ্গে শুধুমাত্র একমতই পোষণ করেননি, উপরন্তু তিনি বলেছেন যে, তাঁর নিজের ধারণা এবং পরিকল্পনাও এরকমই। তিনি ওই পরিকল্পনার প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেন এবং প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করে দেবার আশ্বাস দেন। ৬নং আসামি এএফ রহমান যখন ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হন যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যে বঞ্চনা ও বৈষম্য বিদ্যমান তার বিরুদ্ধে একমাত্র জবাব হচ্ছে সামরিক বিদ্রোহ। তখন তিনি একথাও উল্লেখ করেন যে, এ ধরনের সামরিক বিদ্রোহ সংঘটিত হলে ভারতের কী প্রতিক্রিয়া হবে তা তিনি বলতে পারেন না। এই পর্যায়ে ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, এ বিষয়টি তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) দেখবেন। তিনি আরও বলেন যে, তাঁরা যেন পরিকল্পনাটি কিছুদিনের জন্য ধীর গতিতে পরিচালনা করেন। কারণ, যদি আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিরোধীদলীয় প্রার্থী জয়লাভ করতে পারে তাহলে এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন না-ও হতে পারে।

৭. ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর পুনরায় করাচি সফর করেন এবং ১৯৬৫ সালের ১৫ থেকে ২১ জানুয়ারি সেখানে অবস্থান করেন। এ সময়কালের মধ্যে একদিন ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের পূর্বোক্ত বাসভবনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

১. শেখ মুজিবুর রহমান, আসামি নং-১
২. মোয়াজ্জেম, আসামি নং-২
৩. নূর মোহাম্মদ, আসামি নং-৫
৪. এএফ রহমান, আসামি নং-৬
৫. ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ, আসামি নং-৭ এবং
৬. লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল হোসেন, সাক্ষী নং-১।

এ ছাড়া আরও কয়েজন উপস্থিতের পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি। এই সভায় ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, একমাত্র একটি উপায়েই পূর্ব পাকিস্তানিরা আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলো- পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তাদের আলাদা হয়ে যাওয়া। তিনি ওই পরিকল্পনার প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেন ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন এবং ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে তাঁর কার্যক্রমের সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করে বিপ্লবী গ্রুপগুলোর তৎপরতা সম্প্রসারিত করতে বলেন।

৮. এই মামলার ৩নং সাক্ষী, করাচির কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসে কর্মরত মি. মোহাম্মদ আমীর হোসেন মিয়া ছিলেন মামলার ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব, ৪নং আসামি সুলতান এবং ৮নং আসামি প্রাক্তন করপোরাল আবুল বাশার মোহাম্মদ আবদুস সামাদের ঘনিষ্ঠ পরিচিত জন। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসের কোনো একদিন ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এতে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন খুবই অভিভূত হন এবং ওই গ্রুপের কার্যকরী সদস্য হয়ে ওঠেন।

৯. ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের বাসভবনে বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যে সভাগুলোতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা সাধারণভাবে উপস্থিত থাকতেন:

১. মোয়াজ্জেম, আসামি নং-২
২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামি নং-৩
৩. সুলতান, আসামি নং-৪
৪. নূর মোহাম্মদ, আসামি নং-৫
৫. হাবিলদার দলিল উদ্দীন, আসামি নং-৯ এবং
৬. আমীর হোসেন, সাক্ষী নং-৩।

এরা ছিলেন সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। এই সভাগুলোতে তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সাফল্য লাভের জন্য অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ নিয়ে আলোচনা হতো।

১০. পূর্ব পাকিস্তানে কাজকর্মের উদ্যোগ নেবার জন্য সংগঠনের কয়েকজন সক্রিয় সদস্যের স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে থাকা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের অনুরোধে একে একে ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪নং আসামি সুলতান ছুটি নিয়ে ঢাকায় চলে যান। তাঁদের স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ

করা হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম, ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪নং আসামি সুলতানের মাধ্যমে ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে একটি গ্রুপসভার আয়োজন করেন। এই সভায় গ্রুপ সদস্যদের করাচি থেকে ঢাকায় আসার জন্য যাতায়াত খরচ বাবদ ৪নং আসামি সুলতান ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের ঠিকানায় একটি রেজিস্টার্ড খামে করে ১৫০০ টাকা এবং টেলিগ্রাফ মানিঅর্ডারযোগে ৫নং আসামি নূর মোহাম্মদের কাছে ৫০০ টাকা পাঠায় এবং তাঁদের উভয়কেই ওই টাকা ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছে পৌঁছানোর জন্য বলে। এই টাকা যথাসময়ে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল।

১১. পূর্বোক্ত সভা ১৯৬৫ সালের ২৯ আগস্ট তারিখে নির্ধারিত ছিল। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম এবং ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ওই সভায় যোগ দেওয়ার জন্য পিআইএ বিমানযোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে করাচি ত্যাগ করেন।

১২. পূর্বোক্ত সভা নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট স্থানে বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেনঃ

১. শেখ মুজিবুর রহমান, আসামি নং-১
২. মোয়াজ্জেম, আসামি নং-২
৩. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামি নং-৩
৪. সুলতান, আসামি নং-৪
৫. রুহুল কুদ্দুস, সিএসপি, আসামি নং-১০ এবং
৬. আমীর হোসেন, সাক্ষী নং-৩

২নং আসামি মোয়াজ্জেম কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং বলেন যে, ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের দক্ষ পরিচালনা ও সহায়তায় তিনি সেনাবাহিনীর অনেক কর্মকর্তাকে সংগঠনের তালিকাভুক্ত করেছেন যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য কাজ করবেন। সভায় উপস্থিত সকলেই কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম অর্থ, অস্ত্র এবং গোলাবারুদের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের কাছ থেকে যাবতীয় সাহায্য সংগ্রহের আশ্বাস দেন। সাময়িকভাবে তিনি ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে ১ লাখ রুপী দেবার কথা বলেন যা ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪নং আসামি সুলতানের কাছ থেকে কিস্তিতে ২০০০ থেকে ৪০০০ টাকা করে নিতে বলেন।

১৩. ১৯৬৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাসভবনে গিয়ে তার কাছ থেকে ৭০০ টাকা পান এবং তা মামলার ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে পাঠান।

১৪. ১৯৬৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাড়িতে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে ৪০০০ টাকা পান এবং তা মামলার ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে পাঠান । আমীর হোসেন আবার ওই টাকা

থেকে ৩০০ টাকা মামলার ৩ ও ৪নং আসামি যথাক্রমে স্টুয়ার্ড মুজিব ও সুলতানের ব্যক্তিগত খরচের জন্য পাঠান এবং বাকি টাকা ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছে পৌঁছানোর জন্য নিজের কাছে রাখেন।

১৫. ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় যে সমস্ত প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা ছুটিতে কিংবা অস্থায়ী কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁদের নির্ধারিত কর্মস্থলে যেতে পারছিলেন না। এই অবস্থায় তাঁদেরকে পূর্ব পাকিস্তানেই কাজে যোগ দিতে বলা হয়। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪নং আসামি সুলতান চট্টগ্রাম নৌঘাঁটিতে কাজে যোগ দেন। আসামিদ্বয় চট্টগ্রামে কর্মরত থাকা অবস্থায়ও তাঁদের ষড়যন্ত্রমূলক সাংগঠনিক কাজকর্ম চালিয়ে যান।

১৬. ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ৬নং আসামি এএফ রহমানের বাসা-ফ্লাট নং-২১, ইলাকো হাউস, ভিক্টোরিয়া রোড, করাচিতে ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন:

১. মোয়াজ্জেম, আসামি নং-২

২. নূর মোহাম্মদ, আসামি নং-৬

৩. এএফ রহমান, আসামি নং-৬

৪. সামাদ, আসামি নং-৮ এবং

৫. আমীর হোসেন, সাক্ষী নং-৩

এই সভায় কাজকর্মের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়। ৬নং আসামি এএফ রহমান যুক্তরাজ্য থেকে একটি রেডিও ট্রান্সমিটার সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করার জন্য চেষ্টা করা হবে। সংগঠনের যাবতীয় কাজের জন্য ওই সময় ৬নং আসামি এএফ রহমানের অতিথি হিসেবে অবস্থানরত মামলার ৪নং সাক্ষী মি. কে জি আহমদের অফিসটি ব্যবহারের বিষয়টিও সভায় স্থির করা হয়।

১৭. ওই একই মাসে (ডিসেম্বর, ১৯৬৫) অন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয় মামলার ২ নং আসামি মোয়াজ্জেমের বাসা অফিসার্স কোয়ার্টার, কারসায, করাচি এই ঠিকানায়। এতে উপস্থিত ছিলেন পূর্বোক্ত ১৬ নং অধ্যায়ে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ৩ নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৪ নং আসামি সুলতান পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করে চলেছেন এবং খুব শিগগিরই ৮নং আসামি সামাদ এবং ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে গ্রুপের কাজকর্মের পরিধি বাড়ানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হবে। ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম আরও বলেন যে, গ্রুপের কাজের সাফল্যের জন্য ৩০০০ স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করা দরকার এবং তাঁদের সবাইকে অস্ত্র সজ্জিত করে যদি প্রতিরক্ষা বিভাগে কর্মরত কয়েকজন কর্মকর্তার দ্বারা পরিচালনা করা যায় তাহলে অবিলম্বে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদের বিতাড়িত করতে পারবেন। পূর্বোক্ত ১৬ নং অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়গুলোও এই সভায় আলোচনা করা হয়।

১৮. একই মাসে (ডিসেম্বর, ১৯৬৫) ৭ নং আসামি মফিজ উল্লাহর আহ্বানে তাঁর বাসা–৩২৯/২, কেরাঙ্গী ক্রিক, করাচিতে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নিম্নোক্তরা উপস্থিত ছিলেন:

১. সুলতান, আসামি নং-৪
২. মফিজ উল্লাহ, আসামি নং-৭
৩. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুহাম্মদ ফজলুল হক, আসামি নং-১১
৪. ওয়ারেন্ট অফিসার মুশারফ এইচ, শেখ, সাক্ষী নং-৫
৫. সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমেদ, সাক্ষী নং-৬ এবং আরও কয়েকজন যাঁদেরকে চিহ্নিত করা যায়নি।

এই সভায় ৭ নং আসামি মফিজ উল্লাহ এবং ৪ নং আসামি সুলতান বারবার বলছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ওই অঞ্চলকে আলাদা করে ফেলা এবং একটি সফল সামরিক বিদ্রোহ ছাড়া তা কিছুতেই সম্ভব নয়। সভায় ২ নং আসামি মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে কাজকর্মের অগ্রগতির পর্যালোচনা করে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

১৯. ১৯৬৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের করাচি থেকে বিদায় উপলক্ষে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম তাঁকে তিনটি টেবিল ডায়রি প্রদান করেন। ডায়রিগুলোর কয়েকটি পৃষ্ঠায় তিনি আমীর হোসেনকে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে তাঁর কিছু নির্দেশাবলী এবং সব সময় মনে রাখার মতো কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখে দিয়েছিলেন। ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম তাঁকে বলেছিলেন যে, কথাগুলো তিনি তাঁর নোট বুক থেকে ওখানে লিখে দিয়েছেন। এই নোট বুকটি যে ডায়রিগুলো দেখে আসামিদের ছদ্মনামগুলো সংযোজনী-২ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। তিনি ১ নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের চাহিদা অনুযায়ী তাঁকে পৌঁছে দেবার জন্য তাঁর কাছে (আমীর হোসেনের কাছে) একটি মানচিত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের দুটি তালিকাও দেন।

২নং আসামি মোয়াজ্জেম ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে বলেন এবং গ্রুপ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার অধিকার দেন। তিনি তাঁকে আরও বলেন যে, সংগৃহীত অর্থ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় খরচ চালিয়ে বাকি অর্থ যেন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে করাচিতে তাঁর কাছে পাঠানো হয়।

২০. ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন ঢাকায় পৌঁছে চট্টগ্রাম যান গ্রুপের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে। সেখানে ৩ নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৪নং আসামি সুলতান বিদ্রোহ সংগঠনে তাঁদের নির্ধারিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ৬ ফ্রেব্রুয়ারি তিনি (৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন) চট্টগ্রামস্থ মিসকা হোটেলে তাঁর কক্ষে একটি সভা আহ্বান করেন যেখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন:

১. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামি নং-৩
২. সুলতান, আসামি নং-৪
৩. মি. ভূপতি ভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী নামে খ্যাত) আসামি নং-১২
৪. মি. বিধান কৃষ্ণ সেন, আসামি নং-১৩
৫. সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, ই.পি.আর, আসামি নং-১৪
৬. ড. সাইদুর রহমান চৌধুরী, সাক্ষী নং-৭ এবং
৭. প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মুহাম্মদ শহীদুল হক (পি.এন.ভি.আর) সাক্ষী নং-৮।

১২ নং আসামি মানিক চৌধুরী এবং ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান সেখানে ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে বলেন যে, ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান গ্রুপের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন দেবার জন্য তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরা এই গ্রুপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী গ্রুপের কাজে সহায়তার জন্য ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা দেন।

২১. ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রুপের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম ৮নং আসামি সামাদকে ঢাকায় পাঠান। তাঁকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ায় তাঁর জীবনধারণের জন্য ঢাকায় আসা তাঁর একান্তই প্রয়োজন ছিল। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম একই সঙ্গে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে এই মর্মে একটি চিঠি লিখে দেন যে, যতদিন তাঁর (৮নং আসামি সামাদের) কোনো চাকরির ব্যবস্থা না হয় ততদিন যেন তিনি তাঁকে মাসে ৩০০ টাকা করে দেন। ১৯৬৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি লেখা এই চিঠিতে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম আরও উল্লেখ করেন যে, তিনি সবকিছুই পরশের সঙ্গে (পরশ ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের ছদ্মনাম) আলোচনা করেছেন এবং ভয় করার কোনো কিছু নেই।

২২. এই মাসে ৮ নং আসামি সামাদ চারজন নতুন সদস্য সংগ্রহ করেন। এরা হচ্ছেনঃ

১. মুজিবুর রহমান, কেরানী, ই.পি.আর.পি.সি আসামি নং-১৫
২. প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, আসামি নং-২৬
৩. প্রাক্তন নায়েক সুবেদার আশরাফ আলী খান, আসামি নং-৯ এবং
৪. প্রাক্তন লেন্স নায়েক এ.বি.এম. ইউসুফ, সাক্ষী নং-১০।

এই নতুন সদস্যদেরকে গ্রুপের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে দীক্ষিত করেন ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন।

২৩. ১৯৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ১ নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রাম সফর করেন এবং লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণ দেন। এই জনসভার পরে তিনি ৭ নং সাক্ষী ছৈয়দুর রহমানের বাসা–১২, রফিক উদ্দিন সিদ্দিকী বাইলেন, এনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম ঠিকানায় গ্রুপের একটি সভা ডাকেন। এই সভায় উপস্থিতরা হচ্ছেনঃ

১. শেখ মুজিবুর রহমান, আসামি নং-১
২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামি নং-৩
৩. মানিক চৌধুরী, আসামি নং ১২ এবং
৪. সাইদুর রহমান, সাক্ষী নং-৭।

এই সভায় ১ নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে গ্রুপের সভার জন্য একটি জায়গার ব্যবস্থা করতে বলেন।

২৪. ওই একই মাসে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬) ১ নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান গ্রুপের জন্য আর্থিক সহায়তা লাভের আরেকটি উৎস বের করেন। ১১নং সাক্ষী মুহাম্মদ মোহসিন যিনি ছিলেন ১০ নং আসামি রহুল কুদ্দুসের খালাত ভাই, ১ নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান গ্রুপের সাহায্যে অর্থ দান করার জন্য তাঁকে বলেন। এইরূপ কথাবার্তার পরে ১১নং সাক্ষী মোহসিন যখন ১ নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের বসার ঘর থেকে বের হয়ে আসছিলেন তখন ৪নং আসামি সুলতান তাঁকে বলেন যে, ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা মোতাবেক তিনি যেন 'মুরাদ'-এর (মুরাদ স্টুয়ার্ড মুজিবের ছদ্মনাম) কাছে টাকা দেন। ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ১১নং সাক্ষী মোহসিনের কাছ থেকে দুই কিস্তিতে ৭০০ টাকা গ্রহণ করেন।

২৫. ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের পরামর্শানুযায়ী ৬নং আসামি এ.এফ. রহমান তার স্ত্রীর মালিকানাধীন পেট্রল পাম্পে ৮ নং আসামি সামাদকে ম্যানেজার পদে চাকরি দেন। এই পেট্রল পাম্পের নাম 'গ্রীনভিউ পেট্রল পাম্প'। ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ৬নং আসামি এ.এফ. রহমানের মাধ্যমে গ্রুপের সদস্যদের লিয়াজোঁ রাখা হতো। ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তারা পেট্রল নেবার অজুহাতে ওই পাম্পে সব সময় যাতায়াত করতেন।

২৬. ১৯৬৬ সালের ৪ মার্চ ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে একটি চিঠি লিখে জানান যে, তিনি যেন ৪ নং সাক্ষী কে.জি-এর কাছে ঢাকাস্থ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থার কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার কথা বলেন। তিনি চিঠিতে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে আরও নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন চারদিকে আঙ্গিনাসহ একটি বাড়ি ভাড়া করে রাখেন যেখানে ভারত থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র রাখা হবে।

২৭. একই মাসে (মার্চের প্রথম দিকে, ১৯৬৬) ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন ঢাকার মহাখালীতে একটি সভা আহ্বান করেন, যেখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন:

১. সামাদ, আসামি নং-৮
২. মুজিব, কেরানী, আসামি নং-১৫
৩. এম.এ. রাজ্জাক, আসামি নং-১৬
৪. সার্জেন্ট জহুরুল হক, আসামি নং-১৭
৫. আশরাফ আলী, সাক্ষী নং-৯ এবং
৬. ইউসুফ, সাক্ষী নং-১০।

ওই সভায় উপস্থিত আরও কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

১. এল.এ.সি.এম.এ নওয়াজ

২. এল.এ.সি.জেড.এ চৌধুরী এবং

৩. সার্জেন্ট মিয়া, পি.এ.এফ।

(তদন্ত চলাকালীন সময়ে এই সকল ব্যক্তির পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি)

সভায় এ বিষয়ে খুবই জোর দেয়া হয়েছে যে, তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির একমাত্র পথ হচ্ছে সামরিক বিদ্রোহ। এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, ভারত সরকার তাঁদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করবে।

২৮. ১৯৬৬ সালের ১২ মার্চ ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান ষড়যন্ত্রকারীদের একটি সভা আহ্বান করেন। দিনটি ছিল শনিবার। ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের জন্য এই দিনটিই সবচেয়ে সুবিধাজনক। কারণ চাকরিস্থল থেকে ছুটি না নিয়েই তিনি সপ্তাহান্তে ঢাকায় গিয়ে সভায় যোগ দিতে পারেন প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ। মি. তাজউদ্দিন ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের একজন ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী। তিনি এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভালোভাবেই জানতেন। কিন্তু তিনি নিজে এই সভায় উপস্থিত থাকেননি। সভায় অংশগ্রহণকারীদের ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান একটি বাসস্ট্যান্ড থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পূর্বোক্ত বাড়িতে যান। এই সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ

১. শেখ মুজিবুর রহমান, আসামি নং-১

২. মোয়াজ্জেম, আসামি নং-২

৩. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামি নং-৩

৪. রহুল কুদ্দুস, আসামি নং-১০ এবং

৫. আমীর হোসেন, সাক্ষী নং-৩।

এই সভায় ২নং আসামি মোয়াজ্জেম আশা প্রকাশ করে বলেন যে, 'ডি' দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনগণ তাঁদের সঙ্গে থাকবে। সভায় অংশগ্রহণকারী সকলেই এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের প্রতিটি সদস্য যেদিন অস্ত্রসজ্জিত হবে এবং প্রশিক্ষণ পাবে সেদিনেই চূড়ান্ত সময় উপস্থিত হবে। এই সভায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র প্রদান সংক্রান্ত আলোচনা করার জন্য তাঁদের একটি প্রতিনিধিদল ভারতে পাঠানোর আয়োজন করা হয়।

২৯. এর অল্প কয়েক দিন পরে ৯ নং সাক্ষী আশরাফ আলী পূর্ব পাকিস্তানের একটি সেনানিবাসের একটি স্কেচ ৩নং আসামি আমীর হোসেনের কাছে দেন।

৩০. ১৯৬৬ সালের ১৯ মার্চ ২নং আসামি মোয়াজ্জেম চিঠির মারফত ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে জানান যে, তিনি যেন ৬নং আসামি এ.এফ. রহমানকে টেলিফোনে জানিয়ে দেন যে ২ নং আসামি মোয়াজ্জেমের ঢাকায় স্থানান্তরের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে আরও জানান যে, ৫নং আসামি নূর মোহাম্মদ কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকা যাচ্ছেন এবং তিনি তাঁকে (আমীর হোসেনকে) পশ্চিমাঞ্চলের কাজকর্ম সম্পর্কে

খবরাখবর জানাবেন। একই চিঠিতে তিনি ছদ্ম ভাষায় লিখেছেন যে, তিনি তাঁর চাকর শফির (আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি) মাধ্যমে তাঁর (আমীর হোসেনের) কাছে একটি ছোট্ট অস্ত্র পাঠাবেন এবং ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন যেন অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য আরও বেশি পরিমাণে অর্থের সংস্থানে মনোনিবেশ করেন।

৩১. এর প্রায় এক সপ্তাহ পরে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম, ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে আরেকটি চিঠি লিখে ৬ নং আসামি এ.এফ. রহমানের কাছ থেকে নগদ ৫,৫০০ টাকা গ্রহণ করেন। এ থেকে ৫০০০ টাকা ১৯৬৬ সালের ৩১ মার্চ ব্যাংক ড্রাফট করে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছে পাঠান এবং বাকি ৫০০ টাকা আমীর হোসেন তাঁর নিজের কাছে খরচের জন্য রাখেন।

৩২. ১৯৬৬ সালের ৩ এপ্রিল ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাড়িতে যান এবং ছোট ছোট অস্ত্র কেনার জন্য আরও টাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ৩ নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ২নং আসামি মোয়াজ্জেম কর্তৃক মনোনীত হয়েছিল ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে গ্রুপের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে। ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান তখন ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবের কাছে নগদ ৪০০০ টাকা দেন এবং ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব আবার ওই টাকা ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে দেন।

৩৩. এর পরের দিন ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে একটি চিঠি পান যাতে ছদ্ম ভাষায় আরও বেশি পরিমাণ টাকার জরুরি প্রয়োজনের কথা লেখা ছিল। ফলে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবকে ১০নং আসামি রুহুল কুদ্দুসের কাছে পাঠান আরও টাকার জন্য। ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ১০ নং আসামি রুহুল কুদ্দুসের কাছ থেকে ২০০০ টাকা সংগ্রহ করেন এবং তা ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে দেন। এরপর ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবকে ৬০০০ টাকা দিয়ে চট্টগ্রাম পাঠান এবং চট্টগ্রাম থেকে ওই টাকা ব্যবসায়ীদের জাহাজের মাধ্যমে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বলেন।

৩৪. প্রায় একই দিনে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন গ্রুপের জন্য ১০৭, দীননাথ সেন রোড, ঢাকা এই ঠিকানায় একটি বাড়িভাড়া করেন। এই বাড়িতে যে টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হয় তাঁর নম্বর ৮২৪৫২।

৩৫. ১৯৬৬ সালের ৬ এপ্রিল ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠির সঙ্গে কয়েক দিন আগে তাঁর কাছে ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে পাঠানো টাকার একনলেজমেন্ট রিসিটও ছিল। এই চিঠিতে তিনি ছদ্ম ভাষায় তাঁদের ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও অন্যান্য জিনিসপত্র প্রয়োজন তার কথা লেখেন এবং ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে একটি বাজেট তৈরি করতে বলেন। কিন্তু ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত না থাকার কারণে তিনি স্থির করলেন যে, যতিদন পর্যন্ত ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান বাজেট না চান

ততদিন তিনি কোনো বাজেট করবেন না।
৩৬. এরপরই ১৯৬৬ সালের ৮ এপ্রিল ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে আরেকটি চিঠি পান যাতে তুষারকে (৬নং আসামি এ.এফ. রহমানের ছদ্মনাম) জানাতে বলেন যে, তিনি ১৯৬৬ সালের ২২ এপ্রিল স্থানান্তরিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসছেন।
৩৭. ওই একই মাসে (এপ্রিল, ১৯৬৬) ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে ১২নং আসামি মানিক চৌধুরীকে ডেকে পাঠান। মানিক চৌধুরী সেখানে গিয়ে দেখেন যে, ৪নং আসামি সুলতান সেখানে আগেই উপস্থিত হয়েছে। ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান ১২ নং আসামি মানিক চৌধুরীকে ৪নং আসামি সুলতানের কাছে টাকা দিতে বলেন। এর তিন/চারদিন পরে ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী ৪১, রামজয় মহাজন লেন, চট্টগ্রাম ঠিকানায় তাঁর বাসায় ৪নং আসামি সুলতানকে ডেকে পাঠান এবং ষড়যন্ত্রকে সফল করার জন্য তাঁকে ১৫০০ টাকা দেন।
৩৮. একই মাসে (এপ্রিল, ১৯৬৬) ১১ নং সাক্ষী মোহসিনকে ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাসভবনে ডেকে পাঠান এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও গোপনীয়তার সঙ্গে বলেন যে, তিনি বর্তমান ও প্রাক্তন সৈনিকদের সহ একটি বিপ্লবী গ্রুপ গঠন করছেন, তিনি যেন তাঁর এ গ্রুপ পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা দেন।
৩৯. ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ কিংবা মে মাসের শুরুর দিকে কোনো এক সময় চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হবার পর ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের সঙ্গে ঢাকাস্থ গেন্ডারিয়ার ১০৭, দীননাথ সেন রোডে তাঁর বাসায় দেখা করেন। দুজনের মধ্যে সেখানে গ্রুপের পক্ষ থেকে টাকা পয়সা সংগ্রহ এবং গ্রুপের কাজকর্মের খরচ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতে গ্রুপের নামে যে বিরাট অঙ্কের অর্থ খরচের হিসাব দেখা যায় তা ২নং আসামি মোয়াজ্জেম সঠিক বলে মেনে নিতে পারেন না। ফলে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন এবং ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। ওই দিন সন্ধ্যায়ই ৩নং সাক্ষা আমীর হোসেন ড. খালেকের বাড়িতে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছে নগদ ৮০০০ টাকা, দুটি ক্যাশ বই এবং হিসাবের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য কাগজপত্র হস্তান্তর করেন। ড. খালেকের এই বাড়ির ঠিকানা: রোড নং-২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা এবং এই বাড়িতেই তখন ২নং আসামি মোয়াজ্জেম অবস্থান করছিলেন। ওই বাড়টির নাম 'আলেয়া'। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম তখন ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে তার দীননাথ সেনের বাসা ভাড়া মিটাবার জন্য ১৫০০ টাকা দেন। এরপর ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।
৪০. ১৯৬৬ সালের ১০ মে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামের নৌঘাঁটিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সেখানে নিয়োগ পাবার পরই তিনি গ্রুপের একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের 'আউটার হাউস'-এ। সাইদুর রহমান এই

বাড়িটি গ্রুপের সভাস্থল হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। এই 'আউটার হাউস' চট্টগ্রামের এনায়েত হোসেন মার্কেট এলাকায় অবস্থিত। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন:

১. মোয়াজ্জেম, আসামি নং-২
২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামি নং-৩
৩. সুলতান, আসামি নং-৪
৪. মানিক চৌধুরী, আসামি নং-১২
৫. মুহাম্মদ খুরশীদ, আসামি নং-১৮ এবং
৬. সাইদুর রহমান, সাক্ষী নং-৭।

১২নং আসামি মানিক চৌধুরী এবং ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান এই সভার কার্যবিবরণীর বহির্ভূত ছিলেন।

৪১. ১৯৬৬ সালের ৬ মে, ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যকলাপের দায়ে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনের অধীনে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পরই তাঁকে ডিটেনশন দেওয়া হয় এবং এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার কারণে তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে ডিটেনশন খাটার সময়ও অন্যান্য কতিপয় মামলায় তাঁর বিচার হয়।

৪২. ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বোক্ত গ্রেপ্তার বরণের পরে তিনি যে রাজনৈতিক দলের সদস্য সেই দল তাঁর বাসভবনে ১৯৬৬ সালের ২০ মে একটি জরুরি সভায় আয়োজন করে। ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী এই সভায় যোগদান করার জন্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যান। সভায় যোগদান করার পূর্বে ১২ নং আসামি মানিক চৌধুরী ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে নিয়ে ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মি. পি.এন. ওঝার কার্যালয়ে যান। মি. পি.এন. ওঝা সাইদুর রহমানের পরিচয় ইত্যাদি লিখে রাখেন এবং পরে আবার মাঝে মাঝে ওখানে যাবার জন্য বলেন। ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান সেখান থেকে বের হয়ে আসার পরও ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী অনেকক্ষণ সেখানে অবস্থান করেন।

৪৩. ১৯৬৬ সালের ২০ ও ২১ মের মধ্যবর্তী রাতে ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কতিপয় কার্যকলাপের দায়ে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার হন।

৪৪. ওই একই মাসে (মে, ১৯৬৬) ১২নং আসামি মানিক চৌধুরীর গ্রেপ্তারের পর ২নং আসামি মোয়াজ্জেম পূর্বোক্ত 'আউটার হাউস'-এর ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের আরও দুটি সভা আহ্বান করেন। এই সভা দুটোতে উপস্থিত ছিলেন:

১. মোয়াজ্জেম, আসামি নং-২
২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামি নং-৩
৩. সুলতান, আসামি নং-৪
৪. খুরশীদ, আসামি নং-১৮ এবং
৫. সাইদুর রহমান, সাক্ষী নং-৭।

এই সভাসমূহে গ্রুপের বিভিন্ন সদস্যের কাজ ভাগ করে দেওয়া হয় এবং কোন পদ্ধতিতে কাজ করলে সাফল্য নিশ্চিত সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর ও চট্টগ্রাম সেনানিবাস এবং চট্টগ্রাম নৌঘাঁটির ম্যাপ মূল্যায়ন করা হয় এবং আরও বেশি অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়।

৪৫. ওই একই মাসে (মে, ১৯৬৬) চট্টগ্রামে পি.আই.এ-র জেলা ম্যানেজার ১২নং সাক্ষী মি. এম.এম. রমিজ ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের সংস্পর্শে আসেন এবং ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

৪৬. ১২নং সাক্ষী রমিজের পরই ষড়যন্ত্রকারীদের দলে যোগ দেন ১৯নং আসামি মি. কে.এম. শামসুর রহমান সি.এস.পি। তিনি তখন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

৪৭. ওই একই মাসে (মে, ১৯৬৬) ৯নং সাক্ষী আশরাফ আলী এবং ৮ নং আসামি সামাদ ১০০/৩, আজিমপুর রোড, ঢাকা ঠিকানায় গ্রুপের খরচে 'সিটি' নামে একটি বাড়ি ভাড়া করেন। এরপর ওই দুই ব্যক্তি তাঁদের পূর্ববর্তী আবাসস্থল ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের বাড়ি থেকে এই নতুন ভাড়া নেওয়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হন।

৪৮. ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির তাঁর বাসায় ১২ নং সাক্ষী রমিজকে একটি ডায়রি, একটি নোট বুক এবং একটি ফোল্ডার দিয়ে সেগুলো পড়তে বলেন। এই সমস্ত প্রমাণপত্রে প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের রূপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা ছিল। এতে বলা হয় যে, সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে নেয়া হবে। শিল্প-কলকারখানা জাতীয়করণ করা হবে এবং মুদ্রার পরিবর্তে কুপন পদ্ধতি চালু করা হবে। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম তাঁকে নতুন রাষ্ট্রের সবুজ ও গোলাপী রংয়ের পতাকাও দেখিয়েছেন।

৪৯. এরপর ওই মাসেই (জুন, ১৯৬৬) ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ১২নং সাক্ষী রমিজের বাসায় পি.আই.এ হাউস-৬০, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম ঠিকানায় একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন:

১. মোয়াজ্জেম, আসামি নং-২
২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামি নং-৩
৩. খুরশীদ, আসামি নং-৩৪
৪. রিসালদার শামসুল হক, এ.সি, আসামি নং-২০
৫. হাবিলদার আজিজুল হক, এসএসজি, আসামি নং-২১ এবং
৬. রমিজ, সাক্ষী নং-১২।

এ সভার উদ্দেশ্য ছিল গ্রুপের প্রথম সারির কর্মীদের সঙ্গে রমিজকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ওপরে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা ছাড়াও ওই সভায় আরও অনেক কর্মী উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি।

৫০. ওই মাসেরই শেষ দিকে (জুন, ১৯৬৬) ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম তাঁর বাসা নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রামে একটি সভা আহ্বান করেন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন:

১. মোয়াজ্জেম, আসামি-২
২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামি নং-৩
৩. সুলতান, আসামি নং-৪
৪. সুবেদার রাজ্জাক, আসামি নং-১৪
৫. জহুরুল হক, আসামি নং-১৭
৬. খুরশীদ, আসামি নং-১৮
৭. রিসালদার শামসুল হক, আসামি নং-২০
৮. আশরাফ আলী, সাক্ষী নং-৯ এবং
৯. ইউসুফ, সাক্ষী নং-১০।

(এই সভায় আরও একজন উপস্থিত ছিলেন যাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল সার্জেন্ট শফি। কিন্তু তাঁর পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা যায়নি।

এই সভায় ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম সবাইকে তার ডায়রি এবং নোট বুক দেখান যাতে 'বাংলাদেশ' নামে প্রস্তাবিত নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান দিকগুলো লিপিবদ্ধ ছিল। প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকাও সেখানে দেখানো হয়।

৫১. ১৯৬৬ সালের জুন/জুলাই মাসে ৭ নং আসামি মফিজউল্লাহ বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যকার ষড়যন্ত্রকারীদের একটি সভা আহ্বান করেন। তার বাসা–কোয়ার্টার নং ২৫/৩, আবিসিনিয়া লাইন, করাচি ঠিকানায় আহূত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন:

১. নূর মোহাম্মদ, আসামি নং-৫
২. মফিজউল্লাহ, আসামি নং-৭
৩. এসএসসি মাহফুজুল বারী, আসামি নং-২২
৪. মোশারফ, সাক্ষী নং-৫
৫. করপোরাল জামাল উদ্দিন আহমেদ, সাক্ষী নং-১৪ এবং
৬. করপোরাল সিরাজুল ইসলাম, সাক্ষী নং-১৫

এই সভায়ও অন্যান্য কয়েকজন উপস্থিত ছিল যাঁদের পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি। এ সভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ৫ নং আসামি নূর মোহাম্মদের উপস্থিতি। কারণ তিনি এসেছিলেন নৌবাহিনী থেকে। ৭নং আসামি মফিজউল্লাহর অনুরোধে ঢাকা থেকে সদ্য প্রত্যাগত ১৪ নং সাক্ষী করপোরাল জামাল এই সভায় উপস্থিত সদস্যদের সামনে পূর্ব পাকিস্তানে ষড়যন্ত্রকারীদের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন এবং উল্লেখ করেন যে, ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তা তাঁদের ভূমিকা আরও সক্রিয় করে তুলেছেন। ১৫ নং সাক্ষী সিরাজ তখন ছুটিতে যাচ্ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে। ৭নং আসামি মফিজউল্লাহ তাঁকে বলেন যে, তিনি যেন পূর্ব

পাকিস্তানে অবস্থানরত ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য প্রথমে ঢাকাস্থ পিএএফ স্টেশনে ১১ নং আসামি ফজলুল হক এবং ২৩ নং আসামি সার্জেন্ট শামসুল হক পিএএফ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

৫২. ১৯৬৬ সালের জুন/জুলাই মাসের কোনো এক সময় ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম এবং ১২ নং সাক্ষী রমিজ কুমিল্লা সফর করার আয়োজন করেন। তাই ৩ নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবকে প্রায়ই কুমিল্লা পাঠানো হয় এই খবরটি মেজর (তৎকালীন ক্যাপটেন) ২৪ নং আসামি শামসুল আলম এএমসি-কে পৌঁছাবার জন্য। ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম এবং ১২ নং সাক্ষী রমিজ মোয়াজ্জেমের গাড়িতে, হিলম্যান আইএম পি নং ৯৫৯১, করে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। তারা ২৪ নং আসামি শামসুল আলমের কুমিল্লা শহরস্থ বাসভবনে যান এবং সেখানে বালুচ রেজিমেন্টের ক্যাপটেন মোহাম্মদ আবদুল মোতালিবের সাক্ষাৎ পান। ২৪ নং আসামি শামসুল আলম কুমিল্লার সেক্টর কমাণ্ডারের দায়িত্ব পালনের কথা বলেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছিলেন যে, পরিকল্পনা কার্যকরী করার সময় সামরিক ইউনিটসমূহের অস্ত্র ভাণ্ডারগুলো দখল করে ফেলে তাঁদের যুদ্ধ করার সামর্থকে অচল করে দিতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি দক্ষ জনশক্তির অভাব অনুভব করেন। তিনি শামসুল আলমকে চাকরিরত ও প্রাক্তন সৈনিকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে বলেন। ২৫ নং আসামি মোতালিব বলেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর একজন সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত ছিলেন। পরে তাঁদের পাঁচজনকে একটি গাড়িতে করে কুমিল্লা সেনানিবাসে ২৬ নং আসামি মোহাম্মদ শওকত আলী মিয়া এওসি-এর বাসায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে তাঁদের সঙ্গে ৩ নং আসামি স্টয়ার্ড মুজিবও যোগ দেন। ২৬ নং আসামি শওকত ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে জানান যে, তিনি ঢাকাতে ১৩ নং সাক্ষী ক্যাপটেন মোহাম্মদ আবদুল আলীম ভূঁইয়া এওসি এবং ২৭ নং আসামি ক্যাপটেন খন্দকার নাজমুল হুদা এওসি-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং ওই দুজন অফিসারই সংগঠন সম্পর্কে আরও বেশি করে জানতে চেয়েছেন। এমতাবস্থায় ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম কথা দেন যে, অবিলম্বে ঢাকাতে একটি সভা আহ্বান করা হবে।

৫৩. একই মাসে (জুলাই ১৯৬৬) ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের সঙ্গে চট্টগ্রামের এক বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের হঠাৎ করে দেখা হয়ে যায়। সেখানে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের কাছে প্রকাশ করেন যে, ১২ নং আসামি মানিক চৌধুরী গ্রেপ্তারের আগেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের ফার্স্ট সেক্রেটারির কাছে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা পৌঁছে দেবার কথা। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম এরপর ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি মি.পি.এন ওঝাকে চিনেন কিনা। ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান এ প্রশ্নের হ্যাঁ-সূচক জবাব দেন। ফলে ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম তাকে অনুরোধ করেন, মি. পি এন. ওঝার কাছে অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা পৌঁছে দেবার জন্য। ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলে ওই কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

৫৪. অল্প কয়েকদিন পরে একদিন সকালবেলা মিমি.পিএন ওঝা ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের চট্টগ্রামের বাসভবনে এসে হাজির হন এবং অনুযোগের ভাষায় তাঁকে বলেন যে, তাঁর অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি (৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান) তাঁর ঢাকাস্থ অফিসে দেখা করেন নি। তখন সেইখানে বসেই ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান মি. পি.এ ওঝাকে অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা সংক্রান্ত ২ নং আসামি মোয়াজ্জেমের দেওয়া সংবাদটি জ্ঞাপন করান।

৫৫. পরের দিন মি. পিএন ওঝার নির্দেশমত ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে পূর্বোক্ত অস্ত্রশস্ত্রের তালিকাটি সংগ্রহ করেন এবং তা চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে মি. পিএন ওঝার কাছে হস্তান্তর করেন। সেই সময় মি. পি.এন ওঝা ঢাকাতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে একটি কোড শব্দ প্রদান করেন এবং ২ নং আসামি মোয়াজ্জেমকে ঢাকায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলার জন্য ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে বলেন।

৫৬. এর কয়েকদিন পরে ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের মাধ্যমে ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের বাসভবনে মি.পি.এন ওঝার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার আয়োজন করেন। সেখানে পিএন ওঝা ২ নং আসামি মোয়াজ্জেমকে আশ্বাস দেন যে, তিনি তাঁর (২নং আসামি মোয়াজ্জেমের) প্রদত্ত অস্ত্রের তালিকা ভারত সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠাবেন এবং তিনি সাময়িকভাবে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে অর্থ সরবরাহ করতে অপারগ বলে জানান।

৫৭. ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের কোনো এক সময় ২৬ নং আসামি শওকত ঢাকা সফর করেন এবং ১৩ নং সাক্ষী আলীমের সঙ্গে অর্ডিন্যান্স মেসে অবস্থান করেন। ওই সন্ধ্যায়ই ২নং আসামি মোয়াজ্জেম পূর্বোক্ত মেসে ১৩ নং সাক্ষী আলীম এবং ২৬ নং আসামি শওকতের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ঘোষণা করেন যে, আগামীকাল সকালে ১২ নং সাক্ষী রমিজের মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের বাসায় তিনি একটি সভা আহ্বান করেছেন। এই সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন:

১. মোয়াজ্জেম, আসামি নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামি নং-৩

৩. সুলতান, আসামি নং-৪

৪. নাজমুল হুদা, আসামি নং-২৭

৫. শওকত, আসামি নং-২৬ এবং

৬. আলীম, সাক্ষী নং-১৩।

এই সভায় ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্রকারীদেরকে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা সম্বলিত একটি ডায়েরি এবং একটি নোটবুক দেখান। ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম এতে দাবি করেন যে, তিনি ষড়যন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য ইতিমধ্যেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। সভায় তিনি এ আশা ব্যক্ত করেন যে, উপস্থিত সদস্যরা যশোর এবং রংপুর অঞ্চলে কাজ পরিচালনার জন্য গ্রুপে আরও কিছু সামরিক

অফিসার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করবেন। তিনি দাবি করেন যে, চট্টগ্রামের কাজ সমাধা করার জন্য ২৮ নং আসামি ক্যাপ্টেন এ.এন.এম নুরুজ্জামান এবং তাঁর নিজস্ব নৌবাহিনী যথেষ্ট। ২৫ নং আসামি মোতালেব এবং ২৪ নং আসামি শামসুল আলম কুমিল্লায় যেভাবে কাজ করেছেন ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম এই সভায় তার প্রশংসা করেন।

৫৮. ওই একই মাসে (আগস্ট, ১৯৬৬) ২৭ নং আসামি নাজমুল হুদা, ২৪ নং আসামি শামসুল আলম, ১৩ নং সাক্ষী আলীম এবং ২৬ নং আসামি শওকত দাউদকান্দি রেস্ট হাউসে মিলিত হন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, ষড়যন্ত্রকারীদের নেতৃত্ব কয়েকজন প্রবীণ (সিনিয়র) সামরিক অফিসারের ওপর অর্পিত হওয়া উচিত। তারা স্থির করলেন যে, তাঁরা ২ নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে গ্রুপের সংগঠনের সংখ্যা ও পরিচয় জেনে নিবেন।

৫৯. ওই একই মাসে (আগস্ট, ১৯৬৬) ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম গ্রুপের তহবিল থেকে গ্রুপের কাজের সুবিধার্থে একটি গাড়ি কিনতে সাহায্য করার জন্য ১২ নং সাক্ষী রমিজকে ৫০০০ টাকা প্রদান করেন।

৬০. ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক সময় ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ১২ নং সাক্ষী রমিজের মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের ১২-৮/৮ নং ফ্লাটে একটি সভা আহ্বান করেন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন:

১. মোয়াজ্জেম, আসামি নং-২
২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামি নং-৩
৩. সুলতান, আসামি নং-৮
৪. শামসুর রহমান, আসামি নং-২৯
৫. শামসুল আলম, আসামি নং -২৪
৬. মোতালেব, আসামি নং-২৫
৭. নাজমুল হুদা, আসামি নং-২৭
৮. রমিজ, সাক্ষী নং-১২ এবং
৯. আলীম, সাক্ষী নং-১৩।

এই সভায় ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র ও গেলাবারুদ সরবরাহ করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তিনি ২৫ নং আসামি মোতালেবকে বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে বলেন যে, প্রাক্তন সৈনিকদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে সংগঠিত করতে হবে এবং তাঁদেরকে নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম বিভিন্ন সেক্টরের সেক্টর কমাণ্ডারদের আর্থিক প্রয়োজনের বিষয়টি নোট করে নেন। ২৭ নং আসামি নাজমুল হুদা, ২৪ নং আসামি শামসুল আলম এবং ২৩ নং সাক্ষী আলীম সভার কার্যবিবরণীতে হস্তক্ষেপ করে প্রস্তাব করেন যে, নেতৃত্ব কয়েকজন প্রবীণ (সিনিয়র) সামরিক অফিসারের ওপর ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। ১৯ নং আসামি শামসুর রহমান এ বিষয়ক আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এমএজি ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলেন। ২ নং আসামি

মোয়াজ্জেম ঘোষণা করেন যে, স্বাধীনতা লাভের পরই দেশে সামরিক আইন জারি করা হবে এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১২ নং সাক্ষী রমিজ মত প্রকাশ করে বলেন যে, সামরিক অভ্যুত্থান চলাকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা হবে পিআইএ এবং পিএএফ এর বিমান এবং রেডিওর মাধ্যমে। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন এই মত ব্যক্ত করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে যে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানি রয়েছে তাঁদেরকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানের সময় যে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানি বন্দী হবে তাঁদেরকে বিনিময় করা হবে।

৬১. ওই একই মাসে (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬) ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান দ্বিতীয়বারের মত ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মি. পিএন ওঝার মধ্যে পূর্বোক্ত বাড়িতে বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। মি. পিএন. ওঝা ২ নং আসামি মোয়াজ্জেমকে বলেন যে, ভারত সরকার ষড়যন্ত্রকারীদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে এবং তিনি ২ নং আসামি মোয়াজ্জেমকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের তারিখ যথাসময়ে জানানো হবে বলে আশ্বাস দেন।

৬২. ১৯৬৬ সালের অক্টোবরে ১৯ নং আসামি শামসুর রহমানের পরামর্শে গ্রুপের প্রতি প্রবীণ সামরিক অফিসারদের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামে তাঁর বাসা 'এ্যাংকরেজ;-এ এক সভা আহ্বান করেন। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এমএ জি ওসমানী এই সভায় আমন্ত্রিত ছিলেন। নিম্মোক্ত ব্যক্তিবর্গ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন:

১. মোয়াজ্জেম, আসামি নং ২

২. শামসুর রহমান, আসামি নং ১৯

৩. রমিজ, সাক্ষী নং ১২।

সভায় ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্রের প্রধান প্রধান দিক উল্লেখ করেন। এখানে তিনি একথাও প্রকাশ করেন যে, ভারতের সঙ্গে তিনি একটি চুক্তিতে উপনীত হয়েছেন। (ধ মবহঃষবসবহ'ং ধমৎববসবহঃ')

যার শর্ত অনুযায়ী তাঁরা স্বাধীনতা ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সীমা অতিক্রম করবে না এবং পশ্চিম পাকিস্তানের যে কোনো বাধা বা হস্তক্ষেপকে তারা সমুদ্র ও আকাশপথে বাধা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বিদ্রোহকে সমর্থন করবে। কর্নেল (অব.) এমএজি ওসমানী কথাবার্তাগুলো কেবল শুনেছিলেনই।

৬৩. ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম এবং মি. পিএন ওঝার মধ্যে ঢাকাস্থ ধানমন্ডির পূর্বোক্ত বাড়িতে তৃতীয়বারের মত একটি সভার আয়োজন করেন। এই সভায় মি. পি.এন ওঝা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, ভারতের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের কারণে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করার তারিখ নির্ধারণ করা যায়নি। মি. ওঝা ষড়যন্ত্রকারীদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য ভারতের সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার উপদেশ দেন।

৬৪. ওই একই মাসে (অক্টোবর, ১৯৬৬) ৩ নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ১১ নং সাক্ষী মোহসিনের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য বলেন। ১১ নং সাক্ষী মোহসিন তাকে ২০০০ টাকা দেন। ৩ নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব বলেন যে, অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্য তিন/চার লাখ টাকা প্রয়োজন। এতে ১১ নং সাক্ষী ভয় পেয়ে ক্ষেপে যান এবং ৩ নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবকে তক্ষুণি তাঁর বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলেন।

৬৫. ১৯৬৭ সালের ২৩ জানুয়ারি কিংবা তার দু'একদিন আগে-পরে ১২ নং আসামি মানিক চৌধুরী ডিটেকশন আদেশ থেকে মুক্তি পান।

৬৬. ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৭ নং আসামি মফিজউল্লাহ ঢাকা আসেন এবং গ্রুপভুক্ত বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাস্থ আওলাদ হোসেন মার্কেটে ১৬ নং আসামি এমএ রাজ্জাকের দোকানে। নিম্মোক্তরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ

১. মফিজউল্লাহ, আসামি নং-৭

২. এমএ রাজ্জাক, আসামি নং-১৬

৩. সার্জেন্ট শামসুল হক, আসামি নং ২৩ এবং

৪. সিরাজ, সাক্ষী নং ১৫।

এই সভায় আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন যাঁদের পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি। ষড়যন্ত্রকারীদের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এই সভার আলোচ্য বিষয়।

৬৭. ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ২ নং আসামি মোয়াজ্জেমের চাকরি পূর্ব পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্তৃপক্ষের অধীনে স্থানান্তর করা হয় এবং তাঁকে বরিশাল পোস্টিং দেওয়া হয়।

৬৮. ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ১৫ নং সাক্ষী সিরাজ এবং ৭ নং আসামি মফিজউল্লাহ উভয়েই করাচিতে ফিরে আসেন।

৬৯. ওই একই মাসে (মার্চ, ১৯৬৭) ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম ১২ নং আসামি মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে মি. পিএন ওঝার ঢাকাস্থ বাসভবনে তাঁর সঙ্গে চতুর্থ বৈঠকের আয়োজন করেন। তিনি তাঁদেরকে জানান যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের তারিখ নির্ধারিত হবে না। মি. ওঝা তাঁদের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। সভা শেষে পি.এন ওঝা তাঁদেরকে নগদ ৫০০০ টাকা দেন।

৭০. ১৯৬৭ সালের ৩১ মার্চ ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম, ১২ নং আসামি মানিক চৌধুরী ও ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে পিএন ওঝার সঙ্গে তাঁর ঢাকাস্থ বাসভবনে পঞ্চমবারের মত সাক্ষাৎ করেন। এই সভায় মি. পিএন ওঝা বলেন যে, ভারত সরকার মনে করে যে, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করার আগে ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় কর্মকর্তার একটি বৈঠক হওয়া প্রয়োজন। মি. পিএন ওঝা ওই বৈঠকের স্থান হিসেবে পাকিস্তান সীমান্ত থেকে অনতিদূরে ভারতের আগরতলার কথা বলেন। তিনি ২ নং আসামি মোয়াজ্জেমকে ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের তিনজন প্রতিনিধির নাম প্রস্তাব করতে বলেন। এই সভার পর মি. ওঝা তাঁদেরকে ১০,০০০ টাকা দেন।

৭১. ওই একই মাসে (মার্চ, ১৯৬৭) ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম, ৩ নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ১২ নং সাক্ষী রমিজ ঢাকার মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের ১২ নং সাক্ষী রমিজের বাসভবনে মিলিত হন। সেখানে ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম ১২ নং সাক্ষী রমিজকে বলেন যে, তাঁর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ টাকা রয়েছে যা পিএন ওঝার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, তাঁরা ১০ নং আসামি রুহুল কুদ্দুস এবং ৬ নং আসামি এএফ রহমানের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছেন। এই সভায় ষড়যন্ত্রকারীরা সভা অনুষ্ঠান এবং সার্বক্ষণিক কর্মীদের থাকার জন্য আরেকটি বাড়ি ভাড়া করার কথা স্থির করেন। ষড়যন্ত্রকারীদের কার্যকলাপ গোপন রাখার জন্য একটি লোক দেখানো ব্যবসা খোলার বিষয়ও এখানে স্থির করা হয়। ১২ নং সাক্ষী রমিজ এ ধরনের একটি ব্যবসা চালু করতে সাহায্য করার জন্য ১৬ নং আসামি, তাঁর বন্ধু, আবু শামস লুৎফুল হুদার নাম প্রস্তাব করেন।

৭২. ওই একই মাসে (মার্চ, ১৯৬৭) আরেকটি গ্রুপ সভা অনুষ্ঠিত হয় পূর্বোক্ত ফ্লাটেই। নিম্নোক্তরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ

১. মোয়াজ্জেম, আসামি নং ২
২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামি নং ৩
৩. সামাদ, আসামি নং ৮
৪. শামসুর রহমান, আসামি নং ১৯
৫. মোতালেব, আসামি নং ২৫
৬. রমিজ, সাক্ষী নং ১২ এবং
৭. লুৎফুল হুদা, সাক্ষী নং ১৬।

এই সভায় একটি ট্রান্সমিটার সেট সংগ্রহ করা এবং ট্রান্সমিটার অপারেটরদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়। এখানে আরও একটি বিষয় স্থির করা হয় যে, গ্রুপের কার্যকলাপ ঢাকা দেবার জন্য যে ব্যবসা চালু করা হচ্ছে সে বাবদ ১২ নং সাক্ষী রমিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি বড় অঙ্কের টাকা আলাদা করে রাখা হবে।

৭৩. অল্প কয়েকদিন পরেই (মার্চ, ১৯৬৭) ১২ নং সাক্ষী রমিজ ২ নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে ৩ নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবের মাধ্যমে ২৫,০০০ টাকা গ্রহণ করেন। এই টাকা থেকে ১২ নং সাক্ষী রমিজ ব্যবসায়ে খাটানোর জন্য ১৬ নং সাক্ষী লুৎফুল হুদাকে ৫০০০ টাকা দেন। বাকি ২০,০০০ টাকার মধ্যে ১৮,৬৮৯ টাকা ১২ নং সাক্ষী রমিজ ষড়যন্ত্রকারীদের বিবিধ পর্যায়ের কাজে খরচ হিসেবে দেখান।

৭৪. ১৯৬৭ সালের ১৪ মার্চ ৩ নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব সার্বক্ষণিকভাবে ষড়যন্ত্রমূলক কাজে নিয়োজিত থাকার দায়ে পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে পরিত্যক্ত হন।

৭৫. এর প্রায় পনের দিন পরে (মার্চ, ১৯৬৭) ১৯ নং আসামি শামসুর রহমান ফরিদপুরের ডেপুটি কমিশনার মি. সিদ্দিকুর রহমানের কাছে তাঁর বন্ধু মি. মুজিবুর রহমানকে সাহায্য করার জন্য একটি চিঠি লেখেন। ৩ নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ১৬ নং সাক্ষী লুৎফুল

হুদাসহ ফরিদপুরে যান এবং মি. সিদ্দিকুর রহমানের কাছে ওই চিঠি হস্তান্তর করেন।

৭৬. ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকাস্থ গ্রিন স্কোয়ারের ১৩ নং বাড়িটি গ্রুপের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়। ১৯৬৭ সালের ১ মে এই বাড়িতে ওঠা হয়। নিম্নোক্ত সার্বক্ষণিক কর্মিগণ সেই বাড়িতে থাকতেন:

১. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামি নং-৩
২. সামাদ, আসামি নং-৮
৩. দলিল উদ্দিন, আসামি নং-৯
৪. প্রাক্তন সুবেদার জালাল উদ্দিন আহমেদ, সাক্ষী নং-১৭ এবং
৫. মোহাম্মদ গোলাম আহমেদ, সাক্ষী নং-১৮।

২নং আসামি মোয়াজ্জেম তার হিলম্যান গাড়িটিও গ্রুপের কাজে ব্যবহারের জন্য ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবের নিয়ন্ত্রণাধীনে ওই বাড়িতে রাখেন। এই গাড়ির নম্বর 'হিলম্যান নং-ইবিএ-৯৫৯১।

৭৭. ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসের কোনো এক সময় ৭ নং আসামি মফিজউল্লাহ ১৯ নং সাক্ষী করপোরাল হাই একেএমএ-এর সঙ্গে তাঁর কোয়ার্টার ডমেস্টিক এরিয়া পিএএফ. কোরাঙ্গী ক্রিক করাচিতে সাক্ষাৎ করেন। ৭ নং আসামি মফিজউল্লাহ সেখানে ডেকোরেশন পিস হিসেবে একটি নকল হ্যান্ড গ্রেনেড দেখতে পান এবং ১৯ নং সাক্ষী হাই সাহেবের কাছ থেকে সেটি নিয়ে আসেন।

৭৮. ১৯৬৭ সালের মে মাসে ৭ নং আসামি মফিজউল্লাহ ২৯ নং আসামি সার্জেন্ট জলিলের বাসায় একটি সভা আহ্বান করেন। এই বাসার ঠিকানা হচ্ছে–১৪/৪ জি, ক্লেটন কোয়ার্টার্স, করাচি। নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন:

১. মফিজউল্লাহ, আসামি নং-৭
২. বারী, আসামি নং-২২
৩. সার্জেন্ট সামসুল হক, আসামি নং-২৩
৪. সার্জেন্ট আবদুল জলিল, আসামি নং-২৯
৫. মোহাম্মদ মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, আসামি নং-৩০
৬. শামসুদ্দিন, সাক্ষী নং-৬
৭. করপোরাল জামাল, সাক্ষী নং-১৪ এবং
৮. সিরাজ, সাক্ষী নং-১৫

ওই সভায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত এবং সেখানে গ্রুপের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ২৩ নং আসামি সার্জেন্ট শামসুল হক উপস্থিত সবাইকে জানান যে, ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও আর্থিক সাহায্য দেওয়ার বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে রাজি করাতে সফল হয়েছেন। তিনি ওই সভায় উপস্থিত ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলেন, যে 'ডি' দিবসে পূর্ব পাকিস্ত ানের সমগ্র জনগণ সামরিক অভ্যুত্থানের পক্ষে থাকবে। সভা শেষে ৭ নং আসামি

মফিজউল্লাহ তাঁর পকেট থেকে একটি নকল হ্যান্ড গ্রেনেড বের করেন এবং সবার সামনে সেটি নিক্ষেপ করার নিয়ম পদ্ধতি প্রদর্শন করেন। তিনি গ্রুপের সকল সদস্যকেও অনুরূপভাবে হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ অনুশীলন করতে বলেন। পরে এটি ২৯ নং আসামি জলিলের বাসায় রেখে যান। তিনি বলেন যে, তিনি হ্যান্ড গ্রেনেডটি যেভাবে সংগ্রহ করেছেন সেভাবে আরও ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে সেগুলোর ব্যবহারের প্রশিক্ষণ শুরু করবেন।

৭৯. ১৯৬৭ সালের মে মাসের কোনো এক সময় ৭ নং আসামি মফিজউল্লাহ ১৫ নং সাক্ষী সিরাজের কাছে প্রকাশ করেন যে, ৬ নং সাক্ষী শামসুদ্দিনও তাঁদের গ্রুপের একজন সদস্য ছিল এবং বিমান বাহিনীর কর্মকর্তারা ৩১ নং আসামি লেফটেন্যান্ট এসএম এম রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। ৭ নং আসামি মফিজউল্লাহ করাচিস্থ কারসায অফিসার্স কোয়ার্টার্সে ৩১ নং আসামি লেফটেন্যান্ট রহমানের বাসায় অনুষ্ঠিতব্য সভায় ৬নং সাক্ষী সামসুদ্দিন এবং ৩০ নং আসামি মাহবুব উদ্দিনকে হাজির করানোর জন্য ১৫ নং সাক্ষী সিরাজকে নির্দেশ দেন।

৮০. একই মাসের (মে, ১৯৬৭) নির্ধারিত দিনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ৩১ নং আসামি লেফটেন্যান্ট রহমানের বাসায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ

১. মফিজউল্লাহ, আসামি নং-৭
২. লে. রহমান, আসামি নং-৩১
৩. মাহবুব উদ্দিন, আসামি নং-৩০
৪. সামসুদ্দিন, সাক্ষী নং-৬ এবং
৫. সিরাজ, সাক্ষী নং-১৫

এ ছাড়া, কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন যাঁদের পরিচয় উদঘাটন করা যায়নি। সভায় গ্রুপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা হবার পরও ৩১ নং আসামি লে. রহমান উপস্থিতদের উদ্দেশে বলেন যে, আরও বেশিসংখ্যক বাঙালি চাকরিরত কিংবা প্রাক্তন সৈনিককে গ্রুপে সংগঠিত করতে হবে এবং তাঁদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করার পথ ও পদ্ধতি বের করতে হবে।

১৮. ১৯৬৭ সালের জুন মাসের শেষদিকে কোনো একদিন ২নং আসামি মোয়াজ্জেম গ্রুপের জন্য নতুন সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৭ নং সাক্ষী জালাল এবং ৮ নং আসামি সামাদকে এক সফরে পাঠান। এই সূত্রে ওই দুই ব্যক্তি কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং যশোর সফর করেন। তাঁরা খুলনায় প্রাক্তন সুবেদার ৩২ নং আসামি একেএম তাজুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সে অঞ্চলে গ্রুপের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। ৩২ নং আসামি তাজুল ইসলাম তাঁর সংগৃহীত ষড়যন্ত্রকারীদেরকে ওই সফরকারী দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

৮১. ১৯৬৭ সালের জুন মাসের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সপ্তাহে ৩১ নং আসামি লে. রহমান পূর্বোক্ত গ্রুপের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, তাঁর বাসা–বাংলো নং-ই/১৬, অফিসার্স কোয়ার্টার, কারসায, করাচিতে এক সভা অনুষ্ঠান করেন। নিম্নোক্ত ষড়যন্ত্রকারীরা ওই

সভায় উপস্থিত ছিলেন:

১. মফিজউল্লাহ, আসামি নং ৭

২. বারী, আসামি নং ২২

৩. মাহবুব উদ্দিন, আসামি নং ৩০

৪. লে. রহমান, আসামি নং ৩১

৫. সার্জেন্ট সামসুদ্দিন, সাক্ষী নং ৬ এবং

৬. সিরাজ, সাক্ষী নং ১৫।

আরও অল্প কয়েকজন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন যাঁদেরকে চিহ্নিত করা যায়নি। সভায় ৩১ নং আসামি লে. রহমান অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে বলেন যে, ২নং আসামি মোয়াজ্জেম গ্রুপে নতুন অন্তর্ভুক্তি বন্ধ রাখার নির্দেশ পাঠিয়েছেন। ৩০ নং আসামী মাহবুব উদ্দিন এবং ২২ নং আসামি বারীর পরামর্শক্রমে ৩১ নং আসামি লে. রহমান ৬ নং সাক্ষী সামসুদ্দিনকে (তিনি তখন ঢাকায় স্থানান্তর হয়ে যাচ্ছিলেন) নির্দেশ দেন যে, তিনি যেনো ঢাকায় গিয়ে ২ নং আসামি মোয়াজ্জেমের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং জেনে নেন যে তিনি (২নং আসামি মোয়াজ্জেম) ঢাকাতে তাঁর (৩১ নং আসামি লে. রহমানের) উপস্থিতি কামনা করে কি না। যদি তা করেন তাহলে ৬ নং সাক্ষী সামসুদ্দিন যেন তাঁকে এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম পাঠান যে, 'বজলু গুরুতর অসুস্থ, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে।' ২২ নং আসামি বারী এবং ৩০ নং আসামি মাহবুব উদ্দিনের অনুসরণে গ্রুপের সদস্যরা সাময়িকভাবে করাচিস্থ গ্রুপের জন্য কেবল তহবিল সংগ্রহ করবে বলেও সভায় স্থির করা হয়।

৮৩. ১৯৬৭ সালের জুন মাসে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ১৩, গ্রিন স্কোয়ার, ঢাকাতে কয়েকটি সভা আহ্বান করেন। এই সভাগুলোতে নিম্নোক্তরা উপস্থিত ছিলেন:

১. মোয়াজ্জেম, আসামি নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামি নং-৩

৩. সুলতান, আসামি নং-৪

৪. দলিল উদ্দিন, আসামি নং-৯

৫. রিসালদার শামসুল হক, আসামি নং-২০

৬. এম. আলী রেজা, আসামি নং-৩৩

৭. ক্যাপ্টেন খুরশীদ উদ্দিন আহমদ, এএমসি আসামি নং-৩৪

৮. রমিজ, সাক্ষী নং-১২

৯. জালাল উদ্দিন, সাক্ষী নং-১৯ এবং

১০. আনোয়ার হোসাইন, সাক্ষী নং-২০।

এই সভাগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে যাবার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা। এই সূত্রে ১৯ নং আসামি শামসুর রহমানকে জার্কাতায় এবং ২৫ নং আসামি মোতালেবকে পেশওয়ারে টেলিগ্রাম করা হয়। কিন্তু তাঁরা আসেননি।

৩৪নং আসামি খুরশীদ সদ্য করাচি থেকে ঢাকা পৌঁছেছেন। তিনি ভারতের আগরতলায় প্রতিনিধি পাঠানোর পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। পূর্বোক্ত সভাসমূহে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. সীমান্তের ওপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আসন্ন বৈঠকে ৩৩ নং আসামি রেজা এবং তাঁর সঙ্গে ৩ নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব প্রতিনিধিত্ব করবেন।

খ. প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিবেন ৩৩ নং আসামি রেজা।

গ. ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের সদস্যদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের যে তালিকা দেখিয়ে ৩৩ নং আসামি রেজার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে সেই তালিকাই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

ঘ. আগরতলার সভায় অস্ত্র চুক্তি চূড়ান্ত করা হবে এবং বর্ধিত আর্থিক সাহায্যের কথা বলা হবে।

ঙ. প্রতিনিধিরা ফেনী সীমান্ত দিয়ে গোপনে আগরতলা যাবেন, এবং

চ. ১৭ নং আসামি জালাল উদ্দিন প্রতিনিধিদের সীমান্ত অতিক্রমের বিষয়টি তদারক করবেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর প্রভাব খাটাবেন, এমনকি প্রয়োজন হলে সীমান্তে কর্তব্যরত ইপিআর কর্মকর্তাদেরকে ঘুষ দেবেন যাতে প্রতিনিধিদের সীমান্ত অতিক্রম নিশ্চিত ও নিরাপদ করা যায়।

৮৪. ১৯৬৭ সালের জুন মাসের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ সপ্তাহে ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম ১২ নং আসামি মানিক চৌধুরীকে ঢাকায় ডেকে এনে তাঁর হাতে একটি খাম দিয়ে সেটি মি. পিএন ওঝাকে পৌঁছাতে বলেন। ১২ নং আসামি মানিক চৌধুরী ওইদিন সন্ধ্যায়ই তা করেন। এই খামের মধ্যে ছিল কতগুলো কোড শব্দ, প্রতিনিধিরা যে স্থান থেকে সীমান্ত অতিক্রম করবেন তার নাম এবং উপরোল্লেখিত প্রতিনিধিদের নাম।

৮৫. পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৭ সালের ১১ জুলাই কথা অনুযায়ী–৩৩ নং আসামি রেজা এবং ৩ নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবসহ নিম্নোক্ত ষড়যন্ত্রকারীরা ফেনী পৌঁছেন (জেলা নোয়াখালী)। প্রতিনিধিরা যাতে নিরাপদে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের আগরতলা পৌঁছতে পারেন সেজন্যই অন্যরা তাঁদের সঙ্গে সীমান্ত পর্যন্ত যান:

১. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামি নং ৩

২. সামাদ, আসামি নং ৮

৩. দলিল উদ্দিন, আসামি নং ৯

৪. রেজা, আসামি নং ৩৩ এবং

৫. জালাল, সাক্ষী নং ১৭।

উপরোল্লেখিত ষড়যন্ত্রকারীরা ফেনী রেল স্টেশনের কাছে হোটেল ডিনোফায় অবস্থান করেন। ওই দিন সন্ধ্যায়ই ৩ নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব টেলিফোন করে ১২ নং সাক্ষী রমিজকে ফেনী আসতে বলেন। ফলে, ১২ নং সাক্ষী রমিজ ২০ নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে পিআই এর একটি স্টাফ গাড়িতে করে ওইদিন রাতেই ফেনী পৌঁছেন।

৮৬. ১৯৬৭ সালের ১২ জুলাই রাত দুটা ৩০ মিনিট থেকে চারটা ৩০ মিনিটের মধ্যে ১২ নং সাক্ষী রমিজ, ২০ নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেন এবং ৯ নং আসামি দলিল উদ্দিন ছাড়া সবাইকে পিআই এর স্টাফ গাড়িতে করে নিয়ে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি বড় রাস্তায় নামিয়ে দেন। এরপর ১২ নং সাক্ষী রমিজ এবং ২০ নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেন ওই রাতেই চট্টগ্রাম ফিরে আসেন। ১৭ নং সাক্ষী জালাল উদ্দিন প্রতিনিধিদ্বয়ের ভারতীয় স্থলভাগে প্রবেশ তদারক করেন।

৮৭. ১৯৬৭ সালের ১৩ জুলাই রাতে কোনো এক সময় ওই প্রতিনিধিদ্বয় ৩৩ নং আসামি রেজা এবং ৩ নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব আগরতলা থেকে একটি ট্রাকে করে ফেনীতে হোটেল ডিনোফায় ফিরে আসেন।

৮৮. ১৯৬৭ সালের ১৫ জুলাই ২ নং আসামি মোয়াজ্জেমকে ওই সভার ফলাফল জানানোর জন্য তাঁরা বরিশালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

৮৯. ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম ১২ নং আসামি মানিক চৌধুরী ও ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানসহ মি. পিএন ওঝার সঙ্গে তাঁর ঢাকাস্থ ধানমন্ডির পূর্বোক্ত বাড়িতে ষষ্ঠবারের মতো দেখা করেন। পিএন ওঝা ২ নং আসামি মোয়াজ্জেমকে জানান যে, তিনি তখনও তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে আগরতলা বৈঠকের কোনো ফলাফল জানেন না। কিন্তু তিনি চুপিসারে ১২ নং আসামি মানিক চৌধুরীকে জানিয়ে দেন যে, ভারতীয় কর্মকর্তারা এখানকার প্রতিনিধিদের যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তায় আস্থাবান নন।

৯০. ওই একই মাসে (জুলাই, ১৯৬৭) ৪ নং আসামি সুলতান করাচি সফর করেন। সেখানে ৩০ নং আসামি মাহবুব উদ্দিনের বাসায় ষড়যন্ত্রকারীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বাসায় ঠিকানা–১৪/৪ জি, মার্টিন কোয়ার্টার্স, করাচি। নিম্নোক্তরা ওই সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ

১. সুলতান, আসামি নং ৪
২. মফিজউল্লাহ, আসামি নং ৭
৩. জহুরুল হক, আসামি নং ১৭
৪. সার্জেন্ট শামসুল হক, আসামি নং ১২
৫. লে. রহমান, আসামি নং ৩১ এবং
৬. সিরাজ, সাক্ষী নং ১৫।

এ ছাড়া আরও তিন ব্যক্তি ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন যাঁদের নাম দেখা যায় পাইলট অফিসার মীর্জা, এসএম আলী এবং জয়নুল আবেদীন। এর মধ্যে শেষের দুজনের পরিচয় উদঘাটন করা যায়নি এবং প্রথমজন অসুস্থতাজনিত কারণে হাসপাতালে থাকায় চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়নি।

৪ নং আসামি সুলতান ওই সভায় বলেন যে, তিনি কিউবার বিপ্লব স্বচক্ষে দেখেছেন এবং ওই ধরনের একটি বিপ্লবে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যেই তিনি বেঁচে আছেন। তিনি প্রধান প্রধান কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার ঘাটতি দেখায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি এই

বলে তার বক্তব্যে শেষ করেন যে, এই সভায় উপস্থিত সকলে গ্রুপের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করার শপথ করুক।

৯১. এর সপ্তাহ দুয়েক পরে, ১৯৬৭ সালের জুলাই/আগস্ট মাসে ৩১ নং আসামি লে. রহমান ৩০ নং আসামি মাহবুব উদ্দিনের পূর্বোক্ত বাসায় আরেকটি সভা আহ্বান করেন। নিম্নোক্তরা ওই সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ

১. লে. রহমান, আসামি নং ৩১

২. লে. আবদুর রউফ, আসামি নং ৩৫

৩. জহুরুল হক, আসামি নং-১৭

৪. সুলতান, আসামি নং-৭

৫. মফিজউল্লাহ, আসামি নং-৭

৬. বারী, আসামি নং-২২

৭. সিরাজ, সাক্ষী নং-১৫

এ ছাড়াও উপস্থিতদের মধ্যে দুজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে–জয়নুল আবেদীন ও এমএস আলী বলে এবং আরও কয়েকজনের নাম রয়েছে অস্পষ্টভাবে লেখা। এদের কারোর পরিচয়ই উদঘাটন করা যায় নি।

ওই সভায় ৩১ নং আসামি লে. রহমান সদস্যদেরকে এই নির্দেশ দেন যে, ২ নং আসামি মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে সংগঠনের যে মূল অংশ কাজ করছে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে সবাই যেনো কাজ করেন। এরপর ৩৫ নং আসামি লে. আবদুর রউফ উপস্থিত সদস্যদেরকে বাংলায় শপথ বাক্য পাঠ করান। ওই সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহও নেওয়া হয়ঃ

ক. ১৫ নং সাক্ষী সিরাজুল ইসলাম মৌরিপুর এলাকা থেকে চাঁদা তুলবেন এবং সদস্য তালিকাভুক্তি করবেন।

খ. ৭নং আসামি মফিজউল্লাহ ড্রিগ রোড থেকে চাঁদা ও সদস্য সংগ্রহ করবেন।

গ. ১৭ নং আসামি জহুরুল হক কোরাঙ্গী এলাকা থেকে চাঁদা ও সদস্য সংগ্রহ করবেন এবং ওই একই উদ্দেশ্যে তিনি চাকলালা, পেশোয়ার, কোহাট সারগোদা সফর করবেন।

৯২. ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে ১২ নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপরই তাঁদেরকে বলা হয় যে, তিনি (স্টুয়ার্ড মুজিব) এবং ৩৩ নং আসামি রেজা আগরতলা গিয়েছিলেন।

৯৩. ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে ৩৫ নং আসামি লে. আবদুর রউফ ২৯ নং আসামি জলিলের ক্লেটন কোয়ার্টার্সের বাসায় একটি জরুরি সভা আহ্বান করেন। নিম্নোক্তারা ওই সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ

১. মফিজউল্লাহ, আসামি নং-৭

২. বারী, আসামি নং ২২

৩. জলিল, আসামি নং ২৯

৪. লে. রহমান, আসামি নং ৩১
৫. লে. রউফ, আসামি নং ৩৫
৬. শামসুদ্দিন, সাক্ষী নং ৬ এবং
৭. সিরাজ, সাক্ষী নং ১৫।

এই সভায় উপস্থিতদের মধ্যে আরও তিনজনের নাম দেখা যায়–ক্যাপ্টেন আফতাব চৌধুরী, জয়নুল আবেদীন এবং সিদ্দিকুর রহমান। কিন্তু এদের পরিচয় উদঘাটন করা যায়নি। এই সভায় ৩৫ নং আসামি লে. রউফ এবং ৩১ নং আসামি লে. রহমান কতগুলো আশঙ্কাজনক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁদের সন্দেহ যে, তাঁরা সন্দেহভাজন হিসেবে কড়া নজরের মধ্যে আছেন। ৩৫ নং আসামি লে রউফ সভায় অংশগ্রহণকারীদেরকে আর কোনো নতুন সদস্য সংগ্রহ না করার নির্দেশ দেন। তিনি গ্রুপের সদস্যদেরকে ছুটি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যাবার উদ্যোগ নিতে বলেন। ফলে, গ্রুপের সদস্যরা ছুটি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের নিজস্ব শহরগুলোতে চলে যেতে থাকেন।

৯৪. ৩ নং আসামি সার্জেন্ট শামসুল হকের পরামর্শে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক সময় ১৭ নং আসামি জহুরুল হক চাকলালা পিএএফ স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং সেখানে তিনি ২১ নং সাক্ষী সার্জেন্ট রজব হোসেনের সাক্ষাৎ পান। ১৭ নং আসামি জহুরুল হক ২১ নং সাক্ষী রজব হোসেনকে জানান যে, সামরিক বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি গ্রুপ গঠিত হয়েছে। তিনি ২১ নং সাক্ষী রজব হোসেনকে সেই গ্রুপে যোগদানের আহ্বান জানান। কিন্তু ২১ নং সাক্ষী রজব হোসেন এই ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করতে অস্বীকার করেন।

৯৫. ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে ৩৩ নং আসামি রেজা ১২ নং সাক্ষী রমিজের কাছ থেকে পিআইএর একটি ক্রেডিট টিকিট পান এবং এর মাধ্যমে ১০ নং সাক্ষী আসামি রুহুল কুদ্দুস ও ২৫ নং আসামি ক্যাপ্টেন মোতালেবকে একথা জানাতে লাহোর ও পেশোয়ার যাত্রা করেন যে, তাঁর মনে হয় ২নং আসামি মোয়াজ্জেম সংগঠনের তহবিল ব্যবহারে অনিয়ম করছেন। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে ১০নং আসামি রুহুল কুদ্দুস এবং ২৫ নং আসামি ক্যাপ্টেন মোতালেব যথাক্রমে লাহোর ও পেশোয়ারে পোস্টিং পেয়ে চলে গিয়েছেন।

৯৬. ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে ১৫ নং সাক্ষী সিরাজ 'প্রিভিলেজ লিভ'-এ ঢাকা যান। ঠিক ওই সময়ই ৩০ নং আসামি মাহবুব উদ্দিন, ৩৫ নং আসামি লে. রউফ এবং ৩১ নং আসামি লে. রহমানও ছুটিতে ঢাকা পৌঁছেন।

৯৭. ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে নিম্নোক্ত ষড়যন্ত্রকারীরা ২৪ নং সাক্ষী প্রাক্তন স্কোয়াড্রন লিডার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর বাসায় একটি সভায় মিলিত হন:

১. ফজলুল হক, আসামি নং ১১
২. এমএ রাজ্জাক, আসামি নং ১৬
৩. করপোরাল জামাল, সাক্ষী নং ১৪
৪. জাকির আহমদ, সাক্ষী নং ২২

৫. সার্জেন্ট এম আবদুল হালিম, সাক্ষী নং ২৩ এবং
৬. চৌধুরী, সাক্ষী নং ২৪।

এই সভায় আলোচনা হয় যে, ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম এবং তাঁর অনুসারী ব্যক্তিবর্গের স্বার্থপরতার কারণে গ্রুপের যে দুরবস্থা হয়েছে সেখান থেকে গ্রুপকে উদ্ধার করে এর কাজকর্ম পুনরুজ্জীবিত করা দরকার।

৯৮. ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে ২২ নং সাক্ষী জাকির ২৫ নং সাক্ষী উইং কমাণ্ডার আশফাক মিয়াকে জানান যে, কয়েকদিন আগে ২৩ নং সাক্ষী হালিম তাকে ২৪ নং সাক্ষী চৌধুরীর বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি নিম্নোক্ত ব্যক্তিদেরকে সমবেত দেখেছেন:

১. ফজলুল হক, আসামি নং ১১
২. এমএ রাজ্জাক, আসামি নং ১৬
৩. চৌধুরী, সাক্ষী নং ২৪
৪. করপোরাল জামাল, সাক্ষী নং ১৪ এবং
৫. হালিম, সাক্ষী নং ২৩।

২২ নং সাক্ষী জাকির ২৫ নং সাক্ষী আশফাক খানের কাছে অভিযোগ করেন যে, এসব ব্যক্তি কেন্দ্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করার বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন।

৯৯. ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ১৫ নং সাক্ষী সিরাজের বন্ধু জনৈক মি. মালিকের ঢাকাস্থ শুক্রবাদের বাসায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ একটি সভায় মিলিত হন:

১. লে. রউফ, আসামি নং ৩৫, ২. মাহবুব উদ্দিন, আসামি নং ৩০, ৩. সিরাজ, সাক্ষী নং ১৫ এবং আরো কয়েকজন যাঁদেরকে চিহ্নিত করা যায়নি।

এই সভায় গ্রুপের কর্মকাণ্ডকে আড়াল করে রাখার জন্য ঢাকায় একটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি আলোচনা হয়। ৩৫ নং আসামি লে. রউফ গ্রুপের কাজকর্ম পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ২ নং আসামি মোয়াজ্জেম এবং কর্নেল এমএজি ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করার উদ্যোগ নেন।

১০০. এর অল্প কয়েকদিন পরেই ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের সদস্যদের গ্রেপ্তার করা আরম্ভ হয় এবং এইভাবে তাঁদের কর্মকাণ্ড সমাপ্ত হয়।

এখন যথাবিহিত সম্মানপূর্বক প্রার্থনা এই যে, আসামিদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে এবং এখানে তা সন্নিবেশিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে আসামিদের যেনো বিচার করা হয়।

আদালতে দেওয়া শেখ মুজিবের জবানবন্দি

মামলার আসামি হিসেবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে শেখ মুজিব লিখিত দীর্ঘ জবানবন্দি দেন। এতে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার গোপন বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় নিজে জড়িত থাকা কিংবা এ ব্যাপারে কিছু জানার কথা তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করেন। জবানবন্দিটি এখানে দেওয়া হল:

স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এর ফলে, ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও ছিল এবং এখনও সেইরূপ একটি নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যমান।

১৯৫৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদে এবং পরে জাতীয় বিধান সভায় সদস্য নির্বাচিত হই। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করি। অধিকন্তু আমি গণচীনে প্রেরিত বিধান পরিষদের এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করি। জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদল গঠন করার জন্য আমাকে ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর কারা নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল বিনা বিচারে আটক রাখে। আমাকে একইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে, কিন্তু আমি ঐ সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০-এর জানুয়ারিতে আমাকে উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তিলাভকালে আমার উপর কিছু কিছু বিধিনিষেধ জারি করা হয়–যেমন: ঢাকা ত্যাগ করিলে আমাকে গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও একইভাবে সে বিষয় তাহাদিগকে অবগত করাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এই সময় সর্বদা ছায়ার মতো আমার পিছু লাগিয়া থাকিত।

অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারির প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয় মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধী দলের অঙ্গদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধীদল এই সময় প্রেসিডেন্ট পদে জনাব আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দান করে। সরকারি কর্তৃপক্ষও পুনরায় আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে।

১৯৬৫ ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই।

যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে।

যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশসহ বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম। কারণ আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্বশান্তিতে আস্থাবান–আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান–ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থিত করি। ছয় দফা কর্মসূচিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান–উভয় অংশের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হইয়াছে।

অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয় দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারী নেতৃবৃন্দ ও সরকারি প্রশাসনযন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়' 'গৃহ যুদ্ধ' ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম তখন তাহারা যশোরে আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারি পরোয়ানা বলে এইবারের মতো প্রথম গ্রেপ্তার করে।

আমাকে যশোরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন, কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিন বলে আমি সেই দিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা সাতটায় নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই আটটায়, পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারি পরোয়ানা বলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সেই রাত্রেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিনের আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। পর দিবস সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন প্রদান করেন। কিন্তু মুক্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা দরজায়ই গ্রেফতার করে। এবারের গ্রেফপ্তারি পরোয়ানা মোমেনশাহী হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই রাত্রে আমাকে পুলিশ পাহারাধীন মোমেনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একইভাবে মোমেনশাহীর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃত হন এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরিউক্ত সকল ধারাবাহিক গ্রেপ্তারি প্রহসন ও হয়রানি ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সংঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে–সম্ভবত ৮মে, আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাত্রে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত একটার সময় পুলিশ 'ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুল'-এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেপ্তার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহাম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহসভাপতি খোন্দকার মুশতাক আহাম্মদ, প্রাক্তন সহসভাপতি জনাব মুজিবর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জহুর আহাম্মদ চৌধুরীসহ বহু নেতৃবৃন্দ। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম.এন. এ, প্রচার সম্পাদক জনাব মোমেন এডভোকেট, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা শহর

আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন আহম্মদ এডভোকেট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহসভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী ক্যাপটেন মনসুর আলী, প্রাক্তন এম.এন. এ জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট জনাব আমিনুদ্দিন আহম্মদ, পাবনার এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মুস্তাফা সারওয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মহীউদ্দিন আহম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব মোহাম্মদুল্লাহ এডভোকেট ও সংগ্রামী নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দিন আহম্মদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সহসভাপতি জনাব হারুনুর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমন্ডি আওয়ামী লীগ সহসভাপতি জনাব রশীদ মোশাররফ, শহর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সুলতান আহাম্মদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নূরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইন, মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকীসহ অন্যান্য বহু আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্রনেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষা বিধি ৩২ ধারা (নিষ্ঠুর অত্যাচার) বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। আমার দুই ভাগিনেয়—পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুলকে কারারুদ্ধ করা হয়। অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করিত। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াফত করে এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি, চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন সহসভাপতি ও অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধি বলে অন্ধ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশ প্রায় ৮০০ লোককে গ্রেপ্তার করে এবং অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনেম খান প্রায়শই তাহার লোকজন এবং সরকারি কর্মচারী সমক্ষে উন্মুক্তভাবে বলিয়া থাকেন যে, যতদিন তিনি গদিতে আসীন থাকিবেন ততদিন শেখ মুজিবকে শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন। আটকাবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বেশ কয়েকবার বিচারালয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার পর ১৯৬৮ সালের জানুয়ারির ১৭/১৮ তারিখ রাত একটার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। আমাকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন

করিয়া নির্জনে রাখা হয় এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। আমাকে খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িতে দেওয়া হইত না। বিশ্ব হইতে সকল যোগাযোগবিহীন অবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচ মাসকাল আটক থাকিতে হয়। এই সময় আমাকে অমানুষিক মানসিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈহিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যতো অল্প প্রকাশ করিতে হয় ততই উত্তম।

এই বিচার কার্য শুরু হইবার মাত্র একদিন পূর্বে, ১৯৬৮ সালের ১৮ই জুন, আমি প্রথম এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাহাকে আমার অন্যতম কৌসুলি নিয়োগ করি।

কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিস্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেন, লে. মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-করপোরাল আমির হোসেন, এল এস সুলতান উদ্দিন আহাম্মদ, কামালউদ্দিন আহাম্মদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজউল্লাহ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্মচারীদের কখনও দেখি নাই। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান—এই তিনজন সি.এস.পি অফিসারকে আমি জানি। আমি মন্ত্রী হিসাবে সরকারি কার্য সম্পাদনকালে তাহাদিগকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং তাঁহারাও তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি তাহাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোনো ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। আমি কোনোদিন লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে অথবা করাচিতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে গমন করি নাই কিংবা আমার অথবা লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেনের অথবা করাচিতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে কোনো সভাও অনুষ্ঠিত হয় নাই কিংবা এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির সহিত কোনো আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজউদ্দীনের বাসায় সংঘটিত হয় নাই। ঐ সকল ব্যক্তি কোনোদিন আমার গৃহে গমন করে নাই এবং আমিও এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কাহাকেও টাকা দিই নাই। আমি কখনও ডা. সাঈদুর রহমান কিংবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে বলি নাই। তাঁহারা চট্টগ্রামে আমার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শত শত কর্মীদের ন্যায় মাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানে তিনজন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন কার্যকরী পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আটজন সম্পাদক রহিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী, এম.এন.এ ও এম.পি.এ। বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের পাঁচজন ও প্রাদেশিক পরিষদের দশজন সদস্য আমার প্রতিষ্ঠানভুক্ত। চট্টগ্রামেও আমার প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর সভাপতি ও সম্পাদকগণ; প্রাক্তন এম.এন.এ, এম.পি.এ ও

অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাহাদের কাহারও নিকট কোনো প্রকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব যে, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী ও একজন সাধারণ এল.এম.এফ. ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে কোনো সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতে পারি। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীর বিরোধিতা করিবার জন্য ডা. সাঈদুর রহমানকে বরং আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। আমি ডা. সাইদুর রহমানের গৃহে কদাপি গমন করি নাই।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল – দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচি রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম – ছয় দফা কর্মসূচিতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডির ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করিতে চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসাবশত মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি প্রকাশিত এ প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ২৮ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিলো এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিলো না। উক্ত প্রচারপত্রের ইহাও উল্লেখ হইয়াছিল যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে – তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে – এবং শীঘ্রই বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে।

একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে একথা জানাইতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারি কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোনো বিভাগ হইতে কোনো প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক।

বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অধিকন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্রজাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে এই মামলা তাহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। আমি কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোনো কিছু করি নাই কিংবা কোনোদিনও এই উদ্দেশ্যে কোনো স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোনো কর্মচারীর সংস্পর্শে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই।

আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

কাঠগড়ায় শেখ মুজিব

বাংলাদেশে থাকতে হলে শেখ মুজিবের সাথে কথা বলতে হবে

আগরতলা মামলা শুরুর প্রথম দিন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব সংশ্লিষ্ট সবার উদ্দেশ্যে শংকাহীন কণ্ঠে এমন এক সতর্কবানী উচ্চারণ করেন যা আদালতে উপস্থিত বিচারক, সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার লোক এবং আইনজীবী-সাংবাদিকদের স্তম্ভিত করে দেয়। এ বিষয়ে ওইদিন আদালত কক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ লিখেছেন,

'১৯৬৮ সালের ২০ জুন, সকাল ৯টায় মামলা শুরুর দিন ঢাকা শহর ও সামরিক এলাকায় উত্তেজনাকর উৎকণ্ঠাময় এক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। সুস্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে, কুর্মিটোলাস্থ সামরিক ঘাঁটির বাহিনী আর জনগণের অবস্থান পৃথক সত্তায় অবস্থিত। তখন থেকে ডিএফআই (তিন বাহিনীর সংযুক্ত গোয়েন্দা সংস্থা) সামরিক বাহিনীর বাইরে কিছুটা প্রকাশ্য কিছুটা অপ্রকাশ্যভাবে মামলার প্রতিক্রিয়া জানা ও জনগণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত হতে থাকে। এদের প্রধান সহযোগী ছিল প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ। বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী (বিএনপি সরকারের) জনাব মুস্তাফিজুর রহমান তখন অভিযুক্তদের ইন্টারোগেশনের কর্তৃত্ব করতেন বলে সংশ্লিষ্টগণ জানান। ট্রাইব্যুনাল কক্ষে প্রথমদিকে প্রবেশের সময় মনে হতো একটি ভীতিকর নির্যাতন কক্ষে অথবা গ্যাস চেম্বারে প্রবেশ করছি। ক্ষুদ্র কক্ষের বিচারকদের ডান পাশে ছিল নির্দিষ্ট কয়েকজন সাংবাদিকের জন্য চেয়ার ও টেবিল। তাঁদেরই ডান পাশে গা ঘেঁষে বক্ষ সমান্তরাল বেড়ি দিয়ে অভিযুক্তদের (আসামী) জন্য স্থান করা হয়েছিল। উঁচু এজলাসের মুখোমুখি অতি নিকটে ছিল দুই পক্ষের কৌসুলিদের বসার স্থান। তাঁদের পেছনে ছিল দর্শকদের জন্য নির্ধারিত চেয়ার। সাক্ষীর কাঠগড়া এজলাসের বাঁ হাতের কোণায়।

ন'টা বাজার মিনিট পাঁচেক আগে বিচার কক্ষের ডানদিকের দরজা দিয়ে অভিযুক্তদের নির্দিষ্ট এলাকায় উপস্থিত করা শুরু হয়। সমগ্র কক্ষ নিস্তব্ধ। পিন পতনের শব্দও যেন শোনা যাবে। ন'টা প্রায় বাজে বাজে। বিচারকগণ পেছনের দরজা দিয়ে এজলাসে স্ব-স্ব আসন গ্রহণ করবেন। বিচারপতিগণ আগমনের পূর্বে উৎকণ্ঠিত আইনজীবীগণ এবং অতিকষ্টে অনুমতিপ্রাপ্ত অভিযুক্তদের মা-বাবা সন্তান ও আত্মীয়স্বজন দর্শকরূপে নির্বাক হয়ে পাশের দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রথমেই অভিযুক্তদের অভিযোগের গুরুত্ব

অনুযায়ী প্রদত্ত আসন নম্বর আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। প্রথম যিনি পাশের দরজা দিয়ে ট্রাইবুনাল কক্ষে প্রবেশ করলেন–রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত এক নম্বর ব্যক্তি, দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরিহিত দীর্ঘকায় শঙ্কাহীন মানুষটি দৃঢ় পদক্ষেপে নির্দিষ্ট আসনের দিকে এগিয়ে এলেন। প্রবেশের পরেই তিনি সমগ্র কক্ষটির ওপর চোখ বুলিয়ে গেলেন। খালি উঁচু এজলাসের দিকে তাকালেন। মৃদু হাসি, বলিষ্ঠ মনোভাব ও অকুতোভয় মানুষটিকে দেখার সাথে সাথে দর্শক ও আইনজীবীদের মধ্যে একটি গুঞ্জরন শোনা গেল। তিনি যেন ভুলেই গেছেন যে ফাঁসি দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্রের কোনো মামলায় তাঁকে আনা হয়েছে। তাঁর পাশেই ছিলেন দু'নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি বিদ্রোহের প্রধান পরিকল্পনাকারী লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ও তৃতীয় ব্যক্তি তেজী স্টুয়ার্ট মুজিবর রহমান এবং তাঁর পরেই সুলতান উদ্দিন।

শেখ মুজিব চিরাচরিত অভ্যাসমতো পা বাড়িয়ে প্রথম সারির কোণায় প্রথম আসনে অতি স্বাভাবিকভাবে পা ক্রস করে বসলেন। তখনি আমি তাঁর পাশাপাশি হয়ে গেলাম। মাঝখানে কাঠ ও লোহার রডের বিভাজন মাত্র। আমি রিপোর্টারদের সারিতে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বসা ছিলাম বলে আমার ও তাঁর মধ্যে মাত্র হাত দুয়েক ব্যবধান ছিল। এমনটি ঘটবে তা আগে ভাবিনি। একবার তাঁর মুখের দিকে চাইবার সাথে সাথে ঘোষণা হলো বিচারকগণ প্রবেশ করছেন।

প্রধান বিচারপতি এসএ রহমানের আসন গ্রহণের সাথে সাথে দুপাশে দুজন বিচারপতি আসন অলঙ্কৃত করলেন। এখন বিচার শুরু। স্বাভাবিকভাবেই সরকারপক্ষ থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। মঞ্জুর কাদের দাঁড়িয়ে মৃদু ও সুসভ্য কণ্ঠে আনুষ্ঠানিক দিক ব্যাখ্যা করছেন। আমি এবং অন্য সমস্ত রিপোর্টারই ফাঁসির আসামী এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সারাজীবনই মুজিব ভাই বলতাম। ফলে সবার মনেই একদিকে যেমন তাঁর সম্পর্কে উৎকণ্ঠা, অপরদিকে তাঁর সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য নানা প্রশ্ন জাগছিল। এমন কি এতো সতর্কতার মধ্যেও কথা বলা যায় কি না সেই ফাঁক আমরা স্ব-স্ব পদ্ধতিতে ভাবছিলাম। কিন্তু যমের মতো জাঁদরেল কালো গাউন পরিহিত তিনজন বিচারপতি এবং সতর্কতাদানকারী বহুসংখ্যক ডিএফআই এবং আইবির লোক ক্ষুদ্র কক্ষটিতে শ্যেনদৃষ্টিতে শেখ সাহেবের দিকে চেয়ে আছেন। ভাবলাম, ডানদিকে বাঁকা করলেই গর্দান যাবে। এমন সময় আকস্মিক ডাক, 'ফয়েজ, ফয়েজ, এই ফয়েজ!' কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পাথরের মূর্তির মতো বিচারকদের দিকে চেয়ে রইলাম। একটু পরেই আমার ডান উরুতে শেখ সাহেব হাত বাড়িয়ে কিছু একটা দিয়ে খুঁচিয়ে দিলেন। দেখলাম তাঁর সেই বিখ্যাত পাইপের আঘাত। নিশ্চয়ই তিনি অভ্যাসের দাবিতে (তামাকহীন) পাইপ আনতে অনুমতি পেয়েছিলেন। সাধারণত কোর্টে এ সমস্ত অনুমতি দেয়া হয় না। এবার কি করি! আমি দুই পক্ষের কৌসুলিদের সামান্য তর্ক-বিতর্কের ফাঁকে পূর্বের ন্যায় প্রস্তর মূর্তির মতো অন্যদিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বললাম, 'মুজিব ভাই, কথা বলা মানা। মাথা ঘোরাতে পারছি না। বের করে দেবে।' তক্ষুনি উত্তর

আসলো যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠে, 'ফয়েজ, বাংলাদেশে থাকতে হলে শেখ মুজিবের সাথে কথা বলতে হবে।' তাঁর এই কথা ছিল রাজনৈতিক ও প্রতীক ধর্মী। স্তম্ভিত কোর্ট, সমস্ত আইনজীবী ও দর্শকগণসহ সরকারি অফিসাররা তাঁর এই সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। প্রধান বিচারপতি একবার ডানদিকে ঘাড় বাঁকা করে শেখ মুজিব ও অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দিকে তাকালেন। কিছুই বললেন না। কোনো সতর্ক উচ্চারণ ছিল না। তিনি হয়তো কোর্টের আভিজাত্য বোধ থেকে এই দৃষ্টিপাতকেই যথেষ্ট সতর্কতা প্রদান বলেই মনে করেছিলেন এবং বোধহয় নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে, শেখ মুজিব এমন কারাগার, ভয়ভীতি, শঙ্কা ও ট্রাইবুনালের বিচারের মধ্যেও শেখ মুজিবই রয়ে গেছেন। তবে কিসের সমর্থনে শেখ মুজিবের এই মনোবল, তা তিনি এমন সুউচ্চ অবস্থান থেকে অনুমান করতে পারেননি। তখন তিনি জানতেন না যে, শেখ মুজিবের এই প্রতীকী উচ্চারণ একজনের জন্য নয়, সমগ্র দেশের জনগণের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের বাণীস্বরূপ।'

–(ফয়েজ আহমদ, 'আগরতলা মামলা', শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ')

লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন-এর লিখিত জবানবন্দি

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম (২নং) আসামি লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৯ সালের ২৯ জানুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সামনে ইংরেজিতে লিখিত জবানবন্দি দেন। এর বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো এই জবানবন্দিতে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেন। এছাড়া এতে তাঁর ওপর বন্দী অবস্থায় চালানো চরম নির্যাতনের চিত্রটিও ফুটে উঠেছে।

"পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো এক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আমি জড়িত বলে আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা। আমার বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে আমি সেসব সুনির্দিষ্টভাবে অস্বীকার করি। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

'১৯৫০ সালে আমি পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদান করি। ওই বছরই আমি বৃটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর সঙ্গে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হই এবং বৃটেনে চলে যাই। এই প্রশিক্ষণে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক উভয় বিষয়ে শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশি নম্বর পেয়ে রাজকীয় নৌবাহিনীর নিয়মানুযায়ী কমিশন পাই। বৃটিশ নৌবাহিনীর অনুমোদনক্রমে আমি পাকিস্তান নৌবাহিনীতেও কমিশন পাই এবং পরবর্তী প্রশিক্ষণের জন্য পুনরায় বৃটেনে চলে যাই। ১৯৭৫ সালে আমি পাকিস্তানে ফিরে আসি এবং এক বছর পাকিস্তান নৌবাহিনীতে কাজ করার পর ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিশেষজ্ঞের কোর্স করার জন্য নির্বাচিত হয়ে আবারও বৃটেনে যাই। এই কোর্স শেষ করে ১৯৬০ সালের মে মাসে আমি পাকিস্তান ফিরে আসি।'

'বৃটেন থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নির্ধারিত কোর্স এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিশেষজ্ঞের কোর্স সাফল্যের সঙ্গে শেষ করার ফলে আমি নিম্নোক্ত ডিগ্রিসমূহ অর্জন করি- (ক) গ্রাজুয়েট অব দি ইনস্টিটিউট অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারস (যুক্তরাজ্য), (খ) অ্যাসোসিয়েট মেম্বার অব দি ইনস্টিটিউট অব মেরিন ইঞ্জিনিয়ারস (যুক্তরাজ্য), (গ) মেম্বার অব দি বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং সোসাইটি, (ঘ) যুক্তরাজ্যের পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দেওয়া প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবে সার্টিফিকেট, (ঙ) মেম্বার অব দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ারস (যুক্তরাজ্য)।'

'১৯৬৭ সালের শুরুতে আমি আমার বর্তমান পদে উন্নীত হই। আমি চাকরিতে যোগ

দেওয়ার পর থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কখনো পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করার সুযোগ পাইনি। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে আমি চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হই এবং সেখান থেকে পূর্ব পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সংস্থায় ডেপুটেশনে যাই। ১৯৬৭ সালের ১১ মার্চ আমি ওই সংস্থায় যোগ দেই এবং বরিশালে নিয়োগ লাভ করি।'

'১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসের কোনো এক সময় আই ডব্লিউ টি এ-র সচিব আমাকে ঢাকায় পাঠান এবং জানান যে, একটি গোপন মিশনে আমাকে রাওয়ালপিন্ডি যেতে বলা হয়েছে। নৌ হেডকোয়ার্টার থেকে পাঠানো একটি গোপন তারবার্তার কপি তিনি আমার হাতে দিলেন। ওই সাংকেতিক গোপন কপিটি প্রমাণপত্র হিসেবে এখানে উপস্থাপন করেছি। বোধহয় এর পরের দিন আরেকটি তারবার্তা আসে যাতে আমাকে ১৯৬৭ সালের ৪ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছতে বলা হয়। আমি ৩ ডিসেম্বর ঢাকা ত্যাগ করি এবং ওইদিন বিকেল সাড়ে চারটায় পিন্ডি পৌঁছি। আই ডব্লিউ টি এ কর্তৃপক্ষ নৌ সদর দপ্তরে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আমার পিন্ডি পৌঁছার সময় জানিয়ে দিয়েছিলেন। ওই টেলিগ্রামের কপিও এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।'

'প্রেরিত তারবার্তা অনুযায়ী পিন্ডি বিমান বন্দরে সাদা পোশাক পরিহিত দুজন লোক আমাকে স্বাগত জানায়। পরে বন্দী অবস্থায় এবং আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় জানতে পারি যে, ওই দু'জন ছিলেন লে. কর্ণেল আমীর এবং লে. কর্ণেল হাসান। বিমান বন্দর থেকে আমাকে কোনো সামরিক ব্যারাকের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। জায়গাটি দেখে কোনো সামরিক এলাকা বলেই মনে হচ্ছিলো, পরে আমি জানতে পারি যে, সেটি ছিল 'আর্মি ইন্টারোগেশন সেন্টার'। ওই অফিসে নিয়ে আমার দেহ তল্লাশি করা হয় এবং আমার সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে নেওয়া হয়।'

'ইতিমধ্যে আরেক ব্যক্তি দুই কর্ণেলের সঙ্গে যোগ দেন। এরপর তারা আমাকে আমার পূর্ববর্তী অবস্থা, পারিবারিক পূর্ব পরিচয়াদি, আমার আত্মীয়-স্বজন, যোগ্যতা, যুক্তরাজ্যে আমার নাবিক জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করেন। আমি পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তারবার্তায় বলা ছিল যে, আমাকে একটি সভায় যোগ দিতে হবে। আর আমাকে কিনা ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করেছে। এ সময় তারা জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই নৌবাহিনী থেকে আমার অবসর নেবার কারণ জানতে চান। কিছুক্ষণ পরই তারা পুনরায় বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে রাজনৈতিক প্রসঙ্গে চলে আসেন, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচি সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। ছয় দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করে সে সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিমত জানাতে বলা হয়। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আমি আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে চিনি কি না। আরও জানতে চাওয়া হয়, পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি মি. মোর্শেদ, মি. ফজলুল কাদের চৌধুরী, ড. মালিক, মি. শামসুল হক, মি. এ. এফ. রহমান সি এস পি, মি. রুহুল কুদ্দুস সি এস পি, মি. কে.এ. শামসুর রহমান সি এস পি, মি. শফিউল আযম সি এস পি এদেরকে আমি চিনি কি না। এছাড়া আরও

অনেকের নাম তারা বলেন যেগুলো আমি এখন মনে করতে পারছি না। তারা একটি তালিকা থেকে এই নামগুলো পড়ছিলেন এবং ওই তালিকায় অন্তত ৫০ জনের নাম ছিল। আমি তাদেরকে বললাম যে, আমি প্রায় ১০ বছর দেশের বাইরে ছিলাম এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাইরে ছিলাম প্রায় ১৭ বছর। তাই এদের মধ্যে আহমেদ ফজলুর রহমান সি এস পি ছাড়া অন্য কাউকে আমি চিনি না।'

'এর পরবর্তী আলোচনায় কর্ণেল হাসান আমাকে বললেন যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান যা ধারণা করছেন সে ব্যাপারে আমরাও নিশ্চিত যে, শেখ মুজিবের রাজনীতি পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা এবং অখণ্ডতার বিরুদ্ধে এবং শেখ মুজিবকে যদি এই রাজনীতি থেকে নিবৃত্ত করা না যায় তাহলে পাকিস্তানের বর্তমান অগ্রগতি অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব নয়। এই পর্যায়ে কর্ণেল আমীর টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন, "আমরা শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁর সমর্থকদেরকে ধ্বংস করে দেব।" কর্নেল হাসান আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি আমার প্রতি নমনীয় এবং সুন্দর ব্যবহার করার চেষ্টা করলেন। আমাকে নিশ্চয়তা দেওয়া হলো যে, অবসর গ্রহণের জন্য আমার আবেদন নৌবাহিনী গ্রহণ করবেন, আমাকে পূর্ণ পেনশন দেওয়া হবে এবং অবসর গ্রহণের পরও যাতে আমি ভাল কোনো পদে চাকরি পাই সে ব্যাপারে সরকার দেখবেন। এর বিনিময়ে দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর সহকর্মী বন্ধু এবং পার্টি কর্মীদের নিঃশেষ করার জন্য তাদেরকে (গোয়েন্দাদের) সহযোগিতা করার জন্য আমাকে বলা হলো। দেশের জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনার একজন কর্মকর্তার কর্তব্য সম্পর্কে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো। কমিশন না পাওয়ার সময় প্রত্যেক অফিসারকে যে শপথবাক্য পাঠ করতে হয় তার কথাও আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো এবং আমার কাছে তা ব্যাখ্যা করে বলা হলো, দেশকে রক্ষা করা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ জন্য তিনি প্রয়োজনীয় যে কোনো পথ ও পদ্ধতি গ্রহণের কথা বিবেচনা করতে পারেন। সেখানে আমার মতো সামরিক কর্মকর্তার সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। আমাকে একথাও বলা হলো যে, এ সম্পর্কিত যে কোনো ব্যাপারে আমি তাকে আমার ওপরস্থ কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত বিবেচনা করতে পারি এবং তার আদেশ আমার মেনে চলা উচিৎ। এরপর আমাকে পরামর্শ দেওয়া হলো যে, একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রদত্ত জবানবন্দীতে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাদের নির্দেশমত কয়েকজনের নামে উল্লেখ করে আমাকে বলতে হবে যে, আমি তাঁদেরকে চিনি। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। তিনি আমাকে সামরিক বাহিনীতে কর্মরত এবং প্রাক্তন লোকদেরকে তাঁর পার্টির সমর্থনে সংগঠিত করতে বলেছিলেন। তাঁর নির্দেশে আমার নেতৃত্বে এই সংগঠন চলবে এবং এই সংগঠনের জন্য ভারত থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া যাবে। শেখ মুজিব আমাকে একথাও বলেন যে, যথাসময়ে ভারত থেকে অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি সামরিক সাহায্যও পাওয়া যাবে। আমাকে আরও বলতে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের যোগাযোগ আছে এবং শেখ মুজিবের প্রতি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনপ্রতিনিধি, জননেতাসহ সামরিক,

নৌ ও বিমান বাহিনীর এবং সিভিল সার্ভিসের বড় বড় কর্মকর্তাদের সমর্থন রয়েছে, আমি তাঁদের পরামর্শ মতো কোনো কিছুই করতে রাজি হইনি। কারণ, আমি এ সমস্ত বিষয়ে কিছুই জানতাম না, যদি তাঁদের কথামতো কাজ করতাম তাহলে এটা হতো সম্পূর্ণ একটি মিথ্যার বেসাতি এবং তারা যেসব লোকের কথা বলছিলেন তাঁদের কাউকেই আমি চিনতাম না।'

'এরপর আলোচনা শুরু করলেন কর্নেল আমীর। তিনি বললেন যে, যদি আমি তাদেরকে সহায়তা করতে রাজি হই তাহলে কর্নেল হাসান যেসব সুযোগ সুবিধার কথা বলেছেন সেগুলো তো পাবই, তাছাড়াও সরকারের কাছ থেকে একটা পুরস্কার পাবো। কর্নেল আমীর আমাকে এতদূর পর্যন্ত বললেন যে, যেসব লোকের বিরুদ্ধে আমাকে বলতে হবে তাঁদেরকে যদি আমি ভয় পাই তাহলে সরকার আমার পুরো পরিবারকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেতে পারে এবং সরকারি খরচেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারে। আমি সব সময়েই তাদের প্রস্তাবে রাজি হতে অস্বীকার করি। রাত ১০ টা পর্যন্ত এই আলাপ-আলোচনা চলে। এরপর তারা বলেন যে, তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য অনেক বাছাই করার পর আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছিলো। এখন আমি যদি তাদেরকে সহায়তা করতে রাজি না হই তাহলে আমাকে ছেড়ে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তাতে সরকারি পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই আমাকে তাদের দুর্ব্যবহারের মুখোমুখি হতে হবে। হয় আমাকে তাদের প্রস্তাবে রাজি হতে হবে, না হয় কোর্টে যেতে হবে। তারা সরকারের অসীম ক্ষমতার কথা ব্যাখ্যা করলেন এবং বললেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান অনতিবিলম্বেই একটি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন। তারা পুনরায় বললেন যে, আমি যদি তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি না হই তাহলে আমার নামও কাউকে দিয়ে ওই ষড়যন্ত্রকারী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা তাদের পক্ষে কোনো কঠিন কাজ হবে না। আমাকে 'সার্ভিস অ্যাক্ট'-এর সাম্প্রতিক সংশোধনীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হলো যে, শেখ মুজিবের সঙ্গে আমাকেও ফায়ারিং স্কোয়াডে যেতে হেব।'

'এই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম যে কি হতে যাচ্ছে বা তারা কি করতে চাচ্ছেন। এবারে আমি প্রথম কর্নেলদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি গ্রেপ্তার হয়েছি কিনা এবং হলে তা কোন কর্তৃপক্ষের অধীনে? তারা বললেন যে, আমাকে নৌবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ-এর অধীনস্থ বিশেষ কর্তৃপক্ষের অধীনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তখন আমি সেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখাতে বললাম এবং আইনানুযায়ী আমাকে তার লিখিত কপি দিতে বললাম। এতে কর্নেদ্বয় চরমভাবে রেগে উঠলেন। কর্নেল হাসান অত্যন্ত নোংরা ভাষায় আমাকে গালি দিতে শুরু করলেন আর কর্নেল আমীর তার কোমরের বেল্ট খুলে তা দিয়ে আমাকে আঘাত করতে শুরু করলেন। এরপর তারা পাশের কক্ষ থেকে একজন লোক ডেকে তাকে নির্দেশ দিলেন আমাকে একটি সেলে বন্দী করে রাখার জন্য। সেই সেলটি ছিল একটি ছোট্ট কক্ষ। ঢোকার পথে দু'টি দরজা। বাইরের দিকেরটি ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি আর ভিতরের দিকেরটি লোহার রডের গ্রিল দিয়ে তৈরি। এই কক্ষে কোনো জানালা বা ভেনটিলেটর ছিল না, ছিল না কোনো বাতি। এই সেলে ঢোকানোর আগে আমাকে সমস্ত কাপড়-চোপড়

খুলতে বলা হলো। পিন্ডিতে তখন শৈত্য প্রবাহ বইছিলো এবং আমার সমস্ত অনুভূতি বলছিল সব কাপড়-চোপড় দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখতে।'

'রাত প্রায় ৪টার সময় দুই কর্নেল আমাকে দেখতে এলেন। তারা আমাকে অফিস কক্ষে নিয়ে পুনরায় আগের মতো আলোচনা শুরু করলেন। সেদিন ছিল প্রথম রমজান। আলাপ-আলোচনার এই পর্যায়ে আমি সেহরির জন্য বললাম। এই কথা বলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করা হল যে, বাঙালি মুসলমানদের জন্য রোজা রাখা বাধ্যতামূলক নয়। কারণ আসলে তারা হিন্দুদের জারজ সন্তান। এরপর কর্নেল হাসান বললেন, আমি প্রকৃত মুসলমান কিনা সে বিষয়ে তাদের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন এবং কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমাকে জোরপূর্বক উলঙ্গ করা হয়। রাতের প্রথমভাগে যেসব বিষয়ে রাজি হবার জন্য আমার ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল এখনও সেগুলোরই পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছিল। প্রায় দু'ঘন্টা ধরে এই জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব চলে এবং এই পুরো সময়টাই আমাকে হাঁটুতে ভর দিয়ে দু'হাত ওপর দিকে তুলে থাকতে হয়েছে। তাদের প্রস্তাবে আমার যে কোনো রকম অস্বীকৃতি এবং আমার অবস্থার একটু নড়চড় হলেই তারা কিল-চড়, লাথি-ঘুষি এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করছিল। এরপর আমাকে পুনরায় সেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

'এই দুই কর্নেল প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় দু'বার আমার ওপর নির্যাতন চালাতেন। জিজ্ঞাসাবাদের ধরন ও প্রশ্ন ছিল প্রায় একই। একদিন নির্যাতনের সময় তারা আমাকে চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে চোখের সামনে খুবই উজ্জ্বল ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে দেয়। আমি তাদেরকে অনুরোধ করলাম এই পদ্ধতিটি বাদ দিতে। কারণ আমার চোখে সমস্যা ছিল এবং ডাক্তারের পরামর্শ ছিল উজ্জ্বল রোদেও খালি চোখে না যাবার। তারা আমার অনুরোধ উপেক্ষা করলেন। ওপরন্তু কর্নেল হাসান আমার চুলের মুঠি ধরে মাথা সোজা করে রাখেন যাতে আমার চোখে-মুখে পুরোপুরি আলো পড়ে। আমি যখনই চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছেন। এই অবস্থায় তারা আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করে বললো কতগুলো বিষয়ে স্বীকারোক্তি দেবার জন্য। যেমন, আমি ভারতে গিয়েছিলাম, আমি ঢাকায় কয়েকটি অনুষ্ঠানে জনৈক পি. এন. ওঝাকে দেখেছি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ভারতের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে। আরও অনেক বিষয় তারা আমাকে আরও চাপ দিচ্ছিল অভিযুক্ত পার্টি আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা প্রকাশ করার জন্য, তাদের অস্ত্রের ভাণ্ডারের খোঁজ দেবার জন্য ইত্যাদি। যেহেতু এসব বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না সেহেতু সবকিছুই অস্বীকার করছিলাম। এ সময়টা ছিল আমার পিণ্ডি পৌছার ৩৬ ঘন্টা এবং আমি কোনো কিছু না খাওয়ার ৪০ ঘন্টারও বেশি সময় পরে। আমি খুবই পরিশ্রান্ত, নিঃশেষিত ও দুর্বল পয়ে পড়ছিলাম, তাঁর ওপর এই অমানুষিক নির্যাতনে আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি এবং কে কখন, কিভাবে আমাকে চেয়ার থেকে মুক্ত করেছিল তা আমি বলতে পারব না। পিণ্ডিতে আটক থাকা অবস্থায় এ ধরনের ঘটনা আরো একবার ঘটেছিল। এইভাবে অবিরাম নির্যাতন এবং না খাওয়ার ফলে আমি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ি। এই অবস্থায় এক পর্যায়ে আমি তাদেরকে সহায়তা করতে রাজি হই। এরপর

আমার ওপর নির্যাতন বন্ধ হয়। আমাকে কম্বল ও বিছানা দেওয়া হয় এবং খেতে দেওয়া হয়। এর কয়েক ঘন্টা পরে কর্নেল আমীর এসে আমাকে জানান যে, আমার জবানবন্দী পিণ্ডিতে নয়, ঢাকায় রেকর্ড করা হবে। এও বলা হয়, ওই দুই কর্নেলও ঢাকায় আসবেন এবং আমাকে সহায়তা ও দেখাশুনা করবেন। আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯৬৭ সালের ৭ ডিসেম্বর আমাকে ঢাকায় আনা হয় এবং ইন্টারোগেশন সেন্টারের একটি সেলে বন্দী করে রাখা হয়। আমার ঢাকায় পৌঁছানোর পর সন্ধ্যাবেলা কর্নেলদ্বয় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং একটি লিখিত বিবৃতি আমার হাতে দেন যেটি তারা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আমাকে দিয়ে পাঠ করাতে চান। আমাকে বলা হয় যে, যে রকম লেখা রয়েছে সে রকমভাবেই পরের দিন সকালে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ওটা পাঠ করার জন্য যেন নিজেকে প্রস্তুত করি। আমার সেলে যেহেতু কোনো আলো ছিল না সেহেতু ওই বিবৃতি পড়ে দেখার জন্য আমাকে এ ভবনেরই একটি অফিস কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। পড়ে দেখলাম, বিবৃতির বিষয়বস্তু তারা ইতিপূর্বে পিণ্ডিতে নির্যাতন করে সে সব বিষয় আমাকে দিয়ে বলাতে চেয়েছেন সে রকমই। এ ধরনের একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার অর্থ হচ্ছে আমার মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করা। শুধু আমার ক্ষেত্রেই নয়, আরও কয়েকজন লোকের জন্য ব্যাপারটি একই রকম, যাদেরকে আমি জীবনে কখনও দেখিনি আর দেখবো না। সুতরাং আমি জবানবন্দি না দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম।'

পরের দিন সকালে দু'জন কর্নেল এলে আমি তাদেরকে আমার সিদ্ধান্ত জানাই। এরপর থেকে ১৯৬৭ সালের ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার ওপর একটানা নির্যাতন চালানো হয়। একদিন আমাকে অন্য দু'জন লোকের সামনে নিয়ে যাওয়া হয় যাদেরকে আগেই আই এস আই অধিদপ্তরের ব্রিগেডিয়ার আকবর এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের মি. রিজভী বলে চিনেছিলাম। এই প্রথমবার আমাকে কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সামনে আনা হলো। ফলে আমি তাদেরকে জানালাম যে, আমার ওপর গত ৩ ডিসেম্বর থেকে অবিরাম নির্যাতন চালানো হচ্ছে। কিন্তু তারা আমার কথায় কোনো আমল দিলেন না বরং ওই কর্নেলের মতো একই কৌশল প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। তারা আমাকে বললেন যে, আমি যদি কয়েকটি চিঠি লিখতে রাজি হই তাহলে আর আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে জবানবন্দী দেবার জন্য চাপ দেওয়া হবে না এবং বাড়িতে যেতে দেওয়া হবে। তাদের কথাবার্তায় আমি বুঝলাম যে, অন্য কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করার জন্য আমার লেখা চিঠিকে তারা ব্যবহার করতে চাচ্ছেন। এই পর্যায়ে আমি চিঠি লিখতে রাজি হলাম। এতে ব্রিগেডিয়ার সাহেব এতোই খুশি হলেন যে, আমাকে কোনো অফিসার্স মেসে রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ মোতাবেক আমাকে তৃতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অফিসার্স মেসে নিয়ে যাওয়া হয় ১৯৬৭ সালের ৯ ডিসেম্বর।'

"ওই দিন দুই কর্নেল এসে আমাকে সেনানিবাসে ভি আই পি মেসে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি আরেক জনের দেখা পাই। পরে জেনেছিলাম, তিনি মেজর নাসের। সেখানে আমাকে ইংরেজিতে টাইপ করা কয়েকটি কাগজ দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, চিঠির ফরমে হুবহু

ইংরেজি এবং তার বাংলা অনুবাদ লিখতে হবে। সেই টাইপ করা খসড়া চিঠিগুলো পড়ে দেখলাম, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনের দেবার জন্য যে বিবৃতির কপি আমাকে দেওয়া হয়েছিল এই চিঠির ভাষাও ঠিক সেই রকম। আমি খুব হতাশ হয়ে পড়লাম। মুক্তি পাবার সকল আশা আমার মাথা থেকে মুহূর্তে উবে গেলো। আমি কর্নেলদের বললাম যে, এ ধরনের চিঠি আমি লিখবো না। ফলে, তারা পুনরায় আমার ওপর নির্যাতন শুরু করেন। ১২ ডিসেম্বর আমার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে না পড়া পর্যন্ত এই নির্যাতন চলতে থাকে। এ সময় আমার অবস্থা এতোই খারাপ হয়ে পড়ে যে আমাকে মেসে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন রাতে কর্নেল আমীরের ঘুষিতে আমার একটি দাঁত পড়ে যায়। সেই দাঁতটিও এখানে উপস্থাপন করার ইচ্ছা আমার ছিল। ওইদিন মেজর নাসের আমাকে মেসে নিয়ে গেলে আমি তাকে আমার ওপর অমানুষিক নির্যাতনের কথা বলি। জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি আমাকে ওই কক্ষ ত্যাগ করতে দেখোনি? আমি একটা পশুর ওপরও অমন নির্যাতনের কথা ভাবতে পারি না।' মেজর নাসেরের এই কথায়ই আমার ওপর পরিচালিত অকথ্য নির্যাতনের প্রকৃতি বুঝা যায়।"

'মেসে নেবার পর আমাকে দেখার জন্য একজন ডাক্তার এলেন। আমাকে পরীক্ষা করার পর তিনি কর্তব্যরত অফিসারকে বললেন যে, আমার হাঁটা-চলা বা নড়াচড়া করা চলবে না। প্রচণ্ড জ্বর ছিল আমার শরীরে, মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে গিয়েছিল এবং সমস্ত শরীর ফুলে উঠেছিল। ডাক্তার কয়েকটি ওষুধ লিখে দিয়ে চলে গেলেন। তারপর প্রায় এক মাসের মধ্যে আমি কোনো ডাক্তারের দেখা পাইনি। আমার উপর্যুপরি অনুরোধ সত্ত্বেও ১২ ডিসেম্বর '৬৭ থেকে ১৯৬৮ সালের ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত কোনো ডাক্তার আমাকে দেখতে আসেননি। এরপর হয়তো ডাক্তারের পরামর্শে, কিংবা কি কারণে জানি না, ওই কর্নেলদ্বয় বা অন্য কেউ আমাকে বিরক্ত করতে আসেননি।'

'একদিন মেজর নাসের লে. কর্নেল শাহ আলী বাজ নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসেন। এই অফিসারটি আমার সঙ্গে কিছু অভাবিতপূর্ব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।'

'১৯৬৮ সালের ১২ জানুয়রি পাকিস্তান নৌবাহিনীর জনৈক লেফটেন্যান্ট শরীফ এসে আমাকে জানালেন যে, আই ডব্লিউ টি এ-তে আমার ডেপুটেশন তুলে নেয়া হয়েছে এবং তার সঙ্গে ওই দিনই আমাকে চট্টগ্রামে যেতে হবে। তার কথা অনুযায়ী আমার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এক বিরাট দুর্যোগের পর আমি তার সঙ্গে চট্টগ্রাম চলে এলাম।'

'চট্টগ্রামে আমাকে ছোট্ট একটি গুদাম কক্ষে আটকে রাখা হলো। এই কক্ষেও কোনো আলো কিংবা ভেনটিলেটর ছিল না। নৌবাহিনীর একজন অফিসারকে এই ধরনের কক্ষে আটকে রাখা ছিল আইন বিরুদ্ধ। এমতাবস্থায় আমার প্রতিবাদ কর্তৃপক্ষের বধির কর্ণে প্রবেশ করলো। এরপর প্রায় সাত দিন নৌবাহিনীর সঙ্গে ছিলাম। এ সময়ও তারা ম্যাজিস্ট্রিটের সামনে আমার একটি জবানবন্দী রেকর্ড করানোর চেষ্টা করেছেন। এ সময় আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, সামরিক বাহিনী আমাকে অভিযুক্ত করেছে। এ ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করার জন্য নৌবাহিনীর সামনে একটি উপায় আছে। তাহলো

আমি যদি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কথিত জবানবন্দীটি দেই তাহলে সেটিসহ প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন করে অভিযোগ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। নৌবাহিনীর সঙ্গে থাকা অবস্থায় যদিও আমার ওপর শারীরিক নির্যাতন হয়নি কিন্তু মানসিক নির্যাতন হয়েছে প্রচুর। আলোচনা করার অজুহাতে তারা প্রত্যেক রাতে আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতো।'

'১৯৬৮ সালের ২০ জানুয়ারি আমাকে পুনরায় সামরিক হেফাজতে পাঠানো হয়। আমাকে দ্বিতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অফিসার্স মেসের ১ নং কক্ষে আটক করা হয়। যেখানে আমি এখনও অবস্থান করছি। এখানে আটকের তিন দিন পর থেকে আমার জন্য যে প্রহরার ব্যবস্থা করা হয় তা ছিল সামরিক রীতিবিরুদ্ধ। প্রহরায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা ছিল আমার চেয়ে নিম্নপদস্থ। তারা আমার সঙ্গে একই কক্ষে থাকতো এবং খাওয়া-দাওয়া করতো। অনেক সময়ই তারা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতো। এসব নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু এসব ব্যাপারে কখনও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পরে আমি বুঝে নেই যে, আমাকে অপমান ও অপদস্থ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে এসব করানো হচ্ছে। ১৯৬৮ সালের মে মাস পর্যন্ত যেহেতু আমার জন্য কোনো লেখার সামগ্রী বরাদ্দ ছিল না সেহেতু এসব অভিযোগ আমি লিখিতভাবে কোথাও জানাতে পারিনি। ১৯৬৮ সালের মে মাসে আমার জন্য লেখার সামগ্রী বরাদ্দ হবার পরই আমি দ্বিতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারকে লিখিতভাবে আমার অভিযোগগুলো জানিয়েছি।

'১৯৬৮ সালের মার্চ মাস নাগাদ আবারও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে জবানবন্দী দেবার জন্য আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। এ সময় কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি আমাকে উত্যক্ষ করেনি। আমাকে ওই সময় প্রায়ই নিয়ে যাওয়া হতো সিগনাল অফিসার্স মেসে, যেখানে মেজর হাসানের অফিস অফিস ছিল কিংবা নিয়ে যেতো মেজর নাসেরের অফিসে এবং একটি অস্থায়ী 'ইন্টারোগেশন সেন্টার'- ১৬ এফ এফ লাইনে। এসব স্থানে নিয়ে যাবার রুটিনও ছিল একই ধরনের। আমাকে নেবার জন্য যাদেরকে পাঠানো হতো তারা অত্যন্ত ব্যস্ততা দেখাতো। আমাকে বসিয়ে রাখা হতো লনের মধ্যে কিংবা কোনো খোলা জায়গায়। প্রায় ঘন্টাখানেক একাকী বসে থাকার পর নির্ধারিত অফিসার আসতেন এবং বলতেন আমরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি। তিনি আমাকে কয়েকটি সামান্য প্রশ্ন করার পর আবার ফেরৎ পাঠাতেন। যখন আমি কথা বলতে বলতে হাঁটতাম তখন বারান্দা থেকে অনেকগুলো চোখ আমাকে দেখতো। পরে বিচারকাজ চলাকালে কয়েকজন সাক্ষী আমাকে চিহ্নিত করেছিলেন যাদেরকে আমি জীবনে কখনও দেখিনি। তাদের সাক্ষ্য রেকর্ড করার সময় বুঝা গেছে যে, আমি যখন লনে বা খোলা জায়গায় বসে থাকতাম কিংবা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতাম তখন এই লোকগুলোই আমাকে ভাল করে দেখতো।'

'এই সময় কর্নেল শের আলী বাজ অসুস্থ হয়ে সমন্বিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি হন। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসের কোনো একদিন আমাকে হাসপাতালে তার শয্যাপাশে নেওয়া হয়। কর্নেল পুনরায় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে জবানবন্দী দেবার জন্য আমাকে চাপ দিতে থাকেন। তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাহায্য পাবার

জন্য আশ্বাস পেয়েছেন। সুতরাং আমি জবানবন্দী দিতে অস্বীকার করে বোকামি করছি। এখনও ভুল শুধরানোর সময় আছে। এখনও জবানবন্দী দিয়ে আমি নিজেকে বাঁচাতে পারি। কিন্তু পুনরায় জবানবন্দী দিতে অস্বীকার করলাম। এরপর একই উদ্দেশ্যে আমাকে বহুবার হাসপাতালে কর্নেলের কাছে নেওয়া হয়। অতঃপর হঠাৎ এক সময় আমাকে হাসপাতালে নেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এর কয়েকদিন পরে লেফটেন্যান্ট শরীফ আমার কাছে এসে জানান যে, আমার স্ত্রী অসুস্থ। কিন্তু কি ধরনের অসুস্থ তা তিনি বলেননি। পরবর্তীতে কর্নেলও আমাকে খবর দিয়ে নিয়ে ওই একই সংবাদ জানান এবং আমার স্ত্রী কি ধরনের অসুস্থ তা জেনে আমাকে জানানোর জন্য তিনি কথা দেন। আমি আমার স্ত্রীকে দেখতে যাবার অনুমতি দেওয়ার জন্য কর্নেলকে অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আমি যেহেতু তাদেরকে সহায়তা করতে রাজি হইনি সেহেতু আমাকে সাহায্য করার কোনো উপায় তার নেই। আমাকে বলা হলো যে, জবানবন্দী দিয়ে আমি নিজেই কেবল আমার অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে যেতে পারি, অন্যথায় নয়। দু'একদিন আবারও কর্নেল আমাকে ডেকে পাঠান এবং জানান যে, আমার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ। আমি স্ত্রীকে দেখতে যাবার জন্য কর্নেলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্ণপাতই করলেন না। অবশেষে আমি তার ইচ্ছামতো কাজ করতে রাজি হলাম এবং বললাম যে, যত শিগগিরই সম্ভব তিনি যেন আমার স্ত্রীকে দেখতে যেতে দেবার ব্যবস্থা করেন। তিনি আমার একথাও প্রত্যাখ্যান করলেন এই বলে যে, আমি বার বার এরকমভাবে জবানবন্দী দেবার কথা বলে আবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছি। সুতরাং যত শিগগিরই সম্ভব জবানবন্দী দিয়ে আমি নিজেকে মুক্ত করতে এবং অসুস্থ স্ত্রী দেখতে যেতে পারি। এরপর আমাকে লেফটেন্যান্ট শরীফের সঙ্গে মেজর হাসানের অফিসে পাঠানো হলো এবং নির্দেশ দেয়া হলো যে, মেজর সাহেব যত শিগগিরই সম্ভব আমার জবানবন্দী তৈরি করবেন। মেজর হাসান আমাকে বললেন যে, সম্পূর্ণ কাজের জন্য দু'একদিন সময় লাগবে। যখন আমি তাকে একদিনের মধ্যে বিষয়টি ফয়সালা করার জন্য অনুরোধ করলাম তখন তিনি এতো জরুরির কারণ জানতে চাইলেন। আমি তখন তাকে আমার স্ত্রীর অসুস্থতার কথা বললাম। মেজর সাহেব তখন আমার প্রতি সহানুভূতি জানালেন এবং আমার জবানবন্দী তৈরি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, যদি আমার জানাশোনা ফোন থাকে তাহলে মেজর সাহেবের ফোন ব্যবহার করে সেখান থেকে আমার স্ত্রীর সর্বশেষ অবস্থা জেনে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে আমার কাছ থেকে নাম্বার নিয়ে তিনিই লাইনটি ধরে দিলেন। ফোনে কথা বলতে গিয়ে শুনলাম, আমাকে বিস্মিত এবং হতবাক করে দিয়ে, ফোনের অপর প্রান্ত থেকে আমার স্ত্রী কথা বলছেন। তিনি আমাকে বললেন যে, যদিও দীর্ঘ ৫ মাস যাবৎ আমার কোনো খবরাখবর না পেয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন কিন্তু তিনি এর মধ্যে কখনও অসুস্থ হননি। এবার আমি আমার সঙ্গে এদের খেলাটা বুঝতে পারলাম। আসলে কর্নেল সাহেব মেজর সাহেবের দয়াপরবশতার বিষয়টি হিসাবেই আনেননি যা আমাকে একটি মিথ্যা স্বীকারোক্তি প্রদান থেকে মুক্তি দিয়েছিলো। এরপর আমি এমন

ভাব দেখাতে থাকি যেন মনে হয় যে আমি জবানবন্দী দেবার জন্য খুবই উদগ্রীব। আসলে সব সময়ই আমি উপায় খুঁজতে থাকি কিভাবে কোর্টে উপস্থাপনের আগেই জবানবন্দীর একটি কপি হস্তগত করা যায় এবং শেষ পর্যন্ত জবানবন্দী দিতে অস্বীকার করা যায়। জবানবন্দীটি তৈরি হবার পর আমি তাতে নানা রকম পরিবর্তনের দাবি করতে থাকি যা মেজর সাহেব এবং লেফটেন্যান্ট শরীফ মিলে করছিলেন। শেষ পর্যন্ত জবানবন্দীটি আমাকে দিয়ে বলা হয় যে, এতে আর কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। এরপর আমি জবানবন্দীতে উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে ভেবে দেখার জন্য কিছু সময় চাই। মেজর সাহেব চলে যাবার পরে আমি জবানবন্দীটির কপিটি আমার কক্ষের লম্বা গদিওয়ালা বেঞ্চির নিচে লুকিয়ে রাখি এবং অন্য কয়েকটি টুকরা কাগজ পুড়িয়ে মেঝেতে ছাই ফেলে রাখি। ওই জবানবন্দীর একটি কপি এখানে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর মেজর সাহেব যখন জবানবন্দীটি ফেরৎ নিতে আসেন তখন তাকে আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কথা জানাই এবং জবানবন্দীটি পুড়ে ফেলার কথা বলি। মেজর সাহেব অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে ফিরে যান।'

'১৯৬৮ সালের ১০ মে আমাকে পুনরায় ডিভিশনাল মেসে নিয়ে কর্নেল শাহ্ আলী বাজের সামনে হাজির করা হয়। মেজর নাসেরও আসেন আমার সঙ্গে কথা বলতে। কর্নেল সাহেব, তার ভাষায়, জবানবন্দী দিয়ে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আমাকে শেষ সুযোগ দেন। কিন্তু আমি এবারও যখন তা দিতে অস্বীকার করি তখন তিনি আমাকে ফাঁসিতে ঝুলানোর অঙ্গীকার করেন।'

'১৯৬৭ সালের ৩ ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন পর্যন্ত আটক থাকাকালীন সময়ে আমাকে নিদারুণ একাকীত্বে ভুগতে হয়েছে। আমাকে কারো সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। এমনকি, আমার প্রহরীদের সঙ্গেও নয়। প্রতিদিন মাত্র ১৫ মিনিটের জন্য আমাকে ঘরের বাইরে নেওয়া হতো। ১৯৬৮ সালের মে মাস পর্যন্ত পড়া বা লেখার জন্য কোনোকিছু দেওয়া হয়নি। এমনকি তখন একটি চিঠি লেখার জন্যও আমাকে অনুমতি নিতে হয়েছে। ১৯৬৮ সালের ১৮ মে পর্যন্ত আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন কিংবা আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। আটক থাকাকালীন সময়ে আমি মারাত্মক চোখের সমস্যায় ভুগেছি। কিন্তু এজন্য কোনো যত্ন নেওয়া হয়নি। ফলে এখন আমার চোখের অবস্থা খুব খারাপ। আটক থাকা অবস্থায় আমার ওপর এমন নির্যাতন চালানো হয় যার দীর্ঘমেয়াদী কুফলে ১৯৬৮ সালের জুলাই এবং নভেম্বর মাসে দু'বার আমি আমার সম্পূর্ণ কর্মদক্ষতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখনও স্পাইনাল কডে প্রচণ্ড ব্যথার জন্য আমি সোজা হয়ে হাঁটতে পারি না। অথচ পূর্ববর্তী মেডিক্যাল রেকর্ড অনুযায়ী আমি সব সময় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলাম।'

'এই মাননীয় ট্রাইব্যুনালের সামনে সাক্ষীগণ আমার সম্পর্কিত মিথ্যা জবানবন্দী দিয়েছেন। আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে নিম্নোক্ত বক্তব্য উত্থাপন করে তাদের জবানবন্দী মিথ্যা প্রমাণ করতে চাই।'

'আমার সম্পর্কে অভিযোগ বলা হয়েছে যে, ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি লেফটেন্যান্ট মুজাম্মিলের পি এন এস হিমালয়া বাসভবনে একটি সভায় যোগ দিয়েছি। উল্লেখ্য যে, একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। সরকারিভাবেও আমি কোনোদিন ওই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিনি। আগেই বলেছি, আমি ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বাইরে ছিলাম। তাই এসব অফিসারদের দেখিওনি। পি এন এস হিমালয়া অবস্থিত মনোরা দ্বীপে। আর ১৯৬৩ সালে আমি একটি জাহাজে কাজ করতাম এবং আমার বাসা ছিল কেডি স্কিম-১' এ যা পি এন এস হিমালয়া থেকে ১৪ মাইল বিপরীত দূরত্বে অবস্থিত। আমি কখনও লেফটেন্যান্ট মুজাম্মিলের বাসভবনে যাইনি। তিনিও কখনও আমার বাসভবনে আসেননি। আমার চাকরি জীবনে আমি কখনও এল/এস সুলতান উদ্দিন, এল/এস নূর মুহাম্মদকেও দেখিনি। স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে বলা যায়, ১৯৬৬ সালের মে মাসে আমি যখন পি এন এস বখতিয়ারের যোগদান করি তখন তিনি অফিসার্স মেসে কর্মরত ছিলেন এবং ওই সময়ই তাকে প্রথম দেখি। আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানকারীকে আমি কখনোই আমার বাসায় ডিনারের দাওয়াত করিনি। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমার বাসা চেনেনও না। এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় এইভাবে যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আমার বাসা সম্পর্কে একটি সন্দেহজনক বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে তিনি আমার সঙ্গে ডিনার খেতে গিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে ওই সময়কালে কারসায এলাকায় আমার পোস্টিং কিংবা বাসা কোনোটাই ছিল না।'

'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ বলা হয়েছে যে, ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি জনৈক কামালুদ্দিনের বাসায় একটি সভায় যোগ দিয়েছি। আমি আমার জীবনে এই কামালুদ্দিনকে দেখিনি এবং তার বাসায় যাইনি। করাচিতে যে এরকম একজন কামালুদ্দিন থাকেন তাও আমার জানা ছিল না। উপরন্তু ওই সময়ে আমার জাহাজ দীর্ঘকালীন মেরামতে ছিল এবং আমি তখন জাহাজে তদন্তকারী আদালতে ফেস করছিলাম। এই বিষয়টি প্রমাণের জন্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র কোর্টে আনা যেতে পারে। এই আদালতে দেখার আগে পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান কিংবা এ.এফ. রহমান সিএসপি-কেও চিনতাম না।'

'অভিযোগে বলা হয়েছে যে, ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে আমার কারসাযের বাসভবনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ওই সময়ে কারসায এলাকায় আমার পোস্টিং কিংবা বাসা কোনোটাই ছিল না। আর পোস্টিং না থাকলে একটি প্রতিষ্ঠানের কোয়ার্টার কেউ ব্যবহার করতে পারে না। আমার চাকরির রেকর্ডপত্র দেখলে দেখা যাবে, কারসায এলাকায় আমার পোস্টিং হয় ১৯৬৫ সালের মে মাসে এবং ওই বছরের জুন/জুলাই মাসে আমি সেখানে বাসা পাই। এই আদালতে দেখার আগে আমি ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজ উল্লাহ কিংবা হাবিলদার দলিল উদ্দিনকে চিনতাম না বা কোনোদিন দেখিনি।'

'অভিযোগ আনা হয়েছে যে, ১৯৬৫ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকাস্থ শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং আমি ছুটি না নিয়েই করাচি থেকে আমীর

হোসেনকে সঙ্গে করে সেই সভায় যোগ দেই। এটা মিথ্যা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ওই সময়ে কাশ্মীরে মুজাহিদরা যুদ্ধ করছিল এবং পাকিস্তানের সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীকে তখন সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছিল। ছুটি-ছাঁটা ছিল সংরক্ষিত। এই অবস্থায় অনুমতি ছাড়া স্টেশন ত্যাগ করলে আমার কোর্ট মার্শাল হতো। আমি কখনো ঢাকা এসে এ ধরনের সভায় যোগ দেইনি। আর এই আদালতে উপস্থিত হবার আগে আমি রুহুল কুদ্দুস সিএসপি-কে কখনও দেখিনি বা চিনতাম না।'

'অভিযোগে বলা হয়েছে যে, আমার কাছে কিছু লোক অভিযুক্ত পার্টির জন্য টাকা জমা রাখতেন এবং আমি সময়ে সময়ে কিছু লোককে সেই তহবিল থেকে টাকা দিতাম। এই অভিযোগ আমি সুনির্দিষ্টভাবে অস্বীকার করি। আমি কখনো কারো কাছ থেকে এ ধরনের কোনো তহবিল গ্রহণ করিনি এবং কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তা দিইনি। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধের সময় বিদেশে বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। এরমধ্যে কোনো একদিনও আমি বাড়িতে আসিনি। সুতরাং মি. আমীর হোসেন ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার কাছে কিছু টাকা দিয়েছেন বলে যে অভিযোগ করেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

'অভিযোগে বলা হয়েছে, ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচিতে দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি আমার বাসায় এবং অন্যটি মি. এ. এফ. রহমান সিএসপি সাহেবের বাসায়। এই অভিযোগ মিথ্যা। '৬৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমি হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় ছিলাম এবং তারপর দুই সপ্তাহ ছিলাম অসুস্থতাজনিত ছুটিতে। আমি ডান চোখের মারাত্মক অসুখে ভুগছিলাম এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ণ বিশ্রামে ছিলাম। সুতরাং এ. এফ. রহমান সিএসপি সাহেবের বাসায় কোনো সভায় যোগ দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমি জীবনে কোনোদিন উল্লিখিত বাসায় যাইনি। আমার বাসায় অনুষ্ঠিত সভার কথাও মিথ্যা।'

'আরেকটি অভিযোগে বলা হয়েছে যে, ১৯৬৬ সালের ১২ মার্চ ঢাকায় জনৈক তাজউদ্দিনের বাসায় অনুষ্ঠিত একটি সভায় আমি যোগ দেই। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ৬৫ সালের ১২ মার্চ ছিল শনিবার অর্থাৎ ছুটির দিন নয়। স্বাভাবিক কর্মদিবসে প্রতিরক্ষা বিভাগের চাকরিতে কোনো ব্যক্তি কর্মদিবসে পূর্বানুমতি ছাড়া তার প্রতিষ্ঠান বা জাহাজ ত্যাগ করে অন্য কোথাও যেতে পারে না। মাননীয় আদালত আমার ছুটির রেকর্ডপত্র দেখলেই স্পষ্ট হবে যে আমি ওই দিন ছুটি নেইনি। অর্থাৎ কর্মস্থলেই ছিলাম। আর এ ধরনের কোনো সভায় যোগ দেবার জন্য আমি কখনও ঢাকায় আসিনি।'

'অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনৈক ডা. সাইদুর রহমানের বাসায় অনুষ্ঠিত কয়েকটি সভায় আমি যোগ দিয়েছি। এই আদালতে উপস্থিত হবার আগে এ ব্যক্তিটিকে আমি কখনও দেখিনি এবং আমি বিস্মিত হয়েছি এই দেখে যে, তিনি আমাকে চিহ্নিত করেছেন। আদালতে প্রদর্শিত রেকর্ডপত্র অনুযায়ী ১৯৬৬ সালের ৯ জুন আমার পরিবারবর্গ আমার কাছে চলে আসেন। প্রকৃতপক্ষে এ সময় আমি আমার এক সহকর্মীর ফ্লাটে অবস্থান করছিলাম, যার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হয়ে চট্টগ্রামে শ্বশুর বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। ১৯৬৬

সালের মে মাস পর্যন্ত আমি ওই বাড়িতে থাকার পর ১ জুন নাসিরাবাদে বাসা নেই। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ্যাংকরেজ-এ আমি আমার বাসা স্থানান্তর করি। এ সমস্ত প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদি কোর্টে তলব করা যেতে পারে। অভিযোগে উল্লেখিত ধরনের কোনো সভায় আমি যোগ দেইনি। এই আদালতে উপস্থিত হবার আগে আমি এ. বি. খুরশিদ কিংবা মানিক চৌধুরীকে কখনো দেখিনি বা চিনতাম না।'

'অভিযোগে বলা হয়েছে যে, ১৯৬৬ সালের মে মাসে মি. রমিজ আমার নাসিরাবাদের বাসায় যান এবং জুন মাসে তার বাসায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৬৬ সালের মে মাসে আমার বাসা নাসিরাবাদে ছিল না। মি. রমিজ চট্টগ্রামে কখনও আমার বাসায় যাননি। আমিও কখনো তার বাসায় যাইনি। মি. রমিজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল নিতান্তই আনুষ্ঠানিক। প্রকৃতপক্ষে মি. রমিজের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৬৬ সালের জুলাই বা আগস্ট মাসে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে। ১৯৬৬ সালের ১১ মে থেকে ২৫ মে পর্যন্ত আমি ঢাকায় ছিলাম। এই আদালতে উপস্থিত হবার আগে হাবিলদার আজিজুল হক কিংবা রিসালদার শামসুল হককে কখনও দেখিনি। আমার বক্তব্য অনুযায়ী আমি যে ঢাকা গিয়েছিলাম এবং অভিযোগে উল্লিখিত ধরনের কোনো সভায় উপস্থিত হইনি তা প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আমি আদালতে হাজির করতে আগ্রহী।'

'অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমি মি. রমিজের সঙ্গে কুমিল্লা যাই এবং সেখানে লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আরও বলা হয়েছে যে, ১৯৬৬ সালের আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে মি. রমিজের বাসায় অনুষ্ঠিত কয়েকটি সভায় আমি যোগ দিয়েছি। এগুলো সবই মিথ্যা। অভিযোগে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে আমি কখনোই সেভাবে কুমিল্লা যাইনি। বস্তুতঃপক্ষে ঢাকাতে আসা-যাওয়ার পথে কুমিল্লা অতিক্রম করা ছাড়া আমি জীবনে আদৌ কখনও কুমিল্লা যাইনি। একমাত্র ক্যাপটেন কে.ইউ আহমেদ কিছুদিন নৌবাহিনীতে ছিলেন এবং ১৯৬২ সালে আমরা একই জাহাজে ছিলাম। ক্যাপটেন আলীম নামে কাউকে আমি কখনও দেখিনি বা চিনি না। অভিযোগে যেভাবে বলা হয়েছে সে রকম কোনো সভায় আমি কখনও যোগ দেইনি।

'আমি মি. রমিজের ঢাকাস্থ বাসায় গিয়েছি বলে অভিযোগে যে উল্লেখ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আসলে ঢাকায় কোথায় তার বাসা তাও আমি জানি না। জনৈক কর্নেল ওসমানী আমার বাসায় এসেছেন এবং সভায় যোগ দিয়েছেন বলে অভিযোগে যা বলা হয়েছেও তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই মামলা শুরু হবার আগে আমি এই অফিসারের নামও কখনো শুনিনি। অভিযোগে উল্লিখিত এ কথাও মিথ্যা যে, আমি গাড়ি কেনার জন্য রমিজকে টাকা দিয়েছি।'

'জনৈক পি.এন.ওঝার সঙ্গে ঢাকায় আমার বৈঠক সম্পর্কে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা। বলা হয়েছে যে, ওই ওঝার সঙ্গে আমি ১৯৬৭ সালের ১০ ও ৩১ মার্চ বৈঠক করি। অভিযোগে উল্লিখিত ওঝার সঙ্গে আমার অর্ধ ডজন সভার মধ্যে মাত্র দু'টি সভার তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। একাজ করা হয়েছে আই ডব্লিউ টি থেকে আমার টি এ/

ডি এ ফরমগুলো দেখার পর। ঘটনাটি আরও পরিস্কার হবে যখন দেখা যাবে যে, '৬৭ সালের ১০ মার্চ আমি চট্টগ্রামে আমার অফিসে কর্মরত ছিলাম এবং বিকেলে অফিস থেকে বের হয়েছি। আমার এই বক্তব্যের সমর্থনে আমি আমার পে-বুক এবং সার্ভিস রেকর্ডস আদালতে দেখাতে চাই। ওই দিন আমি নৌবাহিনী ত্যাগ করে তিন বছরের জন্য আই ডব্লিউ টি এ-তে ডেপুটেশনে যাচ্ছিলাম এবং আমাকে আমার জিনিসপত্র সব স্থানান্তরের কাজ করতে হচ্ছিল। প্রকৃত ঘটনা হলো, ওই দিন (১০ মার্চ ৬৭) অফিস থেকে বাসায় ফিরে আমি আমার জিনিসপত্র সব পাঠিয়ে দেই এবং পরদিন, ১১ মার্চ '৬৭ সকাল ৭টার ট্রেনে আমার পরিবারবর্গসহ চট্টগ্রাম ত্যাগ করি। ১১ মার্চ বিকেলে আমি আই ডব্লিউ টি এ-তে যোগ দিই। কিন্তু যেহেতু আমি নৌবাহিনী থেকে পূর্ববর্তী অপরাহ্নে রিলিজ হই সেহেতু চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং একদিনের বেতন নিয়ে কোনো জটিলতা এড়াবার জন্য যোগদানের রিপোর্টে আমার অপরাহ্নে যোগদানের কথা বলা হয়েছে। এখানে একজন সাক্ষী বলেছেন যে, আমার মৌখিক নির্দেশমতো তিনি আমার টিএ বিল প্রস্তুত করেছেন। যেহেতু ১০ মার্চ আমি আমার চট্টগ্রামের অফিসে কর্মরত ছিলাম সেহেতু টি এ ফরমে একথা বলা অবশ্যই ভুল যে, আমি ১০ মার্চ সকাল ৭ টায় চট্টগ্রাম ত্যাগ করেছি। আসলে ওই সাক্ষী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত টিএ বিল পুন:পরীক্ষা না করেই আমি তাতে স্বাক্ষর করেছিলাম। একইভাবে ৩০ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল '৬৭ সময়কালের টিএ বিলেও ভুলক্রমে স্বাক্ষর করে আমি ৩১ মার্চ তারিখে ডিএ বিলটি হারাই। আসলে আমি চট্টগ্রাম থেকে যে সব ভারী জিনিসপত্র পাঠিয়েছিলাম, সেগুলোও এই টিএ বিল অনুযায়ীই পরীক্ষিত হওয়া উচিত ছিল। আমার এই সময়কালের টিএ বিলগুলো ঘেঁটে ৩১ মার্চের কল্পিত বৈঠকটির অভিযোগ তোলা হয়েছে। অভিযোগে বর্ণিত ধরনের কোনো সভায় আসলে আমি যোগ দেইনি।'

'আমি মি. রমিজকে ২৫ হাজার টাকা গিয়েছিলাম বলে অভিযোগে বলা হয়েছে তা মিথ্যা। আমি কোনো দিন কাউকে এ ধরনের টাকা দেইনি। অভিযোগ বর্ণিত এসব কথাও মিথ্যা যে, আমি ১৩ গ্রিন স্কোয়ার ঠিকানায় একটি স্থান পরিদর্শন করেছি কিংবা সেখানে অনুষ্ঠিত কোনো সভায় যোগ গিয়েছি। এই জায়গাটি কোথায় আমি তাও জানি না। একথাও মিথ্যা যে, আমি ওই জায়গায় একটি হিলম্যান গাড়ি রেখেছিলাম যেটি অভিযুক্ত দলের লোকেরা তাদের কাজ-কর্মে ১৯৬৭ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ব্যবহার করেছে। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের কোনো গাড়ির মালিকও আমি ছিলাম না। যানবাহন রেজিস্ট্রেশন বইয়ের তথ্য অনুযায়ী একটি মারাত্মক দুর্ঘটনার পর এই গাড়িটি ১৯৬৭ সালের ৫ এপ্রিল থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত মেরামতের জন্য একটি গ্যারেজে ছিল।'

'অভিযোগে বর্ণিত একথাও সর্বৈব মিথ্যা যে, আমি আগরতলা গিয়ে কিছু লোকের সঙ্গে দেখা করেছি। এ ধরনের কোনো ঘটনা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আমি কোনো দিন কোনো স্থানে লুৎফুল হুদা, জালাল উদ্দিন আহমেদ কিংবা আনোয়ার হোসেন নামে কোনো লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি। এ কথাও মিথ্যা যে, আমি মি. রমিজের চট্টগ্রামের বাসায় একটি ডিনার পার্টিতে যোগ দিয়েছি এবং সেখানে জনৈক ক্যাপটেন নুরুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করেছি। এই আদালতে আসার আগে আমি কখনও ক্যাপটেন নূরুজ্জামানকে দেখিনি।'

'অভিযোগে বর্ণিত এ কথাও মিথ্যা যে, তথাকথিত পার্টি তহবিল দিয়ে একটি গাড়ি কিনেছি। এ কথা সত্য যে, করাচি থাকাকালে আমার একটি ভ্যাসপা স্কুটার ছিল যেটি পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হবার আগে আমি বিক্রি করে দেই। আমি যখন করাচিতে ছিলাম তখন একটি গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নেই এবং ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানে আবেদন করলে পাঁচ হাজার টাকার একটি ওভারড্রাফট আমার নামে অনুমোদিত হয়। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই ওভারড্রাফটি অনুমোদিত হয়। এ বিষয়ে ব্যাংকের প্রদত্ত চিঠি এখানে রেকর্ড হিসাবে দেওয়া হয়েছে। এক হাতে এই ওভারড্রাফট এবং অন্য হাতে আই ডব্লিউ টি এ-র চেয়ারম্যানের চিঠি পাবার পর আমি স্কুটারটি বিক্রি করার জন্য একজন খরিদ্দার খুঁজতে থাকি এবং অন্যদিকে গাড়ি কেনার আগেই আমার পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরের বিষয়ে লিখিত সর্বশেষ চিঠির জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর হবার সময় দুই হাজার ৫০০ টাকায় আমি আমার স্কুটারটি বিক্রি করি এবং অন্যান্য অ্যালাউন্স বাবদ প্রায় চার হাজার টাকা পাই যার প্রমাণপত্র এখানে দাখিল করা হয়েছে। এরপর ১৯৬৬ সনের জুন মাসে চট্টগ্রাম থেকে কর্তব্য কর্মের উদ্দেশ্যে ঢাকা গিয়ে আমি হিলম্যান আই এম পি গাড়িটি কিনি। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে আমি মস্কোভিচ গাড়ির জন্য সরকারি কোটা থেকে পারমিট পাই। এ সময় আমার ভাই, যিনি একজন চিত্রকর, একটি গাড়ি খুঁজছিলেন। আমি তখন তার কাছে আমার হিলম্যান বিক্রি করে একটি মস্কোভিচ কিনি।'

'এ কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা যে, আমি আমীর হোসেন মিয়ার কাছে কয়েকটি চিঠি লিখেছি, যা আদালতেও প্রদর্শন করা হয়েছে। আমি কখনো তার কাছে কোনো চিঠি লিখিনি। আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে এই ঘটনাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে যে, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আমার লেটারহেডের চারটি লেটার ছাপানো হয়। যখন আমি জানতে পারলাম যে, আমি আই ডব্লিউ টি এ-তে ডেপুটেশনে যাচ্ছি তখন আমি এই লেটারহেড ছাপানো বন্ধ রাখি। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদি হাজির করার জন্য ঢাকাস্থ একটি প্রেসকে নির্দেশ পাঠাতে অনুরোধ করি। ওই প্রেসটি আমার লেটারহেড তৈরি করেছিল কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা সরবরাহ করেনি। আমি যখন পিন্ডি যাই তখন এই লেটারহেডগুলো আমার ব্রিফকেসে ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট আশরাফ উদ্দিন কর্তৃক আমার হস্তাক্ষরের যে লিপি কোর্টে দাখিল করা হয়েছে তাও ঠিক নয়। কারণ ম্যাজিস্ট্রেট কখনো আমার হস্তাক্ষর নেননি।'

১৯৬৬ সালে করাচি বসে আমি আমীর হোসেন মিয়ার কাছে কয়েকটি ডায়রি এবং অন্যান্য প্রমাণপত্রাদি দিয়েছিলাম বলে অভিযোগে যা বলা হয়েছে তাও মিথ্যা। আমার কোনোদিন ডায়রি লেখার অভ্যাস ছিল না। যে ডায়রি কোর্টে দাখিল করা হয়েছে তা ১৯৬৪ সালে আমার জাহাজ যখন বড় ধরনের মেরামতের জন্য ডকে যায় তখন একটি এজেন্সি আমাকে উপহার দিয়েছিল। আমি যে কোনোদিন ডায়রি লিখি না তার প্রমাণ-ওই ডায়রিগুলো সবই ছিল ফাঁকা।'

'অভিযুক্ত রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে অনেক প্রমাণ পত্রাদিই প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু আমার বাসা তল্লাশি করে এ সবের কোনোকিছু কোনোদিন পায়নি। আমাকে দোষি সাব্যস্ত করার জন্য পুরো ঘটনাটাই সাজানো হয়েছে। আদালতে প্রদর্শিত ডায়রিগুলো পুরনো বইপত্রের সঙ্গে বাক্স বোঝাই হয়ে ঢাকায় আমার বাবার বাসায় ছিল। আমি যখন বরিশালে স্থানান্তর হই তখন এগুলো রেখে যাই। ১৯৬৭ সালের ১১ ডিসেম্বর সামরিক বাহিনীর অফিসারসহ পুলিশ ওই বাসায় তল্লাশি চালায়। এই তল্লাশি চালানোর সময় সামরিক বাহিনীর একজন মেজর আমার স্ত্রীকে দু'ঘন্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং মাঝে মাঝে হুমকি দেন।'

'উল্লেখ্য, এই মামলায় প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, অভিযোগ অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত. ঢাকায় কতগুলো সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভাগুলোতে তথাকথিত অভিযুক্ত সংগঠনের দু'জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মি. রুহুল কুদ্দুস সি এস পি এবং মি. এ. এফ. রহমান সি এস পি-এর তৎপরতা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি যদিও তারা উভয় ওই সময়কালে ঢাকাতেই অবস্থান করছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে আমি যতোদিন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করছি ততদিনের মধ্যে তথাকথিত অভিযুক্ত সংগঠনের ওই দু'জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে আমার কোনো সংস্পর্শ দেখানো হয়নি। এছাড়া আরও উল্লেখ্য যে, যদিও এই মামলায় প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করার পূর্ব পর্যন্ত তথাকথিত সংগঠনটির কাজ-কর্ম নিরবচ্ছিন্নতাভাবে চলেছে তথাপি ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসের পরে আমার কাজকর্ম সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। অথচ অভিযোগে আছে যে, এই সময়েই কয়েক ব্যক্তি ভারতে গিয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত আমার নিরবচ্ছিন্ন এবং অসাধারণ কাজ-কর্মের বিষয়ে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারপর হঠাৎ আমাকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত রাখা হয়েছে। অবশ্য এর অর্থ এও হতে পারে যে, ইতিমধ্যেই কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে।'

'অভিযোগে বর্ণিত এ কথাও মিথ্যা যে, ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতেই আমার আই ডব্লিউ টি এ-তে ডেপুটেশনে যাবার কথা হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত আমার এই ডেপুটেশনের প্রশ্নই ওঠেনি, যখন বর্তমান সি-ইন-সি আই ডব্লিউ টি এ-র চেয়ারম্যান ছিলেন, যিনি ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং বর্তমান চেয়ারম্যানের চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছিল। এ বিষয়ে দু'খানা চিঠি রেকর্ড হিসেবে আমি আদালতে উপস্থাপন করতে চাই।'

'উপরোক্ত ঘটনাবলীদৃষ্টে এ কথা বলা যায় যে, এই মামলায় কর্তৃপক্ষ এবং নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাকে জড়িয়েছেন তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, দীর্ঘদিন বৃটিশ নৌবাহিনীর সংস্পর্শে থাকা এবং তাদের দেওয়া প্রশিক্ষণের ফলে আমি সকল প্রকার অন্যায়-অনিয়ম-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে অতিশয় নিষ্ঠা প্রদর্শনের একটা অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। আমার এই অভ্যাসের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সময়ে আমার ওপরস্থ অফিসারদের বিরুদ্ধে আমাকে প্রতিবাদ করতে হয়েছে। তাদের অনেক অন্যায়-

অনিয়মের আমি প্রতিবাদ করেছি। আমার এই অভ্যাসের কথা আমার জাহাজ থেকে অন্যান্য জাহাজে ছড়িয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে তা আমার ওপরস্থ বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসারদের কানে পৌঁছেছে। তাদের প্রায় সবাই ছিলেন পাকিস্তানি। তাই তারা আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অফিসারগণও আমার এই অভ্যাসের কথা শুনেছেন। স্বাভাবিকভাবেই আমার সি-ইন-সি সাহেবের কানেও এ বিষয়টি গিয়েছে। ফলে আমি তাদের বিরাগভাজন হয়েছি।

'নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত অনমনীয় মনোভাবাপন্ন একজন হিসেবে আমার বহুল পরিচিতি ছিল। এই কারণে আমার অনেক কামান্ডিং অফিসারের সঙ্গে অনেক ঝগড়াবিবাদও আমার হয়েছে। কেননা, আমি তাদের কৃত কিছু অনিয়মের প্রতিকার করার চেষ্টা করতাম অফিসার হিসাবে আমার ক্ষমতা দিয়ে। ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর ইন্টেলিজেন্স কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার একবার মারাত্মক বিবাদ বেধেছিল। কারণ, আমি পরিবহনের কয়েকটি নির্দিষ্ট অপব্যবহার বন্ধ করার কথা বলেছিলাম এবং এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে তদন্ত করার কথা বলেছিলাম। এটা ছিল আমার জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, যখন পূর্ব পাকিস্তানিদের কোনো ন্যায্য বিষয় নিয়েও আমি ফয়সালার উদ্যোগ নিতাম তখনই আমাকে বলা হতো প্রাদেশিকতাবাদী এবং কখনো কখনো মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে বলে আমাকে হুমকি দেওয়া হতো। প্রকৃতপক্ষে, পূর্ব পাকিস্তানিদের সঙ্গে তুলনা করলে তা বেশিই মনে হবে বটে।'

'একজন অফিসার হিসেবে নৌবাহিনীতে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সমস্ত রকম অসন্তোষ ও ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে অধঃস্তনদের মনোবল উন্নত রাখার জন্য আমার যে প্রচেষ্টা তার ফলে বিভিন্ন সময়ে আমি আর্থিকভাবে, নিয়োগ দান ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অনেক অন্যায় আচরণের শিকার হয়েছি। এই সমস্ত কারণেই আমাকে তথাকথিত এই ষড়যন্ত্র মামলায়ও জড়ানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষের এ ধরনের আচরণের বিষয় আমি উদাহরণ হিসাবে এখানে তুলে ধরতে চাই।'

'যুক্তরাজ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় পাকিস্তান নৌবাহিনীর তৎকালীন সি-ইন-সি আমাকে 'ফ্যামিলি পাসেস' দিতে অস্বীকার করেন যদিও আইন ও নিয়ামনুযায়ী আমার তা প্রাপ্য ছিল। পাশাপাশি, কমান্ডার জমির এবং আবদুল্লাহ খান দু'জন অফিসারকে এ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কিত সি-ইন-সি সাহেবের একটি চিঠি, এই চিঠির জবাবে প্রায় এক বছর পরে লেখা পরিচালক, বেতন-পেনশন ও একাউন্টস সাহেবের একখানা চিঠি এবং নৌসদর দফতরে নৌপ্রশিক্ষণ পরিচালক সাহেবের একখানা চিঠি আদালতে দাখিল করতে চাই।'

'আমাকে পি এন এস আলমগীর নামক জাহাজে একটানা চার বছর চার মাসের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল অথচ সাধারণভাবে একজন অফিসারকে কোনো জাহাজে দুই থেকে আড়াই বছরের বেশি মেয়াদে নিয়োগ করা হয় না, বিশেষ করে সমুদ্রে। কারণ, একটি জাহাজ সপ্তাহে তিন-চার দিন সমুদ্রেই থাকে। ফলে অফিসারদের পারিবারিক জীবন বিঘ্নিত হয়।'

'কোনো জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার অধঃস্তনদের রেটিং সার্টিফিকেট দেবার ক্ষমতা

অর্পণ করা হয়েছিলো ওই জাহাজের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের ওপর। আমার জাহাজে আমি যখন তিন জন পূর্ব পাকিস্তানির রেটিং গ্রান্ট করলাম তখনই এই নিয়ম উঠিয়ে দেওয়া হয়। অথচ ওই তিন জনের পদোন্নতি আটকে ছিল একমাত্র রেটিং সার্টিফিকেটের অভাবে।'

১৯৬৪ সালে আমার জাহাজ মেরামতে যাওয়ার পর জাহাজের মেইন প্রোপালশান মেশিনারিতে কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে। এজন্য আমাকে হয়রানি করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পুরনো রেকর্ড ঘেঁটে দেখা গেলো যে, ওই ত্রুটি ১৯৫২ সালে জাহাজটি যখন বৃটিশ নৌবাহিনীতে ছিল তখনকার এবং যে অফিসার বৃটিশ নৌবাহিনীর কাছ থেকে জাহাজটি বুঝে নিয়েছিলেন তিনি জাহাজের এই ত্রুটি ধরতে পারেননি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ওই অফিসারটি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। ফলে বিষয়টি চাপা পড়ে এবং আমি রেহাই পেয়ে যাই। এই ঘটনায় আমার দেওয়া বক্তব্যের সমর্থনে আমি কিছু রেকর্ডপত্র চেয়ে আবেদন করেছিলাম কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা এখানে পাঠানো হয়নি।'

'১৯৬৪ সালেই বিনা দোষে আরও একবার আমাকে হয়রানি হতে হয়। ওই সময় আমার জাহাজ মেরামতে থাকা অবস্থায় জাহাজের বয়লারে কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে। এ জন্য নৌসদর দপ্তর থেকে একটি তদন্ত টিম করা হয়। এই তদন্তে দু'মাসেরও বেশি সময় চলে যায়। শেষ পর্যন্ত আমি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং ডকইয়ার্ড বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার এই উভয়পক্ষ থেকেই অভিযোগমুক্ত হই। কিন্তু সর্বাধিনায়ক আমার নামে একটি চিঠি ইস্যু করে আমার কাজের প্রতি তার অসন্তুষ্টির কথা জানান। আমি এখন আমার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও গবেষণাগারের সার্টিফিকেট প্রদর্শন করতে চাই। সর্বাধিনায়কের ওই চিঠি দেখানোর জন্য আমি আমার ব্যক্তিগত ফাইল আদালতে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু তা এখনও পাঠানো হয়নি। এখানে আমি জাহাজের একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। ওই জাহাজটি মেরামতের সময় বয়লারে কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে। এ জন্য ডকইয়ার্ড বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ওই জাহাজের প্রধান প্রকৌশলীকে দায়ী করেন। আমি এখানে সেই চিঠির কপিও উপস্থাপন করেছি। কিন্তু ওই প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কারণ, তিনি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি এবং সর্বাধিনায়কের আত্মীয়।'

'সাবমেরিন সার্ভিসে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার জন্য যেসব প্রকৌশলী অফিসার সর্বপ্রথম নাম দিয়েছিলেন আমি ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। ১৯৬২ সালে বিষয়টি অত্যন্ত গোপন রাখার উদ্দেশ্যে এ ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে অনুমোদন দেওয়া হতো আমি সে অনুমোদন পেয়েছিলাম। পরবর্তীকালে লিখিতভাবেও অনুমোদন পেয়েছিলাম সাবমেরিন সার্ভিসে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করার। এ সম্পর্কে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের চিঠি এখানে উপস্থাপন করেছি। কিন্তু আমাকে কখনোই ওই সার্ভিসে অংশগ্রহণ করার জন্য ডাকা হয়নি। ১৯৬৫ সালে আমি প্রকাশ্যে বলতে শুরু করলাম যে, আমি একজন পূর্ব পাকিস্তানি বলেই আমাকে ডাকা হচ্ছে না- তার আগে পর্যন্ত কোনো পূর্ব পাকিস্তানিকে ওই সার্ভিসে অংশগ্রহণ করার জন্য আসলেই ডাকা হয়নি। অথচ অনেক পাকিস্তানি অফিসারকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওই সার্ভিসে ডাকা হয়েছে।'

'খুলনার চালনাতে ডেপুটেশন দেওয়ার ঘটনায় আমার প্রতি আরও একবার অবিচার করা

হয়। নানা রকম হয়রানি ও অবিচারের ফলে অতিষ্ঠ হয়ে আমি তখন পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরের কথা ভাবছিলাম' এই মর্মে সর্বাধিনায়কের কাছে আবেদন করেছিলাম। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ আমার সাক্ষাৎকার নিয়ে আবেদনটি অনুমোদন করে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠায়। এ সম্পর্কিত প্রমাণপত্রাদি আমি আদালতে দাখিল করেছি। কিন্তু ১৯৬৪ সালের জুন মাসে আমাকে জানানো হয় যে, আমাকে চালনায় ডেপুটেশনে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। এরপর ১৯৬৪ সালের ১০ জুন নৌ সদর দপ্তর থেকে একটি তারবার্তার মাধ্যমে খুলনায় পোস্টিংয়ের জন্য প্রকৌশল শাখার 'ব্রাঞ্চ লিস্ট' অফিসার চাওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, তখন পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে কেউ প্রকৌশল শাখায় ব্রাঞ্চ লিস্ট অফিসার ছিলেন না। খুলনায় পোস্টিংয়ের জন্য এ ধরনের অফিসার চাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যাতে কোনো পূর্ব পাকিস্তানি তার প্রদেশে উচ্চপদে আসীন হয়ে চাকরি করার সুযোগ না পান।'

'১৯৬৪ সালে আমার মারাত্মক মাথা ব্যথা দেখা দেয়। ফলে আমাকে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা করাতে হয়। আমি তখন পাকিস্তান এবং যুক্তরাজ্যের চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল শাখার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়েছি। কিন্তু রোগের কোনো উপশম হচ্ছিল না। অবশেষে ১৯৬৭ সালে রোগ নির্ণয় হলে দেখা গেলো যে এটির উৎস এলার্জি। চিকিৎসকেরা আমাকে কয়েকটি বিষয় পরিহার করতে বলেন। যেমন, কঠিন পড়াশুনা, গভীর মনোনিবেশ করতে হয় এমন কোনো কাজ ইত্যাদি। ফলে উপায়ান্তর না দেখে আমি সর্বাধিনায়কের বরাবরে এই মর্মে একটি আবেদন করি যে, আমার মারাত্মক অসুস্থতা এবং পড়াশুনা অতীত রেকর্ডসমূহ বিবেচনা করে এখন আমাকে পদোন্নতির জন্য সকল ধরনের পেশাগত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দেওয়া হোক। নৌ কর্তৃপক্ষ আমার সে আবেদন এই বলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন যে, নৌবাহিনীর মেডিক্যাল ক্যাটগরিতে আমার স্থান 'এ' ক্যাটগরিতে। সুতরাং এ ধরনের কোনো আবেদন বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তখন আমি আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের আবেদন জানালাম। সেটিও ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় (আমার প্রথম আবেদনটির জবাব দিয়ে চট্টগ্রামের নৌবাহিনীর অফিসার-ইন-সার্জ যে চিঠি দিয়েছিলেন তার একটি কপি আমি আদালতে উপস্থাপন করেছি)। আর কোনো পথ না দেখে এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনোরূপ সুবিচার পাবার আশা নেই বুঝে আমি নৌবাহিনী থেকে 'অকালে অবসর' চেয়ে একটি আবেদন করি। এই আবেদনের একটি কপিও আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই আবেদনপত্রে আমি সর্বাধিনায়কের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ উপস্থাপন করেছিলাম যেগুলো তথ্য-প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল। ওই সর্বাধিনায়ক বর্তমানে প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী।'

'আমার ধারণা যে, আমার আপোসহীন ও অনমনীয় প্রকৃতির কথা জেনে এবং তার বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ উপস্থাপন করায় উক্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নৌবাহিনীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাকে এই মিথ্যা, তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়েছেন। দীর্ঘকাল আটক থাকা ও জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমাকে বলা হয়েছে যে,

সরকার পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক উভয় ধরনের কিছু লোককে সরিয়ে দিতে চান। এখন আমার কাছে এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিস্কার হয়ে গেছে যে, একটি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমাকে সরকার স্তব্ধ করে দিতে চান যাতে আমি ভবিষ্যতে কখনও ন্যায্য দাবি করতে ও ন্যায্য কথা বলতে না পারি। এর বিরুদ্ধে প্রয়োজন হলে আমি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে পর্যন্ত যাবো।'

'আমার চাকরি জীবনে আমি সর্বদাই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করেছি। আমি সর্বদাই আমার কর্তব্যকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছি। পাক-ভারত যুদ্ধকালে আমাকে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিলো এবং আমি সে দায়িত্ব পালনের জন্য আমার সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যবহার করেছি। আগেও একবার বলেছি যে, আমি একটানা ৩৫ দিন, একবারও বাড়িতে না এসে চাকরিস্থলে পড়ে থেকেছি। আমি সর্বদাই চাকরির মাধ্যমে দেশের সর্বোত্তম সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি। দেশ সেবার এই ধারা অনুসরণ করতে গিয়েই আমি পাকিস্তান নৌবাহিনী এবং আই ডব্লিউ টি-কে (যখন সেখানে কর্মরত ছিলাম) অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছি। আমার এ সকল পরামর্শ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করেই দেওয়া হয়েছে, কেবলমাত্র আমার নিজের পেশাকে সংরক্ষণ করার জন্য নয়। এই প্রেক্ষিতে আমি নৌ-কর্তৃপক্ষকে দেওয়া একটি পরামর্শ এখানে উপস্থাপন করতে চাই। সেই সঙ্গে উপস্থাপন করতে চাই আই ডব্লিউ টি এ-র চেয়ারম্যানের স্বহস্তে লেখা একখানা চিঠি, আই ডব্লিউ টি এ-র চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে ওই প্রতিষ্ঠানের সচিবের এবং সচিবের নিজের পক্ষ থেকে লেখা একখানা করে চিঠি এবং পাকিস্তান নৌবাহিনীর বর্তমান সর্বাধিনায়কের একখানা চিঠি। আমি আরও উপস্থাপন করতে চাই আই ডব্লিউ টি এ-র অফিস অর্ডারের একটি কপি, আমি যখন আই ডব্লিউ টি এ-তে কর্মরত ছিলাম তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে যেসব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তার একটি কপি এবং আই ডব্লিউ টি এ-র অফিসের সময় সূচির একটি কপি। আমি আই ডব্লিউ টি এ-র চেয়ারম্যানের কক্ষে অনুষ্ঠিত একটি সভার কার্যবিবরণীও এখানে উপস্থাপন করতে চাই, সে সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো যে, আমার অফিস বরিশাল থেকে নারায়ণগঞ্জে স্থানান্তর করা হবে। কিন্তু ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাকে পিন্ডিতে ডেকে নিয়ে গ্রেপ্তার করার কারণে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়নি। এইসব প্রমাণপত্র ও ঘটনাবলী এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে বলে মনে হয় যে, তথাকথিত এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আমার কোনো যোগ ছিল না।'

'আমার ১৯ বছরের চাকরি জীবনে সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানবশতঃ আমি এমন কোনো কাজ করিনি যাতে আমার সামরিক পোশাকের কোনোরূপ অবমাননা হতে পারে। বরং এই সামরিক পোশাকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও বাড়ানোর জন্য সব সময় চেষ্টা করেছি। আমি আরও একবার বলতে চাই যে, আমি নির্দোষ। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাকে তথাকথিত এই ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হয়েছে।'

অভিযুক্তদের মাঝে যারা বেঁচে আছেন

নূর মোহাম্মদ বাবুল, এবিএম আবদুস ছামাদ, এবি মো. খুরশীদ, মাহফুজুল বারী (কানাডা), কর্নেল (অব.) শামসুল আলম, কর্নেল (অব.) এম শওকত আলী এমপি (ডেপুটি স্পিকার), ফ্লাইট সার্জেন্ট (অব.) আবদুল জলিল, মো. মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. খুরশীদ উদ্দিন আহমেদ, কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ, আবুল হোসেন (বৈরী সাক্ষী), ডা. ছৈয়দুর রহমান (রাজসাক্ষী)।

যাঁরা শহীদ হয়েছেন/মারা গেছেন	তারিখ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	১৫.০৮.৭৫
লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন	২৬.৩.৭১
স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান	৬.১.৭২
এলএস সুলতান উদ্দিন আহমেদ	১৬.০১.৯৩
আহমেদ ফজলুর রহমান সিএসপি	৮.১২.৯১
ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ	২৫.৯.৯৪
হাবিলদার দলিল উদ্দিন হাওলাদার	জানা যায়নি
রুহুল কুদ্দুস সিএসপি	৭.৯.৯১
ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক	১৬.১.৯৪
ভূপতি ভূষন চৌধুরী (মানিক চৌধুরী)	৩০.৬.৮০
বিধান কৃষ্ণ সেন	০১.৫.০৪
সুবেদার আবদুর রাজ্জাক	১৫.৮.০৪
হাবিলদার মুজিবুর রহমান	৬.১২.৭২
ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুর রাজ্জাক	৫.১.৯১
সার্জেন্ট জহুরুল হক	১৫.২.৬৯
রিসালদার একেএম শামসুল হক	৬.৪.৯৮
হাবিলদার আজিজুল হক	জানা যায়নি
সার্জেন্ট শামসুল হক	১৬.৮.৯৫
মেজর মো. আবদুল মোতালেব	১০.১০.৯১
কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা	৭.১১.৭৫
ব্রিগেডিয়ার এএনএম নুরুজ্জামান	১৬.৩.৯৩
লে. এম মতিউর রহমান	২০.৫.৮০
সুবেদার একেএম তাজুল ইসলাম	১.৪.৭৬
মো. আলী রেজা	২২.৩.৮৮
কামাল উদ্দিন (বৈরী সাক্ষী)	১৭.৯.৮৯
বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত (বৈরী সাক্ষী)	
এবিএম ইউসুফ (বৈরী সাক্ষী)	১০.১২.৯৭
খান এম শামসুর রহমান সিএসপি,	২০১১


স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান


আহমদ ফজলুল রহমান

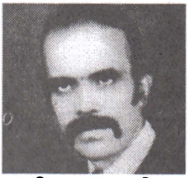

ফ্লা. সা. মফিজুল্লাহ


হা. দলিল উদ্দিন হাওলাদার


ফ্লা.সা. মো. ফজলুল হক


হা. ক্লার্ক মজিবুর রহমান


ফ্লা. সা. আবদুর রাজ্জাক


এ.বি.এম. মো. খুরশিদ


রিসালদার এ.কে.এম. শামসুল হক


হাবিলদার আজিজুল হক


মাহাফুজুল বারী


সার্জেন্ট শামসুল হক


মেজর মো. আবদুল মোতালেব


ক.(অব)খোন্দকার নাজমুল হুদা


ব্রিগেডিয়ার(অব) নুরুজ্জামান


লে. এম. এম. রহমান


সুবেদার তাজুল ইসলাম


এ.বি.এম. ইউসুফ


বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত



ষাটের দশকের একেবারে শেষ দিকে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের অধিকাংশই যখন আইউবের কারাগারে, আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত নেত্রী ছিলেন তখন আমেনা বেগম। তাঁর নেতৃত্বে সেই সময়ে সংগঠনের কর্মী-সমর্থকেরা মিছিল বের করে। রাজপথের কালো পিচে লেখা ছিল 'আগরতলা মামলা মানি না'



১৯৯৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা সেনানিবাসে “বিজয় কেতন” নামক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফলক উন্মোচনের পর মোনাজাত করেন

শেখ মুজিব আগরতলায় গিয়েছিলেনঃ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী

১৯৬৩ ইং আমার ভাই M L A শ্রী উমেশলাল সিং সমভিব্যাবহারে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ১০ জন ত্রিপুরার পালম জিলার খোয়াই মহকুমা দিয়া আগরতলায় আমার আগরতলার বাংলোয় রাত্র ১২ ঘটিকায় আগমন করেন। প্রাথমিক আলাপ আলোচনার পর আমার বাংলো বাড়ি হইতে মাইল দেড়েক দূরে ভগ্নি হেমাঙ্গিনী দেবীর বাড়ীতে শেখ সাহেব আসেন। সেখানেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর মুজিবুর ভাইয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি আমাদের প্রধান মন্ত্রী পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুর সাথে দেখা করি। আমার সাথে ছিলেন শ্রীরমন চীফ সেক্রেটারী। তাকে (শ্রীরমনকে) শ্রী ভান্ডারিয়ার বিদেশ সচিবের রুমে রাখিয়া প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করি। তিনি মুজিবুর রহমানকে ত্রিপুরায় থাকিয়া প্রচার করিতে সম্মত হন নাই। কারণ চীনের সাথে লড়াই এর পর এতোবড় ঝুঁকি নিতে রাজি হন নাই। তাই ১৫ দিন থাকার পর তিনি (শেখ মুজিব) ত্রিপুরা ত্যাগ করেন। সোনামুড়া পশ্চিম ত্রিপুরারই এক মহকুমা কুমিল্লার সাথে সংলগ্ন। শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা

এ গ্রন্থে সাংবাদিক ফয়েজ আহমদের 'আগরতলা মামলা', শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ', কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফের 'আগরতলা মামলা ও আমার নাবিক জীবন', কর্নেল (অব.) শওকত আলীর 'ARMED QUEST FOR INDEPENDENCE', অ্যাডভোকেট শাহিদা বেগমের 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : প্রাসঙ্গিক দলিল পত্র', স্বাধীনতা সংগ্রামঃ ইতিহাসের অ্যালবাম', রফিকুল ইসলামের 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম', মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'বাংলাদেশের তারিখ', দৈনিক ভোরের কাগজ ২৬ মার্চ '৯৮, ১৭ আগস্ট ২০০৫, দৈনিক ইত্তেফাক ১৬ ডিসেম্বর '৯৫, দৈনিক যুগান্তর ৯ ডিসেম্বর ২০০৬ সংখ্যা থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।